রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

সম্মেলনের কার্যবিবরণী

চতুর্থ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্য এবং জাতীয় চেতনা

সম্পাদক : অশোকবিজয় রাহা

রবীন্দ্র জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান

সম্মেলনের কার্যবিবরণী

চতুর্থ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্য এবং জাতীয় চেতনা

সম্পাদক : অশোকবিজয় রাহা

মূল্য : পাঁচ টাকা

প্রকাশক : সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে রণজিৎ রায়
বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

মুদ্রাকর : বাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড,
২৫, ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

বিবরণী

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার অন্যতম প্রকল্প হিসাবে ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের ১০, ১১ ও ১২ই মাঘ (যথাক্রমে ২৪, ২৫, ও ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দ) শান্তিনিকেতনে "রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্য এবং জাতীয় চেতনা" বিষয়ক একটি মনোজ্ঞ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য শান্তিনিকেতনের বাইরের প্রায় ১৩০ জন লেখক ও সাহিত্যসেবীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এঁদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন এসেছিলেন কলিকাতা মহানগরী থেকে। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত ডঃ কাজী মোতাহার হুসেন সাহেবের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১০ই মাঘ, 'মাতৃমন্দির পুণ্য-অঙ্গন'—সমবেত কণ্ঠের এই সংগীতটির দ্বারা সম্মেলনের উদ্বোধন হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও মহাকবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিপূত শান্তিনিকেতনের রম্য পরিবেশে আহূত এই বিশেষ সম্মেলনে বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ সুধীরঞ্জন দাস মহাশয় তাঁর উদ্বোধনী ভাষণের সূচনায় সমবেত বিশিষ্ট অতিথিবর্গকে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন এবং এই সময়ে শান্তিনিকেতনে আয়োজিত এই সম্মেলনের উপযোগিতার কথা বিবৃত করেন। বিশ্বভারতীর শুভানুধ্যায়ী কয়েকজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক তাঁদের একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও নানা প্রতিবন্ধকে সম্মেলনে যোগ দিতে না পারায় তিনি তাঁর ভাষণে দুঃখ প্রকাশ করেন। আনুষ্ঠানিক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে উপাচার্য মহাশয় বলেন যে, বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-জন্ম-শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান সমিতি যে সম্বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠানমালার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এটি তার চতুর্থ প্রকল্প এবং পূর্ববর্তী অনুষ্ঠানগুলির মতো বর্তমান সম্মেলনেরও একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে।

তিনি বলেন, বাংলা সাহিত্য ছিল গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের একান্ত প্রাণের বস্তু। এর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য গুরুদেব আজীবন সাধনা করে গিয়েছেন। এরপর তিনি বাংলা সাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের অমূল্য ও বহুলবিচিত্র দানের উল্লেখ করেন এবং এই প্রসঙ্গে আমাদের জাতীয় চেতনার উন্মেষলগ্নে বাংলা সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তনে রবীন্দ্রনাথের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে সংক্ষেপে পর্যালোচনা করেন।

সম্মেলনের আহ্বায়ক শ্রীঅশোকবিজয় রাহা তাঁর ভাষণের সূচনায় দূরবর্তী স্থানের যে-সকল সাহিত্যসেবী সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে পত্র লিখেছেন তাঁদের কথা স্মরণ করেন। সেই সঙ্গে তিনি সম্মেলনে উপস্থিত কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দকে সাদর অভ্যর্থনা

জ্ঞাপন করেন, এবং তাঁরা যে নানা কাজের ব্যস্ততা ও নানাবিধ অসুবিধা সত্ত্বেও ক্লেশ স্বীকার করে সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন এজন্য তাঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। যে মহাকবি তাঁর বিপুলবিস্তৃত সৃষ্টিধারার মধ্যে দিয়ে ভারতের বহুযুগের বিচিত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করে এক অখণ্ড রূপ দান করেছেন এবং স্বকীয় অসামান্য সংশ্লেষণী শক্তির প্রভাবে সেই সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিল্প-সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তার সার্থক সমন্বয় সাধন করে মানবসংস্কৃতিকে এক উর্ধ্বতর ভাবভূমিতে উত্তীর্ণ করেছেন,—তাঁর লোকোত্তর প্রতিভার বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ এই সম্মেলনের পৃথক্ পৃথক্ অধিবেশনে বিশদভাবে আলোচনা করবেন বলে আহ্বায়ক আশা প্রকাশ করেন।

'শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান'—সমবেত কণ্ঠে গীত হবার পর সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "রবীন্দ্রকাব্য-পরিণতির প্রথম পর্ব" শীর্ষক তাঁর সুচিন্তিত লিখিত ভাষণটি পাঠ করেন। এই ভাষণে রবীন্দ্রনাথের কাব্যসাধনার প্রথম দিকের দুটি কাব্যগ্রন্থ 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'-র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় কবির ওই সময়কার কবিতার বিভিন্ন ধরণের শিল্পরূপের বিকাশ ও উত্তরোত্তর বর্ধিত আবেগ-গভীরতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র "পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক তাঁর সুলিখিত রচনাটি পাঠ করেন। শ্রীযুক্ত মিত্র তাঁর প্রবন্ধে কাব্যবাণীর দুটি বৈশিষ্ট্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন—একটি কবিতার সাহিত্যিক সৌন্দর্য, অপরটি মানবিকতা। তিনি বলেন, কোনো পাঠকের পক্ষেই কবির রহস্যময় অন্তর্লোকে অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়, যদি না কবির একান্তে লেখা নিতান্ত ব্যক্তিগত পত্রগুলি পড়বার সুযোগ ঘটে। সর্বশেষে শ্রীমতী লীলা মজুমদার তাঁর রচিত, "রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্য ও জাতীয় জীবন" নিবন্ধে ভারতীয় ইতিহাসের যুগব্যাপী ঘটনা পরম্পরার পটভূমিতে বাংলার নবজাগরণ ও এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রাণ-প্রাচুর্যময় অনুপ্রেরণার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন কবি তাঁর জীবনে একদিকে যেমন ভারতের মহৎ অতীত ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন—অন্যদিকে তেমনি অনাগত ভবিষ্যতের সাফল্যের স্বপ্ন দেখেছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম দাস ও শ্রীযুক্ত ভবতোষ দত্ত মহাশয়ের প্রাসঙ্গিক ও মনোজ্ঞ আলোচনার পর প্রথম অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ওই দিন (১০ই মাঘ) সন্ধ্যায়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয়। সমবেত কণ্ঠে "জয় তব বিচিত্র

আনন্দ" গানের পরে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর লিখিত "রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার জাতীয় জীবন" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করেন। তিনি বলেন. ভারতীয় জাতীয়তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কেবলমাত্র একজন বাঙালি হিসাবেই নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সর্বভারতীয়—যদিও বাংলার আকাশ-বাতাস, মাঠ-বন, নদী-নালা, খাল-বিল এবং তাদের বহু বিচিত্রতা তাঁর কাছে ছিল প্রাণের চেয়েও প্রিয়। এরপর শ্রীযুক্ত জগদীশ ভট্টাচার্য মহাশয় "রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা" শীর্ষক স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথের সংবেদনশীল চিত্তে সাধারণ মানুষের জীবন ও বিচিত্র অনুভূতি কতখানি গভীর রেখাপাত করেছিল, রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে যথাযোগ্য দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য তা বিশ্লেষণ করে দেখান। সর্বশেষে সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস মহাশয় "বাংলার মাটি বাংলার জলের কবি রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক তাঁর সুদীর্ঘ ভাষণটি পাঠ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের রচনাসম্ভার থেকে অজস্র উদ্ধৃতি তুলে প্রমাণ করেন যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার প্রাণ-ধারার প্রতীক গঙ্গানদীর সঙ্গে এক অচ্ছেদ্য আত্মিক বন্ধনে যুক্ত,—এই অর্থে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যথার্থ গাঙ্গেয়। জনাব কাজী আব্দুল ওদুদ সাহেবের একটি সারগর্ভ আলোচনার পরে সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের উদ্বোধন হয় ১১ই মাঘ অপরাহ্ণে। সভাপতিত্ব করেন ডঃশশিভূষণ দাশগুপ্ত। শ্রীপ্রভাত পাল কর্তৃক গীত "আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ"—গানের পরে ডঃ কাজী মোতাহার হুসেন সাহেব তাঁর লিখিত "রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও বাংলার সামাজিক জীবন" প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধে বাংলার সমাজজীবনের সঙ্গে কবির দরদী মনের গভীর যোগ সম্বন্ধে তিনি সংক্ষেপে অথচ সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। এরপরে "রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার ঐতিহ্য" শীর্ষক রচনা পাঠ করেন শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার মহাশয়। দেশের সমাজ সংস্কৃতির বিচিত্র-ধারাকে কবি কিভাবে একটি সংগতিপূর্ণ রূপ দান করেছেন, শ্রীযুক্ত হালদার তাঁর ভাষণে সে সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় অধিবেশনে উপস্থিত হতে পারেন নি। তাঁরা যথাক্রমে "চির-অশান্ত" এবং "রবীন্দ্রনাথের ছবি" শীর্ষক তাঁদের দুটি স্বরচিত প্রবন্ধ প্রেরণ করেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে উক্ত প্রবন্ধ দুটি পাঠ করেন যথাক্রমে শ্রীদীপক মজুমদার এবং শ্রীশুভময় ঘোষ। "চির-অশান্ত" রচনাটির মধ্যে দিয়ে শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ চির-অশান্ত কবির নিত্যনব উন্মেষশালী সৃজনী প্রতিভার উল্লেখ করেছেন। শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী তাঁর লেখায় কবির চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতির মৌলিকতা বিষয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন শ্রীযুক্ত হিরণকুমার সান্ন্যাল, শ্রীযুক্ত দীনেশ দাস এবং শ্রীযুক্ত সমরেশ বসু মহাশয়। উপস্থিত শ্রোতৃগণের অনুরোধে শ্রীযুক্ত কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত মণীশ ঘটক মহাশয় কয়েকটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন।

সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান হিসাবেই আয়োজিত হয় ১২ই মাঘ প্রাতে,—পতাকা-উত্তোলন অনুষ্ঠানের পরে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সমবেত কণ্ঠে, "সুরের গুরু, দাও গো সুরের দীক্ষা" গানের পরে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ "সংগীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান" শীর্ষক রচনা পাঠ করেন এবং সংগীতের জগতে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ও মৌলিক দান সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত রাজ্যেশ্বর মিত্র "বাঙালির জীবনে রবীন্দ্রসংগীত" শীর্ষক প্রবন্ধে বাংলা গানের ক্রম-সমৃদ্ধি এবং গুরুদেবের গানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের সমাজে এবং প্রাত্যহিক জীবনে রবীন্দ্রসংগীতের সুগভীর প্রভাবের উল্লেখ করেন। এর পর শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ মহাশয় রবীন্দ্রনাথের গানে ভাব ও সুরের একাত্মতার স্বরূপ সংগীত-সহযোগে বিশ্লেষণ করেন। অতঃপর শ্রীযুক্ত ঘোষ তাঁর লেখা "রবীন্দ্র-সাধনায় সংগীত ও নৃত্য" বিষয়ক প্রবন্ধে শান্তিনিকেতন আশ্রমে সংগীত এবং নৃত্য বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমবিকাশের প্রাসঙ্গিক বিবরণ দান করেন। অতঃপর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন: শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীযুক্ত দেবীপদ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অরুণ ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন। সবশেষে সভাপতির অনুরোধে শ্রীযুক্ত শান্তিদেব ঘোষ কর্তৃক "এই কথাটি মনে রেখো"—গানটি গীত হবার পর অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সম্মেলনের পঞ্চম এবং শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঐদিনই (১২ই মাঘ) অপরাহ্নে। শ্রীমতী উষা সেনগুপ্তার কণ্ঠে "আবার যদি ইচ্ছা করো"—এই সংগীতের পর অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়। শ্রীযুক্ত রায় "আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ" শীর্ষক তাঁর গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে, পূর্ব ও পশ্চিমের শত শত বর্ষের পারস্পরিক সম্বন্ধকে রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে প্রচার করে গিয়েছেন সেই দিকটি নিয়ে আলোচনা করেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার" প্রবন্ধে কবির মানসগঠনে ইয়োরোপীয় প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন। আলোচনায়

অংশ গ্রহণ করেন, শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ), শ্রীযুক্ত সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়।

এরপর একটি কবি-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে নিম্নোক্ত কবিগণ স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন—সর্বশ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্র, মণীশ ঘটক, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ ভট্টাচার্য, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল রায়, দক্ষিণারঞ্জন বসু, জাবেদ আলী, অরুণ ভট্টাচার্য, বাণী রায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুনীলচন্দ্র সরকার, সজনীকান্ত দাস, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং অশোকবিজয় রাহা।

অধিবেশনের শেষে আহ্বায়ক সমবেত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। "আমাদের শান্তিনিকেতন" আশ্রম-সংগীতের পর তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

অশোকবিজয় রাহা
আহ্বায়ক

সূচীপত্র

উদ্বোধন

সুধীরঞ্জন দাস

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহোদয়, মাননীয় সুধীবৃন্দ ও সমবেত ভদ্রমহিলা ও বন্ধুমণ্ডলী,

বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যক্তিগত তরফে আপনাদের সকলকে আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি। আপনারা নানা ব্যক্তিগত অসুবিধা সত্ত্বেও যে আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে আজকের এই সম্মেলনের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন তার জন্যে আমরা আপনাদের কাছে সত্যিই কৃতজ্ঞ। আমাদের বাহ্যিক ঐশ্বর্য অতি অকিঞ্চিৎকর এবং সেইজন্যে আমাদের আয়োজনও নিতান্তই সামান্য। আমাদের আন্তরিকতা দিয়েই আমরা আপনাদের কাছে আমাদের সাদর অভিনন্দন নিবেদন করছি। আপনারা আপনাদের সহৃদয়তা দিয়ে আমাদের সকল দোষ-ত্রুটি ও স্খলন মার্জনা করে নেবেন— এই আশা করি।

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে বিশ্বভারতী যে বর্ষব্যাপী উৎসবের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন আজকের এই সম্মেলন তারই একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। গত ২৫শে বৈশাখ গুরুদেবের জন্মদিবস পালিত হবার পর এখানে পর্যায়ক্রমে তিনটি সম্মেলন হয়ে গেছে—যথা (১) রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষা পদ্ধতি, (২) রবীন্দ্রনাথ ও প্রাদেশিক সাহিত্য এবং (৩) নিখিল ভারত দর্শন-সম্মেলন। আজকের এই অনুষ্ঠান আমাদের বর্ষব্যাপী কার্যসূচীর চতুর্থ পর্যায়।

পূর্ববর্তী সম্মেলনগুলির প্রত্যেকটিরই যেমন এক-একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল আজকের সম্মেলনেরও তেমনি একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে মনে করি। গুরুদেব বঙ্গবাণীর সাধনায় আজীবন আত্মোৎসর্গ করে গেছেন। তদীয় পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমেই গুরুদেব তাঁর সাধনা উদ্‌যাপন করে গেছেন। আমাদের এই আশ্রম মহর্ষিদেবের প্রিয় উপাসনাবেদীটিকে আজও বক্ষে বহন করছে। এখানে সুরম্য হর্ম্য বা রাজপ্রাসাদ নেই, এখানে বিচিত্র মনোরম উদ্যান কিংবা স্ফটিকের ফোয়ারা নেই। কিন্তু দুইটি বিরাট পুরুষের মহৎ জীবনের সাধনা এই আশ্রমের আকাশ, বাতাস ও আলোকের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে। এখানকার ঘন আম্রকুঞ্জে এবং ছায়াশীতল শালবীথির ফাঁকে ফাঁকে যে প্রাণস্পন্দন নিত্য উৎসারিত হচ্ছে—তাকে বাক্য দিয়ে ব্যক্ত করা যায় না, চোখ দিয়ে দেখা যায় না, কিন্তু হৃদয় দিয়ে তার স্পর্শ অনুভব করা যায়। মহর্ষিদেবের ধ্যান দিয়ে গড়া শান্তির নীড় এই আশ্রমটি গুরুদেবের শ্রেষ্ঠ সাধনপীঠ-রূপে

জাতির তথা সমগ্র বিশ্বের কাছে সুপরিচিত। পিতা-পুত্রের এই সাধনক্ষেত্রটি কেবলমাত্র আশ্রমবাসী আমাদের নিকটই পরম প্রিয়স্থান নয়, ইহা বিশ্ববাসী সকলেরই পরম পবিত্র পীঠস্থান। আপনারা গুরুদেবের পরবর্তীকালের বঙ্গবাণীর পূজারী—তাঁরই সহযাত্রী। আপনারা এই পুণ্যতীর্থে এসেছেন আজকের এই সম্মেলনের মাধ্যমে গুরুদেবের প্রতি আপনাদের আন্তরিক প্রীতি ও শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার মানসে। যাঁরা আসতে পারেন নি তাঁরাও দূর হতেই তাঁদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বলে বিশ্বাস করি। আপনাদের সকলের মস্তকেই আশ্রমদেবতার আশিস্ ও অনুকম্পা -ধারা বর্ষিত হোক। আপনাদের এই সম্মেলন শোভন, সুন্দর ও সার্থক হোক।

আজকের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সকলেই জানেন। 'রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার সাহিত্য ও জাতীয় জীবন'—এই সম্মেলনের আলোচনার বিষয়বস্তু। গুরুদেবের বহুমুখী প্রতিভা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে অনির্বচনীয় প্রভাব বিস্তার করেছে সে সম্বন্ধে আমরা সকলেই সম্যক্ অবহিত সন্দেহ নাই। তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তির নিত্যনব প্রেরণা আমাদের জাতীয় জীবনকে যে কতখানি সঞ্জীবিত ও সম্পদ্‌শালী করেছে তা ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। এই সম্মেলনে এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা হবে। নিতান্ত অনধিকারচর্চা হলেও দু-একটি কথা নিবেদন করতে ইচ্ছা করি। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের এমন কোনো বিভাগই নেই যেখানে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার ছাপ রেখে যান নি। প্রত্যেক বিভাগকেই তিনি সম্পদ্‌বান করে গেছেন। প্রথমেই ধরা যাক খণ্ডকাব্য। এই শ্রেণীর লেখায় তাঁর কাব্য-প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল কিশোর বয়সেই। তুষারাবৃত পাহাড়ের মুখে রোদ লেগে বরফ গলে যেমন ছোট ছোট ঝরনা নেমে আসে উপলরাশির উপর দিয়ে কুলু কুলু শব্দে নাচতে নাচতে এবং পরে অন্যান্য ঝরনার সঙ্গে মিশে একটি নদীর আকার ধারণ ক'রে উদ্দাম বেগে ধেয়ে চলে সাগরের দিকে কত না জনপদ ও গ্রাম ডাইনে বাঁয়ে রেখে, রবীন্দ্র-কাব্যপ্রতিভাও তেমনি জেগে উঠেছিল তাঁর কিশোর মনের ব্যাকুলতার উদ্বেগে। সেই উদ্বেলিত কাব্যোচ্ছ্বাসে প্রাণসঞ্চার করেছিল এই দেশের প্রাচীন সভ্যতার অপরিমেয় উৎকর্ষ—যা যুগযুগান্তর ধরে বংশপরম্পরাক্রমে নেমে এসেছে আমাদের মধ্যে। ভাষার লালিত্য, ছন্দের সাবলীল গতি, উপমার অপূর্ব সম্পদ্, ভাব ও রসবোধের মার্জিত প্রকাশ—যা রবীন্দ্রনাথের খণ্ডকবিতাগুলির মধ্যে দেখতে পাই তার তুলনা মেলে না। নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য এবং অন্যান্য বইয়ে তাঁর লেখা প্রায় দু' তিন হাজার গানের প্রত্যেকটিকে এক-একটি নিষ্কলঙ্ক মুক্তা বললেই চলে। ওই গানগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ যদি আর কিছুই না লিখে যেতেন তা হলেও ওই গানগুলিতেই তিনি অমর হয়ে থাকতেন। মানুষের মনের ভাবোচ্ছ্বাসের এমন

কোনো ধারাই নেই যা তাঁর কোনো না কোনো গানে ভাষা পায় নি। এই বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ যে-সকল স্বদেশী-সংগীত রচনা করেছিলেন আজও তার প্রাণমাতানো ভাষা ও সুর শোনা যায় বাংলাদেশের হাটে, মাঠে, বাটে। তাঁর রচিত "জনগণমন-অধিনায়ক" গানটি আজকে ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত বলে গ্রাহ্য হয়েছে। ওই একটি গানেই তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টি কেবলমাত্র তাঁর খণ্ডকাব্য ও গানেই পরিসমাপ্তি লাভ করে নি। তাঁর বাল্মীকিপ্রতিভা, মায়ার খেলা, কালমৃগয়া বোধ হয় ভারতবর্ষের সমস্ত ভাষার মধ্যে গীতিনাট্যের প্রথম প্রয়াস। মিত্রাক্ষর ছন্দে মালিনী ও অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিসর্জন পদ্যনাট্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণই বলতে হবে। রাজা ও রাণী, প্রায়শ্চিত্ত, শারদোৎসব, অচলায়তন, রাজা, ডাকঘর ও অন্যান্য নাটক ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে যেতে ক্লান্তিবোধ হয় না এতটুকুও। নটীর পূজা, চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা ও চণ্ডালিকা একাধারে কাব্য, সংগীত ও নৃত্যকলার সমাবেশে নৃত্যনাট্যের চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। প্রহসনও বাদ যায় নি। বৈকুণ্ঠের খাতা, চিরকুমার সভা, হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গকৌতুক, গোড়ায় গলদ ও মুক্তির উপায় মার্জিত রুচিপূর্ণ কথাবার্তা এবং অনাবিল কৌতুকপূর্ণ পরিবেশের জন্য চিরকালই নবীন থাকবে। রবীন্দ্রনাথ ছোটগল্প-লেখকদের মধ্যে অগ্রণী ও রাজা ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাংলাভাষা কেন, ভারতীয় যে কোনো ভাষার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ নূতন এবং অপূর্ব অবদান। গল্পগুচ্ছের প্রত্যেকটি গল্পে তিনি বাংলাদেশের পল্লী ও শহর-বাসী সাধারণ নরনারীর সুখদুঃখময় দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে প্রতিচ্ছবি অতি সুন্দর ও নিখুঁতভাবে এঁকেছেন তা পড়লে চোখের সামনে সেই সকল গল্পের নায়ক-নায়িকাদের দেখতে পাই। ক্ষুধিত পাষাণ, কাবুলীওয়ালা ও ওই ধরনের গল্পগুলির কি তুলনা মেলে? উপন্যাসের মধ্যে নৌকাডুবি, চোখের বালি, গোরা, ঘরে-বাইরে, শেষের কবিতা, চার অধ্যায় এর উল্লেখ করতেই হয়। প্রত্যেকটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মানবচরিত্রের উৎকর্ষ ও নায়ক-নায়িকাদের ক্ষণে-ক্ষণে পরিবর্তনশীল মনোভাবের যে বিশ্লেষণ দেখিয়েছেন তা সত্যই অসাধারণ। প্রত্যেকটিতে বাংলাদেশের নদী নালা বিল খালের ও শ্যামল শস্যক্ষেত্রের যে বর্ণনা পড়া যায় তা অতীব মনোরম। উপন্যাসের গল্পাংশ একটুও গতিবেগ হারিয়ে মনকে ক্লান্ত করে না। গদ্য প্রবন্ধকার বলে রবীন্দ্রনাথের স্থান অত্যন্ত উঁচু। যে-সকল প্রবন্ধ নানা মাসিক-পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়ে পরে পুস্তিকা-আকারে ছাপা হয়েছে সে-সকল প্রবন্ধের মৌলিকতা ও ভাষার সৌন্দর্যের তুলনা নেই। তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা,—কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ প্রাচীন মহাকবিদিগের কাব্যের রসবিশ্লেষণ,—তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, সমালোচনার

নিরপেক্ষতা, মনস্তত্ত্বের অন্তর্দৃষ্টি এবং মার্জিত সম্বদ্ধ ভাষার উৎকর্ষের প্রকৃষ্ট পরিচায়ক। আজ হতে পঞ্চাশ বছরেরও আগে লিখিত ও প্রকাশিত প্রবন্ধে নানা সামাজিক সমস্যা, সমবায়-নীতির মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন, শিক্ষাপ্রণালী ইত্যাদি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে-সকল আলোচনা করেছেন এবং বহু সমস্যার মীমাংসা সম্বন্ধে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তা পড়লে তাঁর দূরদর্শিতা, স্বদেশপ্রীতি ও মনীষার ভূয়সী প্রশংসা না করে থাকা যায় না। তিনি যে-সব মীমাংসার নির্দেশ দিয়ে গেছেন আজকে তাঁর মৃত্যুর বিশ বছর পরে সেই সকল মীমাংসাকে কার্যকরী করবার চেষ্টা চলেছে সারা ভারতবর্ষময়। এই বিশ্বভারতীর পরিকল্পনা—"যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্" রবীন্দ্রনাথের সর্বোৎকৃষ্ট অবদান। রবীন্দ্রনাথের সার্বভৌমিকতা তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে এবং তাঁর জীবনের সকল কাজে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। যে-সকল রবীন্দ্রানুরাগী গুণী ও জ্ঞানী সুধীবৃন্দ এখানে সমাগত হয়েছেন তাঁরা বিভিন্ন অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের সর্বতোমুখী প্রতিভার আলোচনা করে আমাদের তৃপ্তিবিধান করবেন বলে আশা করছি। পরিশেষে মাননীয় অভ্যাগত সকলকে আবার আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে আমার এই উদ্বোধন-ভাষণ সমাপন করি।

আহ্বায়কের প্রতিবেদন

অশোকবিজয় রাহা

শ্রদ্ধেয় উপাচার্য মহাশয়, মাননীয় অতিথিবৃন্দ ও সারস্বতমণ্ডলী,

সর্বাগ্রে আপনাদের সকলকে নমস্কার করি। বঙ্গবাণীর যে বিশিষ্ট সাধক-সাধিকাগণ আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নিজেদের বহু অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে এসেছেন, আপনাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আপনারা শুধু আমাদের সম্মানিত অতিথি নন, আমাদের পরমাত্মীয়। আপনারা বিশ্বভারতীর সংকল্পিত কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিক উৎসবের এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিকে পূর্ণতা দান করতে এসেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পুণ্যনামে আজ আপনাদের সঙ্গে আমরা এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পড়েছি। আপনাদের সঙ্গে আমরাও আজ এই কবিতীর্থে মহাকবির উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে ধন্য হব।

যাঁরা এই সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ করতে আমন্ত্রিত হয়েও নানা প্রতিবন্ধকে লিখতে কিংবা আসতে পারেন নি তাঁরা সকলেই দুঃখপ্রকাশ করেছেন এবং দূর থেকে এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁদের নাম স্মরণ করি। তাঁরা হচ্ছেন—

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী, ডঃ সুকুমার সেন, অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর, শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অমিয় চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু, শ্রীযুক্ত সুবোধ ঘোষ, শ্রীযুক্ত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অধ্যাপক আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং ফাদার পি. ফালোঁ।

এখানে আরো একটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর একটি প্রবন্ধ পাঠিয়ে তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন।

এ ছাড়া আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে যাঁরা নানা কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকেই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে পত্র দিয়েছেন। এ-পর্যন্ত যাঁদের পত্র পেয়েছি তাঁরা হচ্ছেন—

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়, শ্রীযুক্তা সীতা দেবী, শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও, শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সতীনাথ ভাদুড়ী, শ্রীযুক্ত

সরোজকুমার রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব, শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী, জনাব রেজাউল করিম, অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক সুশোভন সরকার, শ্রীযুক্ত শচীন সেন, শ্রীযুক্ত মনোজ বসু, শ্রীযুক্ত অজিত দত্ত, শ্রীযুক্তা প্রতিভা বসু, শ্রীযুক্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত সুমথনাথ ঘোষ, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ অমলেন্দু বসু, শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী সেন, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ, শ্রীযুক্ত নন্দলাল সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার, শ্রীযুক্ত অনাদিকুমার দস্তিদার, শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাস, শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য, শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক, শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী, অধ্যাপক অম্লান দত্ত, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবী, শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়, শ্রীযুক্ত মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার এবং শ্রীযুক্ত নীহাররঞ্জন সেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই সম্মেলনে যোগ দিতে একান্ত আগ্রহান্বিত ছিলেন এবং কবিতীর্থের এই আমন্ত্রণকে 'অমৃতসত্রে পঙ্‌ক্তিভোজের নিমন্ত্রণ' বলে বর্ণনা করেছিলেন। আমাদের দুর্ভাগ্য, শারীরিক অসুস্থতার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁর আসা হল না।

এ ছাড়া ডঃ সুশীল কুমার দে, শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সমর সেন প্রমুখ বহু নিমন্ত্রিত লেখকের কাছ থেকে এখনো পত্র এসে পৌঁছায় নি।*

আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য আপনারা সকলেই জানেন। 'রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলার সাহিত্য ও জাতীয় জীবন' সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক্ থেকে আলোচনা করবার জন্যই এই সম্মেলন আহূত হয়েছে। সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে যাঁরা সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন এবং যাঁরা প্রবন্ধ পাঠ করবেন তাঁদের সকলের নাম সংবাদপত্রে যথারীতি প্রচারিত হয়েছে এবং আমাদের কার্যসূচীতেও মুদ্রিত হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেক অধিবেশনেই প্রবন্ধ পাঠের পর আলোচনার জন্য আধঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। আমরা একান্তভাবে আশা করছি, আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ সেই আলোচনায় যোগদান করে প্রবন্ধগুলির উপরে আরো খানিকটা আলোকপাত করবেন।

যে মহাকবির কণ্ঠে বৈদিক ঋষি থেকে বাংলার বাউল পর্যন্ত সকলের কণ্ঠই এক অভিনব ছন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে, ভারত-সংস্কৃতির ঘাটে-ঘাটে যিনি গুণীর মতো কণ্ঠ-সাধনা করেছেন, এবং সেই বিচিত্র সুরের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সুর মিলিয়ে যিনি তাঁর হাজার হাজার গান ও কবিতার মধ্যে দিয়ে এক মহাসংগীতলোক সৃষ্টি করেছেন, আমরা

* পরে এঁদের অনেকেরই পত্র পাওয়া গেছে।—আহ্বায়ক

সকলে আজ তাঁরই অলোকসামান্য প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে এসেছি। তিনি জগতের মহত্তম কবিদের অন্যতম এবং বিশ্বসভায় বঙ্গবাণীর সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। এই নদীমাতৃক দেশে জয়দেব থেকে প্রবাহিত কল্লোলগীতিসমুচ্ছল কাব্যধারা তাঁর বিপুলবিস্তৃত সৃষ্টিপ্রবাহের সঙ্গে মিশে এক বিশাল সমুদ্রসংগমে এসে পৌঁছেছে। সে অবিরাম সৃষ্টি-প্রবাহের তুলনা কোথায়? কত বিভিন্ন শিল্পভূমি ও ভাবভূমিকে তা প্রতিমুহূর্তে প্লাবিত ক'রে চলেছে: চলেছে কাব্যে সংগীতে চিত্রে, চলেছে গদ্যবাণীর বিচিত্র ধারায়, চলেছে অনুভবে চিন্তায় কর্মে। তাঁর বিপুল প্রেরণাবেগ অতীত ও বর্তমানকে দুর্বার গতিতে টেনে নিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। পিছনের গঙ্গোত্রীশিখরের কথা যদি আজ কোনো কারণে ভুলে গিয়ে থাকি, সম্মুখের সমুদ্রতরঙ্গের কথাও যদি নিতান্তই বিস্মৃত হই, তা হলেও আমরা একেবারে হতাশ হব না, কেননা তাঁর এই বিপুল সৃষ্টিধারাই আজ আমাদের প্রাণগঙ্গা। বিশ-শতকের সূর্যালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সুদিনে দুর্দিনে, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সকল সুখদুঃখের আলোড়নে আমরা আমাদের নাড়িতে অনুভব করছি এরই তরঙ্গদোলা, এর কূলপ্লাবী প্রবাহের পূতপবিত্র বারিই আজ আমাদের 'জাহ্নবীজীবন'।

কী করে এ সম্ভব হল সে এক বিস্ময়। অর্ধশতাব্দীরও ঊর্ধ্বকালব্যাপী রবীন্দ্র প্রতিভার এই সারস্বতলীলা মহাকালের এক পরম অভিপ্রায়। এক শতাব্দীর অনুশীলনেও একে স্পষ্ট বোঝা যাবে না। এ রহস্য উদ্ঘাটিত হবে কালে-কালে। তবু একে বোঝবার চেষ্টাতেই আমাদের অগ্রগতি। আমাদের এই সম্মেলনও সেই চেষ্টারই একটি বহিঃপ্রকাশ।

আমাদের বক্তব্য এইখানেই শেষ করছি। আমন্ত্রিত মনীষীদের কাছ থেকে এ-পথে নূতন ইঙ্গিত পাবার জন্য আমরা প্রতীক্ষা করছি। আমাদের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করছেন সর্বজনপরিচিত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রবন্ধ পাঠ করছেন সভাপতি স্বয়ং, এবং সেইসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদার। এঁরাও দুজনই সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত।

আপনাদের সকলকে আবার আমাদের নমস্কার ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

রবীন্দ্রকাব্য-পরিণতির প্রথম পর্ব

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবজীবনের মত কবিজীবনেও কৈশোর-যৌবনের সীমারেখা অনেকটা দুর্নিরীক্ষ্যই থাকে। বিদ্যাপতির বয়ঃসন্ধির পদে শৈশব ও তারুণ্যের সংমিশ্রণের যে বিভ্রান্তিকর অভিজ্ঞতার বর্ণনা আছে তাহা মানব-রূপসীর ন্যায় কাব্য-রূপসীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই প্রদোষ-অন্ধকারের অস্পষ্ট সন্ধিক্ষণে কাব্যের অন্তর্নিহিত রসচেতনা ও রূপবিন্যাস-রীতির বর্ণ ও রেখাসমাবেশের মধ্যে একটা চঞ্চল পরিবর্তনছন্দ হিল্লোলিত হয়। পুরাতন ধীরে ধীরে নবীনের জন্য স্থান ছাড়িয়া দিতেছে; ভাবের অপরিমিত, অস্বচ্ছ বিস্তার ক্রমশঃ সংহত হইয়া বর্ণোজ্জ্বল চিত্রের রূপ পরিগ্রহ করিতেছে; অনির্দেশ্য কুহেলিকাজাল ভেদ করিয়া স্থিরদৃষ্টির সূর্যোদয় দিঙ্‌মণ্ডলকে রক্তিম কিরণে উদ্ভাসিত করিতেছে; ক্রমোদ্ভিন্ন কবিসত্তা পাঠকের অনুভূতির নিকট একটি বিশিষ্ট আবেদনে অনবগুণ্ঠিত হইতেছে—মোটামুটি এই ধরনের একটা রূপান্তর সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। রবীন্দ্রনাথের পূর্বতন রচনার সহিত তুলনায় তাঁহার 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৭) ও 'মানসী' (১৮৯০) কাব্যদ্বয়ে কবিমনের এই পরিণতির স্বাক্ষরটি অনুভব করা যায়। নীহারিকাবাষ্পপুঞ্জ হইতে কবি-জগতের সুনির্দিষ্ট ও সুমিত রূপাবয়বে স্থিরতালাভ এই কাব্যদ্বয়ের মর্মবাণী।

'সন্ধ্যাসংগীত' হইতে 'ছবি ও গান'-এ আমরা কবিকল্পনার সাধ ও সাধ্যের মধ্যে একটা পীড়াদায়ক ব্যবধান লক্ষ্য করিয়াছি। তরুণ কবিচিত্ত নিঃসঙ্গতার বেদনায় আতুর; আত্মকেন্দ্রিক অসুস্থ ভাবরোমন্থনের অস্বস্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত; অস্পষ্টভাবে উপলব্ধ অতিকায় সৃষ্টিরহস্য-চেতনার জটিল পাকে বন্দী। 'প্রভাতসংগীত'-এ বিশ্বপ্রকৃতি ও মানব-জীবনের সহিত অন্তরঙ্গতার উল্লাস হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হইয়াছে। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে মুক্তির চেতনা গতির আনন্দে আত্মঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু এ-সব মুহূর্তের অনুভূতি, ভবিষ্যতের তিমিরগর্ভ হইতে অনাগত সৃষ্টির ক্ষণদীপ্ত উন্মেষ। এই কল্পনাময় অনুভূতি কাব্যসাধনার মধ্যে রূপ পরিগ্রহের জন্য প্রতীক্ষমান। 'ছবি ও গান'-এ রূপচিত্র ও গীতিসুরের ঈষৎ অস্পষ্ট-আভাস। ছবি এখানে রেখার দৃঢ়বেষ্টনী ও বর্ণের গাঢ়তা লাভ করে নাই; গীত এখানে ভীরু গুঞ্জনে কণ্ঠলীন। কল্পনা নিজ স্বরূপে অপ্রতিষ্ঠিত; উহার ধূম্রব্যাপ্তি উহার অন্তরদীপ্তিকে নিষ্প্রভ করিয়াছে। কবিচিত্ত এক বিরাট ও বিশৃঙ্খল অনুভূতির ভারে পীড়িত হইয়া অনিশ্চিত আলো-আঁধারির মধ্যে আত্মানুসন্ধানে বিব্রত। কবির কাব্য যেন এক তাৎপর্যময় রূপান্তরের সীমাতে পৌঁছিয়া হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে।

'কড়ি ও কোমল'-এ কবির এই অনির্দেশ্য স্বপ্নসঞ্চরণ কিছুটা নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী হইয়াছে। তাঁহার ভাব ও বাণী একটা ঋজু, জড়িমাহীন প্রকাশের সীমায় পৌঁছিয়াছে। কাঁচা শিল্পকৃতিতে একটু পরিণতির রং লাগিয়াছে। অবশ্য এখনও অপটু রেখাঙ্কন ও ভাবের অস্থির বাষ্পোচ্ছ্বাস কাব্যের দেহ ও মনের অস্বচ্ছ আবরণ রচনা করিয়াছে। তথাপি অগ্রগতির চিহ্ন সুপরিস্ফুট। তরুণ কবির অনুভবসমূহ কিয়ৎপরিমাণে সুনির্দিষ্ট রূপধারণ করিয়াছে। 'কড়ি ও কোমল'—এই অসাধারণ নামকরণের তাৎপর্য সম্বন্ধে কোন সমালোচক আলোচনা করেন নাই। কবির নিকট হইতেও এ বিষয়ে আমরা কোন আলোক পাই না। নামের দুইটি শব্দই সুরগ্রাম হইতে গৃহীত। কবির সনেটগুলিতেই বোধ হয় 'কড়ি' নামের সার্থকতা—ইহার মধ্যে তিনি যেন অপেক্ষাকৃত নীচু সুরের ভাব-গাম্ভীর্যটিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। 'কোমল' কবির তরুণ প্রাণের সূক্ষ্ম, আলতোভাবে ছোঁয়া, গভীর মননের ভারহীন সুরমূর্ছনাকেই সূচিত করে। 'কোমল' রবীন্দ্রনাথের আদিযুগের কাব্যগুলির স্থায়ী সুর; 'কড়িই' নূতন আমদানি, শান্তোচ্ছ্বাস ভাবপরিণতির রূপক-অভিধান। আরও লক্ষ্য করার বিষয় এই যে কাব্যগ্রন্থের নাম হইতে ছবি বাদ পড়িয়াছে। হয়ত কবির অপেক্ষাকৃত পরিণত কাব্যানুভূতি ছবির স্বতন্ত্র মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করিয়াছে। কবিতা প্রধানতঃ সুরের ব্যাপার; ছবি যদি আসে তবে সুরের সঙ্গী হইয়াই আসিবে, তাহাকে সমমর্যাদা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন এইরূপ একটা সিদ্ধান্তের আভাস এই নূতন নামের মধ্যে অনুমান করা যাইতে পারে।

'কড়ি ও কোমল'-এ পরিণতির লক্ষণগুলি এবার একটু অভিনিবেশ সহকারে অনুধাবন করা যাইতে পারে। কবি নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার এই কাব্যের মধ্যে মৃত্যুর ছায়া প্রথম পড়িয়াছে। ১৮৮৪ সালে কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু তরুণ কবিকে জীবনের গভীরতম রহস্য, সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক বেদনার সহিত পরিচিত করিয়াছে। আদর্শবাদী, স্বপ্নকল্পনাবিভোর কবিকে জীবন-অভিজ্ঞতার মর্মস্থলে প্রবেশ করাইতে হইলে এইরূপ নিদারুণ অভিঘাতেরই প্রয়োজন। কৃত্রিম বিষাদের কুজ্ঝটিকা অপসারণ করিতে হইলে প্রিয়জনের মৃত্যুর হিমশীতল বায়ুপ্রবাহ সর্বাধিক উপযোগী। "মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান"—জাতীয় তরুণমনসুলভ আতিশয্যস্পৃষ্ট কল্পনাবিলাস এই রূঢ় বাস্তব সত্যের সংস্পর্শে আপনা-আপনি সংকুচিত হয়। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কখনই মৃত্যুকে প্রাকৃত মানুষের ভয়ান্ধ, আতঙ্কমূঢ় দৃষ্টি দিয়া দেখেন নাই। তাঁহার পরবর্তীকালের কবিতায় মরণের মধ্যে রূপক-তাৎপর্য আরোপ করিয়া উহাকে অধ্যাত্ম প্রত্যয়ের স্থির আলোকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত কবিতার মধ্যে মৃত্যুকে লইয়া নিছক কল্পনাজাল বোনা নাই, আছে উহার স্বরূপ-উপলব্ধি, উহার নিজস্ব মহিমার উদ্‌ঘাটন।

এই কাব্যগ্রন্থে 'পুরাতন', 'নূতন', 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি', 'কোথায়', 'শান্তি', 'বিরহীর পত্র' প্রভৃতি কবিতায় এই মরণ-পরিচয় এক নিঃসন্দিগ্ধ বাস্তবতার সুর, এক প্রৌঢ় অনুভূতির প্রগাঢ়তার প্রবর্তন করিয়াছে। অবশ্য ইহাদের কাব্যমূল্য বা প্রজ্ঞাঘনতা খুব উচ্চাঙ্গের নয়; এগুলি প্রায় আকারে দীর্ঘ ও প্রকৃতিতে অসংস্কৃত আবেগধর্মী। কবিমন এখনও ইহার রহস্যের গভীরে অনুপ্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে নির্বিশেষ হইতে বিশেষে রূপান্তরিত করে নাই। তথাপি ইহাদের মধ্যে অনুভূতির রূপান্তর না থাকিলেও সত্যতা আছে। কবি 'বিরহীর পত্র'-এ বিরহকেও মৃত্যুদূত, মৃত্যুর পূর্বগামিনী ছায়ারূপে কল্পনা করিয়াছেন, ও ইহার কয়েকটি স্তবকে আবেগের আশঙ্কার সহিত তত্ত্বানুভূতির ও পটভূমিকা-রচনার একটা সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। মৃত্যুর তাপ-গৃহে কবির কাঁচা, প্রগল্‌ভ কৈশোর কল্পনা যে পক্কতার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে তাহা বেশ বোঝা যায়।

পূর্বতন কবিতার সহিত সংযোগসূত্র রক্ষিত হইয়াছে অল্প কয়েকটি কবিতায়— 'কাঙালিনী', 'উপকথা', 'ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি', 'বনের ছায়া', 'খেলা' প্রভৃতিতে। কিন্তু এই পুরাতন সুরের অনুবর্তনের মধ্যেও অগ্রগতির সুস্পষ্ট পরিচয় মিলে। হয়ত ভাবের দিক দিয়া ইহারা অতীতের অনুস্মৃতি; কিন্তু মনন ও প্রকাশের দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে একটা ঋজুতা ও রূপের দৃঢ়তা লক্ষণীয়। তরুণ কবির মনে দীর্ঘ দিন ধরিয়া যে একটা অনির্দেশ্য ব্যথার গুঞ্জন ও ম্লান, স্নেহবঞ্চিত শিশুজীবনের প্রতি একটা অস্ফুট সমবেদনা গুমরিয়া মরিতেছিল তাহা 'কাঙালিনী' কবিতায় এক অপূর্ব করুণরসনিঃসারে কাব্য-সার্থকতায় ধন্য হইয়াছে— অনেক জমান বাষ্প হইতে এক ফোঁটা শিশিরবিন্দুর ন্যায় স্বচ্ছ অশ্রু গলিয়া পড়িয়াছে। কবির মনের আকাশে যে থমথমে মেঘগাম্ভীর্য প্রকাশকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল তাহা এতদিনে কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ জলধারায় আপনাকে মুক্ত করিয়া দিল।

এই কাব্যটিতে কয়েকটি নূতন ধরনের গানের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। এগুলি ঠিক গান নয়, গান ও গীতিকবিতার এক প্রকার অভিনব সংমিশ্রণ। গানের পক্ষে ইহারা অনাবশ্যকরূপ দীর্ঘ; গীতিকবিতার পক্ষে এগুলি অতিরিক্ত সুরনির্ভর। মনে হয় যেন কবি এই দুই রকমের রচনার মধ্যে ঠিক সামঞ্জস্যটি এখনও খুঁজিয়া পান নাই। 'বিরহ', 'বিলাপ', 'আকাঙ্ক্ষা' প্রভৃতি গানগুলি 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর সুরের সুস্পষ্টতর অনুরণন, পূর্ব-যুগের অনির্দেশ্য বেদনা অনেকটা আবেগ-তীক্ষ্ণতা ও সুনির্দিষ্ট ভাষারূপ পাইয়াছে। অস্পষ্ট ভাবাকুলতাকে রসনিবিড়তা দিবার কৌশল কবি ধীরে ধীরে আয়ত্ত করিতেছেন।

মনন-পরিণতির অভ্রান্ত নিদর্শন পাই এই কাব্যের নীতিপ্রধান কয়েকটি কবিতায়। এগুলি যেন রবীন্দ্রপ্রতিভার সরল বিকাশপথ হইতে খানিকটা দূরবর্তী। রবীন্দ্রনাথের

কাব্যজগতে চিন্তা ও ভাবনার যে হারে পরিণতি হইয়াছে, তাঁহার কবিকল্পনার অন্তর্ভেদী শক্তি তাহা অপেক্ষা আরও দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রকাব্যে জীবন-সত্য-উপস্থাপনার যে রূপটি পাই, তাহা সাধারণতঃ কল্পনা দ্বারা রূপান্তরিত, কবিচেতনা-সংস্কৃত। সেইজন্য নিছক নীতিকবিতা রবীন্দ্রকাব্যে খুব স্বল্পসংখ্যক। 'কড়ি ও কোমল'-এ 'মঙ্গলগীত' নামক তিন অংশে সম্পূর্ণ কবিতাগুচ্ছ ও 'আহ্বানগীত' নামে দেশাত্মবোধমূলক কবিতাটি এই বিরল ব্যতিক্রমের অন্তর্ভুক্ত। মঙ্গলগীত কবিতাংশগুলি কবির ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরার উদ্দেশ্যে লেখা। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে এমন সমুন্নত আদর্শবাদ, এরূপ ঊর্ধ্বগামী অভীপ্সা, মানবকল্যাণের এরূপ সুগভীর আকুতি একটি ছোট বালিকার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতি আশীর্বাদরূপে বর্ষিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া ইহার শেষ অংশটি যেন একটি পবিত্র মন্ত্রের ন্যায় আশা ও আশিসের রক্ষাকবচ রূপে উদাত্ত গাম্ভীর্যের সহিত ধ্বনিত হইয়াছে। মনে হয় কোন অজ্ঞাত কারণে কবিচিত্তের আলোড়ন ইন্দিরাকে উপলক্ষ্য করিয়া এক অসাধারণ ভাবোচ্ছ্বাসে ফাটিয়া পড়িয়াছে—কবির নিজ মনের সংকল্পই যেন তাঁহার স্নেহপাত্রীর উপর আরোপিত হইয়াছে। ক্লাসিক্যাল রীতির সংযত আবেগ ও একান্তরূপে মননির্ভর দৃঢ় প্রকাশ, ব্যঞ্জনাহীন অর্থগৌরবের স্বয়ংসম্পূর্ণতা এই কবিতার বৈশিষ্ট্য। ইহাদের অবয়বস্ফীতিও এই চিন্তাপ্রাধান্যেরই পরোক্ষ ফল—কল্পনাদীপ্তির সহিত সংযোগ হইলে বাগ্‌বিস্তার অনেকটা সংযত হইত। এই জাতীয় কবিতা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অধিক পরিমাণে থাকিলে বাংলাসাহিত্যে বিশুদ্ধ ক্লাসিক-রীতিনিষ্ঠ রচনার বর্তমান অভাব অনেকটা পূর্ণ হইত।

কিন্তু এই কাব্যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ও অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব—সনেটগুচ্ছ। রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহে ইহা একটা ক্ষণস্থায়ী ব্যতিক্রম—এক 'নৈবেদ্য' ছাড়া আর কোথাও বড় একটা এইরূপ দৃঢ়পিনদ্ধ, সংহতরূপ রচনা দেখা যায় না। কবিমনের কি অজানা প্রেরণার ফলে তাঁহার প্রথম যুগের রচনার কুয়াসা-বিস্তারের মধ্যে এই সুমিত, পরিচ্ছন্ন ভাবদ্বীপগুলি জাগিয়া উঠিল তাহা অনির্ণেয়। মনে হয় যে এক প্রান্ত হইতে বিপরীত প্রান্তে উৎক্ষিপ্ত শিল্পচেতনার এক চরম প্রতিক্রিয়া এই ঘনবদ্ধ আঙ্গিকের রূপগঠনের পিছনে সক্রিয়। হয়ত কবি সচেতনভাবে নিজ শিথিল, অবয়বহীন ভাবকল্পনাকে কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত সীমার বন্ধনে বাঁধিয়া নিজ গঠনশক্তি ও সুঠাম রূপদান-ক্ষমতার অনুশীলন করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ভবিষ্যৎ কাব্যজীবনে এতটা আঁটাআঁটির প্রয়োজন হয় নাই—তাঁহার কল্পনাসমৃদ্ধি চৌদ্দ পংক্তির সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে আত্মসংকোচন পছন্দ করে নাই। কিন্তু অনাবশ্যক-বর্জনের ও অবয়বসংকোচের এই শিক্ষা অন্তরূপে তাঁহার কাব্যে নিগূঢ়-ভাবে ক্রিয়াশীল হইয়াছে—তাঁহার কবিচেতনা এক অভ্রান্ত সংস্কারে অতিভাষণদোষমুক্ত

হইয়া নিজ পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য অপরিহার্য আঙ্গিকমণ্ডল গঠন করিয়া লইয়াছে।

এই সনেটগুলি আর এক দিক দিয়া রবীন্দ্র-ভাববিবর্তনের মূলধারা-বহির্ভূত। প্রেমচেতনার ইন্দ্রিয়াকুলতা (sensuousness) রবীন্দ্রনাথের স্বভাবধর্ম নয়; তাঁহার রূপতৃষ্ণা কখনই উদগ্র হইয়া উঠিয়া তাঁহার সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনাবোধ, প্রাণোচ্ছলতা ও আবেগ-ছন্দকে অভিভূত করে নাই। প্রেম তাঁহার নিকট কেবল দেহমিলন বুভুক্ষা নয়, ইহা জীবনক্রিয়ার একটা সামগ্রিক উর্ধ্বায়ন। গীতিকবিতার প্রবহমান ছন্দে যে প্রেমপিপাসা গতিবেগ ও বিস্তৃতি অর্জন করিয়া বিচিত্র ও বহুমুখী-ভাবসাধনার পরিচয়বাহী হয়, চৌদ্দ পংক্তির ক্ষুদ্র পল্বলে তাহা যতই সংযম ও আন্তরিকতার সহিত বর্ণিত হউক না কেন তাহা খানিকটা ঘোলাটে না হইয়া পারে না। শেক্সপিয়ার ও রসেটির সনেট ছাড়া আর কোন ইংরেজ কবির রচনায় রূপাকুলতা ইন্দ্রিয়সীমায় এরূপ অবিরত ভাবে আবর্তিত হইয়া এই জাতীয় অনুভূতি-সম্মোহের সৃষ্টি করে নাই। মনে হয় বৈষ্ণব পদাবলীর রূপমগ্নতাকে অধ্যাত্মব্যঞ্জনাবিযুক্ত করিয়া রবীন্দ্রনাথ নিজ আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া থাকিবেন, তবে এই মগ্নতার মধ্যে যে রূপোল্লাস ইহাকে দেহসীমা-অতিক্রমণের সংবেগ দিয়াছে তাহা আধুনিক কবির দেহলালসা-রোমন্থনের মধ্যে অনুপস্থিত। এই অতিরঞ্জিত রূপচেতনা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁহার ঈষৎ পুরোগামী কবিগোষ্ঠীর—বলদেব পালিত, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতির—যোগসূত্রের প্রমাণ দেয়।

এই সনেটগুলিতে শুধু ইন্দ্রিয়মোহিত প্রেমাবেশের কথাই বর্ণিত হয় নাই; তাহার সঙ্গে শ্রান্তি, মোহমুক্তি, নিসর্গবর্ণনা ও জীবনতত্ত্ব প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় সংযুক্ত হইয়া বেশ একটা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হইয়াছে। একদিনে 'স্তন,' 'চুম্বন,' 'বিবসনা,' 'বাহু', 'চরণ', 'অঞ্চলের বাতাস,' 'দেহের মিলন,' 'তনু', 'হৃদয়-আসন' প্রভৃতিতে দেহরোমাঞ্চিত কামনার উত্তপ্ত স্পর্শের সঙ্গে অন্তরের নিষ্কলুষ নির্মলতা, রুচিসংযম ও কল্পনার উদার মুক্তির এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আধুনিক যুগের নবমূল্যসন্ধানী কল্পনা-রীতির সঙ্গে সংস্কৃত কাব্যের প্রথাকৌলীন্যের যেন এক অন্তরঙ্গ মিলন ঘটিয়াছে। আবার 'হৃদয়-আকাশ', 'স্মৃতি,' 'কল্পনার সাথী', 'নিদ্রিতার চিত্র' প্রভৃতি সনেটে দেহমিলনাকুতি এক উদারতর ভাবপরিবেশে ও দূরচারী কল্পনার মধ্যবর্তিতায় ইন্দ্রিয়বন্দিত্বের ঘন সম্মোহ-পূর্ণ কারাগার হইতে কিছুটা মুক্তি লাভ করিয়াছে। কামনার অসহনীয় উষ্ণ নিঃশ্বাসের মধ্যে যেন একটা প্রশান্ত-নির্মল, সৌন্দর্যমুগ্ধ দার্শনিকতার সুর লাগিয়াছে।

'পূর্ণমিলন'-এ সুর-পরিবর্তনের আভাস প্রথম শোনা যায়। পূর্ণ মিলনের আকুতি মানবিক প্রিয়াকে ছাড়িয়া ঈশ্বরাভিমুখী হইতে চাহিয়াছে। চণ্ডীদাসের রামী-বিষয়ক পদগুলির ন্যায়, আত্মনিবেদনের পরম ঐকান্তিকতা যেন ভগবৎ-মিলনের মধ্যে উহার

অনিবার্য পরিণতি খুঁজিয়াছে। তাহার পর 'শ্রান্তি', 'বন্দী', 'পবিত্র প্রেম', 'পবিত্র জীবন', 'মরীচিকা' প্রভৃতি সনেট-পারম্পর্যের মধ্যে কবিচিত্তের মুক্তি-কামনা, দেহজাত প্রেমের শ্বাসরোধকারী-সুবাসমত্ততা হইতে নিষ্কৃতির তীব্র আবেগ ক্ষুব্ধ আত্মানুযোগের সুরে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ইহাদের ভাববিশুদ্ধি প্রকাশের মর্যাদাময় অর্থবহতার দ্বারা পূর্ণভাবে সমর্থিত। কবির মনন যে এখন কত পরিণত, ইহা ভাবপ্রকাশের কিরূপ অনবদ্য বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সনেটের গাঢ়বদ্ধ আঙ্গিকের সহিত ইহার কিরূপ অন্তরঙ্গ যোগ তাহা এই সনেটগুলিতে সুপরিস্ফুট।

এই সনেটের তৃতীয় পর্যায়—'বৈতরণী', 'মানবহৃদয়ের বাসনা', 'ক্ষুদ্র অনন্ত', 'স্বপ্নরুদ্ধ', 'অক্ষমতা', 'কবির অহংকার', 'আত্মাভিমান', 'আত্ম-অপমান', 'ক্ষুদ্র আমি', 'প্রার্থনা', 'বাসনার ফাঁদ', 'সত্য', 'চিরদিন'—নীতি ও জীবনতত্ত্ব বিষয়ক। এগুলিতে কবির আত্মসমীক্ষা ও ভগবৎ চেতনার স্ফুরণ ও 'নৈবেদ্য'-এর ধর্মানুভূতির পূর্বসূচনা লক্ষিত হয়। ইহারা প্রমাণ করে যে কবি নিজের মানস দুর্বলতা সম্বন্ধে কত তীক্ষ্ণভাবে সচেতন ছিলেন ও কিরূপ আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত তিনি নিজ ভাববিলাসকে উন্মূলিত করিয়া তাঁহার সত্তাকে সমুন্নত ভাবাদর্শে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছেন। কবিচিত্ত ক্রমশঃ যে আধ্যাত্মিকতার গভীরে আত্মনিমজ্জন করিতে প্রস্তুত হইতেছে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন এখানে মিলে। যদিও নীতি-কবিতা রবীন্দ্রকাব্যে একটি গৌণ সুর, ও ইহা ক্রমশঃ ভগবৎ-স্বরূপের রহস্যময় প্রত্যক্ষতার মধ্যে বিলীন হইয়াছে, তথাপি এই কাব্যে ভাবগাম্ভীর্যে ও প্রকাশ-মননে ইহা সমুন্নত কাব্যমহিমায় অধিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রকাব্যে নিসর্গ-কবিতার অনেকটা বিলম্বিত আবির্ভাব। তাঁহার প্রথম পর্যায়ের কাব্যগুলিতে প্রকৃতি আসিয়াছে অপ্রকৃতিস্থ ভাববিলাসের অনুষঙ্গী হিসাবে কুয়াসার জালকে টুকরা-টুকরা রংএর উচ্ছ্বাসে ও রেখাচিত্রের আভাসে বিদীর্ণ করিয়া, ক্ষণস্থায়ী মেজাজের আলংকারিক পোষকতায়, খেয়ালী-কল্পনার রঙীন পরিচ্ছদরূপে। কবির আত্মকল্পনাবিভোর, তন্দ্রালস চোখের সামনে প্রকৃতি-সৌন্দর্য খানিকটা অন্যমনস্কতার ফাঁকে ফাঁকে, আলো-আঁধারি দুর্লক্ষ্যতার অর্ধাবগুণ্ঠিত হইয়া ধরা দিয়াছে।

'কড়ি ও কোমল'-এ কতকগুলি নিসর্গ-কবিতার প্রথম দর্শন মিলে। 'সন্ধ্যার বিদায়', 'রাত্রি', 'সমুদ্র', 'অস্তমান রবি', 'অস্তাচলের পরপারে', 'সিন্ধুতীরে',—এই কয়টি কবিতা প্রকৃতিবিষয়ক। এই কবিতাগুলি কবির এই যুগের ভাবোচ্ছ্বাসে আপ্লুত, অর্ধপরিণত কল্পনার বর্ণাঢ্যতায় মায়াচ্ছন্ন ও স্বপ্নমন্থর। পরবর্তী জীবনে রাত্রি ও সমুদ্রের উপর কবি আরও গভীরভাবাত্মক, কল্পনাভাস্বর কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রথম প্রয়াসও যথেষ্ট কাব্যগুণসমৃদ্ধ ও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ। বিশেষতঃ রাত্রিকে কবি যে

নাগিনীরূপে ও তারাসংঘকে নাগিনীর ফণাসংসক্ত রত্নাকণা-রূপে কল্পনা করিয়াছেন ও দিবাভাগে উহাকে যে সমুদ্রতলশায়ী অন্ধকার গুহায় স্বপ্নকাহিনী রচনায় ব্যাপৃত রাখিয়াছেন তাহা পাঠকচিত্তে একটু নূতন চমক জাগায়। প্রকৃতি-বিষয়ক কবিতায় কবি সনেটের নিয়মবন্ধনকে অনেকটা শিথিল করিয়াছেন, তাঁহার উদ্বেলিত ভাবকল্পনা নির্দিষ্ট সীমা ও অলঙ্ঘনীয় আঙ্গিককে বহুস্থানেই অতিক্রম করিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ কতখানি নিষ্ঠার সহিত সনেটের অঙ্গবিন্যাসকে অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা সংক্ষেপে আলোচিত হইতে পারে। তাঁহার কবি-স্বভাব ঠিক সনেটের আঁট-সাঁট বাঁধুনির অনুকূল ছিল না। গীতিকবিতার উদার প্রসার, স্বচ্ছন্দবিহারের মধ্যে ভাবানুযায়ী স্ব-উদ্ভাবিত জটিল ছন্দরীতির অনুবর্তন, বেগবান আবেগপ্রবাহ, কল্পনার ঐশ্বর্যময় ত্রিলোকব্যাপ্তি—ইহাই রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের সহজ রূপ। সনেটের স্বল্পভাষী-ভাবগাম্ভীর্য, কঠোর আত্মদমনজাত মনন-ঘনতা তাঁহার বিরল মুহূর্তের দুর্লভ আকর্ষণ, তাঁহার প্রতিভার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ নয়। সেইজন্যই সনেটের কঠোর নিয়ম-বন্ধন, উহার অষ্টক-ষড়ক-বিন্যস্ত ভাব-বিভাজন ও আরোহণ-অবরোহণের প্রথানির্দিষ্ট রীতি, উহার অন্ত্যমিল-সন্নিবেশের জটিল বিধি, সর্বোপরি উহার একক অখণ্ড ভাবের মধ্যে আত্মসংকোচন রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তার অন্তরসমর্থনবঞ্চিত। তাঁহার প্রকাশের মধ্যেও ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা মিলটনের তপস্যাপ্রসূত তেজোদীপ্তি বা মানস আবর্তনের পরিণত ফল প্রতিধ্বনিময় অর্থগৌরব সেরূপ লক্ষণীয় নয়। তাঁহার সনেটের বিষয়বস্তুর মধ্যেও গাম্ভীর্য অপেক্ষা কোমল, সুকুমার, অনুযোগে করুণ, অবসাদ ও উৎসাহের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্তভাবে আন্দোলিত হৃদয়ানুভূতিরই প্রাধান্য। গীতিকবিতাসুলভ কল্পনামনোহারিত্ব ও মনোজ্ঞ ভাবনা যাঁহার স্বভাবসিদ্ধ মনোভঙ্গী, তিনি ক্ষণিক প্রেরণায় সনেটের কৃচ্ছ্রসাধন অঙ্গীকার করিয়াছেন, কিন্তু উহাকে সম্পূর্ণভাবে নিজ আত্মার অনুকূল করিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহার 'নৈবেদ্য'-এর চতুর্দশপদী কবিতাগুলি সনেটের কঠোর অনুশাসনকে শিরোধার্য করে নাই; ধ্যানসমাহিত ও ঈশ্বরসমর্পিত চিত্তের নিবিড় প্রশান্তি উহাদের ক্ষুদ্র আধারকে যথাযথভাবে পরিপূর্ণ করিয়াছে।

এইখানে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আলোচনার উপসংহার করিব। আশুতোষ চৌধুরী 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলি বিন্যাস করিতে গিয়া 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—শীর্ষক সনেটটিকে সমগ্র কাব্য-আত্মার প্রতিনিধিরূপে সর্বপ্রথমে সন্নিবেশ করিয়াছিলেন ও রবীন্দ্রনাথও উহার সমর্থন জানাইয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয় যে ঐ সনেটটি কবির ভবিষ্যৎ মর্ত্যপ্রীতি ও মানবিকতা বোধের পূর্বসূচনা, বর্তমান কাব্যের মর্মার্থবাহী নহে। যদি কোন একটি কবিতাকে এই প্রতিনিধিত্ব-মর্যাদা দিতে হয়, তবে উহা

'আমার যৌবনস্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ'—এই কবিতাটি সেই গৌরবের অধিকারী। এই যৌবনস্বপ্নই সাময়িকভাবে কবিচিত্তকে অধিকার করিয়াছে। ইহারই রমণীয় মোহাকুলতা এক দিকে কবিকে আবিষ্ট করিয়াছে, অপরদিকে মুক্তিব্যাকুলতার প্রেরণা দিয়াছে। 'মানসী', 'চিত্রা' ও 'সোনার তরী'—এই সমস্ত যুগ ব্যাপিয়াই এই সর্বচেতনাবাহিত প্রেম ও সৌন্দর্যস্বপ্ন, নিখিলব্যাপ্তি হইতে কবির অনুভূতিতে সংক্রামিত রূপসীর নিঃশ্বাসস্পর্শ তাঁহার কবিকল্পনার মূল শক্তিরূপে নানা লীলাবৈচিত্র্যে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। স্বপ্ন যে কেবল অলীক কল্পনা নয়, তাহার মূল যে গভীর জীবনসত্যে নিহিত, তাহার নিগূঢ় রস ও মোহময় সংগীত যে জীবনের মর্মসঞ্চারিত হইয়া উহার চেতনা-রহস্যের অঙ্গীভূত হইতে পারে রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী স্তরের কবিতা এই স্বপ্নরূপান্তরেরই ইতিহাস। বিহারীলালের স্বপ্নসঞ্চারিণী সারদার ন্যায় রবীন্দ্রনাথের যৌবনকল্পনাবিহারিণী রূপসীই জীবনদেবতারূপে, কবির অলৌকিক, অথচ অতি-সত্য প্রণয়সাধনার সহযোগিনীরূপে নবজন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে।

'মানসী' (১৮৯০)-তে কবি-কল্পনার যে অপ্রত্যাশিত মুক্তি ও বৈচিত্র্যময় প্রকাশ ঘটিয়াছে রবীন্দ্রনাথ নিজে তাহার কারণ স্বরূপ তাঁহার গাজিপুর প্রবাসের নূতন পরিবেশকেই প্রধানতঃ নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার অনেকগুলি কবিতা গাজীপুরে লেখা হয় নাই। ইহার মধ্যে ১৮৮৭ সালে গাজীপুর যাত্রার পূর্বে লেখা অনেকগুলি কবিতা আছে। কাব্যটির প্রথম দুইটি কবিতা 'ভুলে' ও 'ভুল-ভাঙা', যাহাতে নূতন সুর ও কল্পনার উচ্ছ্বাস নিঃসংশয়ভাবে অভিব্যক্ত, গাজীপুর যাওয়ার এক বৎসর পূর্বে (বৈশাখ ১৮৮৭) লেখা। 'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি', যাহাতে প্রেম সম্বন্ধে কবির আদর্শনিষ্ঠ ও মনস্তত্ত্বসম্মত অন্তর্দৃষ্টি ও যে 'সিন্ধুতরঙ্গ'-এ কবির প্রকৃতি বিষয়ক নূতন তত্ত্বচেতনা আশ্চর্যভাবে রূপায়িত হইয়াছে—ইহারা প্রাক্‌-গাজীপুর-পর্বের রচনা। 'কড়ি ও কোমল'-এর অনুসৃতি স্বল্পসংখ্যক সনেটগুচ্ছও গাজীপুরের সহিত নিঃসম্পর্ক। গাজিপুর-চিহ্নিত কবিতাগুচ্ছের আরম্ভ ১১ই বৈশাখ, ১৮৮৮ হইতে, ও উহার স্থায়িত্ব 'নববঙ্গ-দম্পতির প্রেমালাপ'-এর রচনামালা ২৩শে আষাঢ়, ১৮৮৮ পর্যন্ত, প্রায় আড়াই মাস কাল। এই কালসীমার মধ্যে কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা রচিত হইয়াছে ও উহাদের মধ্যে 'কুহুধ্বনি' কবিতাটিতে গাজিপুরের পরিবেশ-প্রভাব সুপরিস্ফুট। কিন্তু এই উৎকৃষ্ট কবিতাবলীর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতাও সংমিশ্রিত আছে। সুতরাং গাজিপুর-প্রভাবের অনন্যতা রচনার তথ্যদ্বারা সমর্থিত নয়। গাজিপুর-পর্বের পর শোলাপুর, খিরকি, জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতন মানসীকাব্যের বহু কবিতার রচনাস্থল। 'মানসী'র দুইটি সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা 'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি' শান্তি-

নিকেতনে রচিত। কতকগুলি কবিতা আবার কবির স্বল্পকালব্যাপী ইংলণ্ড-যাত্রা উপলক্ষ্যে সমুদ্রবক্ষে লেখা। সুতরাং তথ্যবিচারে গাজীপুরের কাব্যপ্রেরণার কোন বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না। মনে হয় কবি তাঁহার জীবনের অপরাহ্ণবেলায় গাজিপুরের স্মৃতিকে একটু অতিরঞ্জিত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক দিয়া গাজিপুর কবির প্রত্যাশাকে যে পরিমাণে বঞ্চনা করিয়াছিল, কবি উহার মানস প্রভাবকে সেই পরিমাণে আতিশয্যমণ্ডিত করিয়া আশা ও উহার পরিপূর্ণতার মধ্যে একটা রফা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। কবি কস্তুরী-মৃগের ন্যায় নিজ নাভি-উত্থিত সুবাসের উৎস নির্ণয় করিতে না পারিয়া উহাকে গাজিপুরের প্রত্যাশিত কিন্তু অলব্ধ গোলাপক্ষেত্রের সুগন্ধরূপে কল্পনা করিয়াছেন।

'মানসী'তে 'প্রভাত সংগীত'-এর প্রথম বিস্ময়-চমক, উৎসাহ-উদ্বেলতা বাস্তব রূপ লইয়াছে। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ'-এ কবি নিজ কাব্য-জীবনের যে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটি কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা এখানে বর্তমানের প্রত্যক্ষ রূপসৃষ্টিতে নিজ যথার্থ পরিচয় মুদ্রিত করিয়াছে। 'মানসী'র প্রেম-কবিতাগুলি প্রেম-রহস্যের এক আশ্চর্য উন্মোচন। এতদিন কবির অন্তরে যাহা তত্ত্ব কল্পনার ও রূপমত্ত আবেগের কুঁড়িরূপে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহাই এবার শতদল পদ্মের মত অপরূপ বর্ণে-গন্ধে, কোমল দলগুলির স্তরে স্তরে উন্মীলনে বিকশিত হইয়া উঠিল। এ পর্যন্ত কবির যৌবননিকুঞ্জে পাখীর গীত-কাকলী শোনা গিয়াছিল; এখন সেই ক্ষীণ সংগীতধ্বনির উপর পূর্ণপ্রবুদ্ধ, নিগূঢ়-অনুভূতিশীল মানবাত্মার মর্মনিঃসৃত গীতোচ্ছ্বাস বহিয়া গেল। 'ভুলে', 'ভুল-ভাঙা', 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা', 'আত্মসমর্পণ', 'সংশয়ের আবেগ', 'বিচ্ছেদের শান্তি', 'আকাঙ্ক্ষা', 'নারীর উক্তি', 'পুরুষের উক্তি', 'ব্যক্ত প্রেম', 'গুপ্ত প্রেম', 'অপেক্ষা', 'সুরদাসের প্রার্থনা', 'অনন্ত প্রেম', 'আমার সুখ'—প্রেমের পারিজাতবৃক্ষ হইতে কি সুপ্রচুর, বিচিত্র-গন্ধবহ পুষ্পবৃষ্টি। অতীতের তত্ত্বচিন্তা ও ভাববিলাস এখন গভীরতম অন্তর-সত্যের অভিজ্ঞান লইয়া, ছন্দোদেহের বিচিত্র সুরতরঙ্গিত আশ্রয়-দৃঢ়তায়, প্রাণলীলার অপরূপ লাস্যভঙ্গিমায় আমাদের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। হৃদয়াবেগ আপনার ভাষা ও ছন্দ লইয়া আত্মপরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; দ্বিধা-সংশয়, অতৃপ্তি-অনুযোগ, মোহ ও মোহভঙ্গ, আত্মবিচার ও অপরের মনের গভীরে অবতরণ, প্রেমতরঙ্গের সমস্ত ওঠা-নামা, প্রেমের অন্তরলোকের সব কয়টি অস্থির উপাদান এই কবিতাগুলিতে আপনাদের নিখুঁত প্রতিবিম্ব ফেলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী স্তরের আর কোন কাব্যে প্রেমের গভীর ও বিচিত্রমুখী হৃদয়াবেগের সঙ্গে পার্থিব নিয়মানুসারী মানব মনস্তত্ত্বের এরূপ সার্থক সমন্বয় হইয়াছে কি না সন্দেহ।

'ভুলে' ও 'ভুল-ভাঙা'য় অভিমানক্ষুব্ধ প্রেমিক মনের করুণ অনুযোগ ও বিষণ্ণ বাস্তব স্বীকৃতির অপরূপ ছন্দোময় প্রকাশ। ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয় যে কবির পূর্ব রচনার স্তিমিত দার্শনিকতা ও মন্থর তত্ত্বচিন্তার মধ্যে এই বেগবান, স্বতঃউচ্ছ্বসিত আবেগ-ধারা কোথায় সুপ্ত ছিল। 'বিরহানন্দ' ও 'ক্ষণিক মিলন'-এ এই উচ্ছ্বাসহীন তত্ত্বপ্রাধান্য পূর্ব যুগের স্মৃতিস্বরূপ এখনও বিদ্যমান আছে—ইহাদের জমাট-আড়ষ্ট ভাব এখনও গলিয়া নৃত্যছন্দে নিঃসারিত হয় নাই। 'শূন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা'য় তত্ত্বের সঙ্গে আবেগের মিলন খুব সার্থক হয় নাই—তথাপি কবিমনের প্রেমের দিব্যরূপান্তরক্ষম বৈদ্যুতী-স্পর্শের জন্য ব্যাকুলতা উহার পরিবর্তনের সূচনা করে। 'আত্মসমর্পণ'-এ কবি প্রেমের একটি সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন—উহার ছলনাময় প্রকৃতির মধ্যে প্রেমিকের একটি আত্ম-গোপন-প্রবণতা লুকান থাকে। প্রেমিক সেই অলীক আত্মমর্যাদার ছদ্মবেশ ছাড়িয়া অকুণ্ঠিতভাবে নিজ অসংবরণীয় প্রণয়মুগ্ধতা নিবেদন করিতেছে। 'সংশয়ের আবেগ' ও 'বিচ্ছেদের শান্তি' প্রেমের দুইটি বিপরীত ভাবের চমৎকার পরিচয়। যতদিন প্রণয়িণীর মনোভাব সম্বন্ধে সংশয় থাকে, ততদিন প্রেমিক আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে দোদুল্যমান ও ভালবাসার স্থির আশ্রয় পাইলে সমস্ত জগৎ যে তাহার নিকট আদর্শ সুসমার লীলাভূমি হইবে এই মুগ্ধ কল্পনায় বিভোর থাকে। কিন্তু যখন বিচ্ছেদ অনিবার্যভাবে আসে, তখন এই অনিশ্চিত মোহের অবসান ঘটিয়া নূতন সংকল্পের দৃঢ় সুর বাজিয়া ওঠে। 'মানসী'র প্রায় সমস্ত প্রেমকবিতা মনস্তত্ত্বপ্রধান ও ইংরাজ কবি ব্রাউনিংএর প্রভাবস্পৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। তবে ব্রাউনিংএ যেমন মনস্তত্ত্ব উগ্রভাবে প্রকট ও বিশুদ্ধ কাব্যমনোভাব ভীরুভাবে এই জটিল, আঁকাবাঁকা মানসক্রিয়ার অনুগামী, রবীন্দ্রনাথে কিন্তু সেই খানিকটা অবাঞ্ছিত পরিণতি ঘটে নাই। যেমন সুঠাম, সুগঠিত দেহের অন্তরালে সুদৃঢ় পেশীজাল প্রচ্ছন্ন থাকে, রবীন্দ্রনাথের অবাধ-প্রবাহিত কাব্যস্রোতের নীচে মনস্তত্ত্বের মগ্নশৈল শুধু নিজ অস্তিত্বের আভাস দিয়া আত্মগোপন করিয়াছে। কবিতার নিখুঁত ও সুদৃঢ় ভাববন্ধনে উহার ছন্দ ও সৌন্দর্যসৃষ্টির সহকারীরূপেই, উহার মর্মবাহী আবেগলীন হইয়াই মনস্তত্ত্ব আপনার গৌণত্বের পরিচয় দিয়াছে।

'আকাঙ্ক্ষা'য় বর্ষার মেঘগম্ভীর, অরণ্যমর্মরধ্বনিত আবরণতলে প্রেম আপনার খণ্ডিত চটুল পরিচয় হইতে মুক্ত হইয়া এক নিবিড়, অসীম রহস্যমৌন সত্তাসমগ্রতা লাভ করিয়াছে। প্রেমের সহিত প্রকৃতির সম্পর্ক-নিগূঢ়তা এই কবিতায় স্মরণীয়ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু উহার উপস্থাপনারীতির মধ্যে স্থানে স্থানে অসমতা লক্ষিত হয়। 'বর্ষার দিনে' অবিরল ধারাবর্ষণের মধ্যে মনের সমস্ত আগল কেমন করিয়া উন্মুক্ত হয় তাহারমনোজ্ঞ বর্ণনা পাই। 'নারীর উক্তি' ও 'পুরুষের উক্তি' দুই বিপরীতমুখী প্রেমানুভূতির মনস্তত্ত্ব-

দৃঢ়, অপূর্ব, সুন্দর রূপায়ণ। কবিতাদ্বয়ের পিছনে এক কাব্যসৌন্দর্যময় নাটকীয় সংঘাতের মৃদু আলোড়ন সুপরিস্ফুট। নারীর উক্তিতে পুরুষের অনুরাগশিথিলতার জন্য অনুযোগ; পুরুষের উক্তিতে এই অভিযোগ-স্বীকৃতি ও পরিবর্তনের অনিবার্যতা-প্রতিষ্ঠা। প্রেমের অপরূপ স্বপ্ন কেমন করিয়া ধীরে ধীরে প্রাত্যহিকতার ধূসর ছায়ায় বিলীন হয়, প্রেমের দেবতা কেমন করিয়া মাটির পুতুলে পরিণত হয়, ঐশ্বর্যের পূর্ণতার মাঝখানে কিরূপে রিক্ততার কঙ্কাল জাগিয়া উঠে, বরদাত্রী লক্ষ্মী সাংসারিকতার কি অশুভ মন্ত্রে নিজেই সামান্য অনুগ্রহপ্রার্থিনী কাঙালিনীর ছদ্মবেশ ধারণ করেন—প্রেমের এই চিরন্তন স্বর্গ-লোকচ্যুতির কাহিনী আশ্চর্য সংযম ও অভ্রান্ত কাব্যকলার সহিত এখানে অভিব্যক্ত হইয়াছে। দাম্পত্য জীবন এই অবশ্যম্ভাবীকে মানিয়া লইয়া রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে কোনরকমে মাথা গুঁজিয়া থাকা একখানি পর্ণকুটির নির্মাণের মলিন শিল্পস্বীকরণ। এই আশ্চর্য যুগ্মকবিতায় ভাবাদর্শ, প্রকৃতি-চেতনা, আবেগ-উচ্ছলতা সবই মনস্তত্ত্বের পরিমিত সীমার মধ্যে আত্মসঙ্কোচন করিয়া এক যথার্থ ভাবদ্যোতক রূপসৃষ্টির ঐক্যবন্ধন স্বীকার করিয়াছে।

'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম' এইরূপ আর এক জোড়া যুগ্মকবিতা। 'ব্যক্ত প্রেম'-এ জীবনের শত তুচ্ছ কাজের মধ্যে হৃদয়ের যে পরিচয় গোপন থাকে ও প্রেমিক-বাহুর বলিষ্ঠ আকর্ষণে যাহা সমস্ত লাজাবরণ ভেদ করিয়া আত্মপ্রকাশ করে, প্রত্যাখ্যানের পর সেই অন্তরালচ্যুত প্রেমের লজ্জা যে অসহনীয় হইয়া উঠে তাহারই মর্মস্পর্শী বর্ণনা। 'গুপ্ত প্রেম'-এ ইহারই বিপরীত চিত্র। কুরূপা নারীর প্রেমনিবেদনের ঔৎসুক্য যে নিজ অযোগ্যতার কুণ্ঠায় প্রকাশ-প্রতিহত হইয়া অন্তরে অস্থির আবর্ত রচনা করে তাহারই আবেগঘন প্রকাশ এখানে পাই। আপনাকে দয়িতের নিকট নিবেদনযোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে রূপহীনার রূপসম্ভারের জন্য আকুল প্রার্থনা এখানে ধ্বনিত হইয়াছে। এই আকূতিটিই পরবর্তী 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যের মূল প্রেরণা রূপে দেখা দিয়াছে। এই দুইটি কবিতায় প্রেমের সার্বভৌম রূপটি বাঙালী মেয়ের জীবনছন্দ ও অন্তর-প্রকৃতির নিখুঁত অনুসরণে প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য পাইয়াছে। 'অপেক্ষা' কবিতায় Browning-এর 'love Among Ruins' বা 'Two in the Campagna' কবিতার মত প্রতিবেশ-প্রভাবে প্রেমের বিশিষ্ট রূপটি ফুটাইবার চেষ্টা হইয়াছে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার গুরুভার, সময়ের শম্বুকগতির দুঃসহতা অপেক্ষমান প্রেমিককে নৈরাশ্যক্লিষ্ট করিয়াছে—তাহাদের মিলনলগ্নটি বিলম্বিত হইয়া তাহার অধীরতাকে ঔদাস্যে পরিণত করিতেছে। অস্তায়মান সূর্যের অতিমন্থর গতিচ্ছন্দটি প্রকৃতির বিভিন্ন অঙ্গে যেন রেখাঙ্কিত হইয়াছে।

মেঘেতে দিন জড়ায়ে থাকে
মিলায়ে থাকে মাঠে,
পড়িয়া থাকে তরুর শিরে,
কাঁপিতে থাকে নদীর নীরে,
দাঁড়ায়ে থাকে, দীর্ঘ ছায়া
মেলিয়া ঘাটে বাটে।

. . . .

যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে
আর কি হবে কথা ?
ক্ষণেক শুধু অবশ কায়
থমকি রবে ছবির প্রায়
মুখের পানে চাহিয়া শুধু
সুখের আকুলতা।

দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে
আলোর ব্যবধান।

এই পংক্তি কয়টি আমাদিগকে Browning-এর কবিতার মিলনোৎসুক প্রণয়ী-যুগলের বিশ্বচেতনালোপী প্রেমালিঙ্গনের কথা মনে পড়াইয়া দেয়।

Ere we extinguish sense and speech
Each on each

রবীন্দ্রনাথে ভারতীয় আদর্শানুযায়ী আলিঙ্গন-নিবিড়তা চেতনাস্বাতন্ত্র্যগ্রাসী আত্মিক মিলনের প্রলয়াবলুপ্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছে।

'সুরদাসের প্রার্থনা' কবিতায় ইন্দ্রিয়মুগ্ধ প্রেমের মদির আবেশ ও উহার জন্য উৎকট প্রায়শ্চিত্ত বিধানের সংকল্প পাশাপাশি স্থান লইয়াছে। এই ইন্দ্রিয়মোহ কবি প্রকৃতির স্বভাবধর্মেরই বিকাশরূপে দেখান হইয়াছে। কবিতাটির অনন্যতা প্রকৃতি-সৌন্দর্যের মাদক প্রভাবে প্রণয়াশক্তির আবেশকে ঘনাইয়া তোলার বর্ণনায়। প্রকৃতির মধ্যে এইরূপ রূপমোহের আরোপ আমাদিগকে ওয়ার্ডসওয়ার্থের Ruth কবিতার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ভক্ত কবি সুরদাস ভক্তি-সাধক বিল্বমঙ্গলের মত প্রলোভনের প্রবেশপথ চক্ষু-রিন্দ্রিয়কে উৎপাটিত করিতে কৃতসঙ্কল্প। কিন্তু তাঁহার অন্ধ নয়নের তিমিরতলে যে এই মুহূর্তই উহার প্রকৃতি-পরিবেশ ও স্মৃতিসঞ্চয়, উহার প্রেয়সীর মুখ ও হৃদয়ের আবেগ-

মুগ্ধতা লইয়া তাঁহার অন্তরে চিরন্তন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে এই সংশয় এক নূতন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রিয়া ও আরাধ্য দেবতা হরি যে এই অন্ধতার অন্তর-আলোকে তাঁহার হৃদয়ে চিরজাগ্রত থাকিবেন এই দৃঢ় প্রত্যয়ে কবিতার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। কবিতাটির ভাবপরিকল্পনা ও রূপনির্মিতি উভয়েই অসাধারণ কাব্যশক্তির নিদর্শন বহন করে।

'উচ্ছৃঙ্খল' কবিতাটি কবির 'ছবি ও গান'-এর অন্তর্ভুক্ত 'রাহুর প্রেম' কবিতার পরিণত কবিত্বশক্তি-প্রসূত নবরূপান্তর। সেখানে অপরিণত কবি-মনে যে ভাবের অস্বাভাবিক ও বিভীষিকাময় তত্ত্ব-প্রকাশ এখানে তাহারই ব্যক্তিমনের আবেগে দ্রবীভূত, সহজ সুষমা-গ্রথিত রূপের উৎসার। দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়া প্রেমের একটি অসম আবেগ, একটি চারিত্রিক উৎকেন্দ্রিকতা সহজভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। রাহুর করাল ছায়া অপসারিত হইয়া একটি আত্মধিক্কারক্ষুণ্ণ, নিষ্ঠাহীন প্রেমের মেঘম্লান জ্যোৎস্না ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। 'নিষ্ফল কামনা'য় প্রেমের দার্শনিক তাৎপর্য, উহার উপভোগের উপযোগী সুষ্ঠু মনোভাবের তত্ত্বপ্রধান আলোচনা পাওয়া যায়।

'ধ্যান,' 'পূর্বকালে' ও 'অনন্ত প্রেম'—'মানসী' কাব্যের শেষাংশের তিনটি প্রেম-কবিতা—'চিত্রা' ও 'সোনার তরী'র স্তরে উত্তরণের পূর্বাভাস। রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কবিতার যে আসন্ন রূপান্তর, উহার অসীমাভিসার-প্রবণতার পূর্বলক্ষণ এই তিনটি কবিতায় ব্যঞ্জিত। 'মানসী' স্তরের কবিতাগুলি মনস্তত্ত্বের সীমায়, ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত ভাবলোকে আবদ্ধ ছিল। উহাদের মধ্যে আদর্শবাদের গভীর অনুরঞ্জন, কল্পনার ঊর্ধ্বালোকবিহার ও অধ্যাত্মচেতনার সর্বব্যাপকতা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত ছিল। প্রেমিক-প্রেমিকার মনো-ভাবের দিগ্‌বলয় উহাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির পরিধিকে সাধারণতঃ অতিক্রম করে নাই। 'চিত্রা' ও 'সোনার তরী'-তে প্রেমের ঊর্ধ্বাকাশযাত্রা ও অনন্তাভিমুখিতার পালা আরম্ভ হইল। আরও পরবর্তী স্তরে 'পূরবী'-তে প্রণয় পূর্বস্মৃতিবিভোর ও জটিলসূত্রগ্রথিত 'মহুয়া'-তে বসন্তপ্রকৃতির নিগূঢ় প্রাণচেতনায় উদ্দীপ্ত ও বর্ণবিহ্বলতায় রঙ্গীন। 'মানসী'-তে নবীন প্রেমের সরল, মনস্তত্ত্ব-অনুবর্তী পথে যাত্রারম্ভ। এই তিনটি কবিতায় কিন্তু নূতন সুর বাজিয়াছে। প্রেম এখন আপন সীমাকে লঙ্ঘন করিতে উদ্যত। অনাদি অতীত ও অনন্ত ভবিষ্যৎ বর্তমানের অনুভূতির উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়া উহাকে অসীম-অভিসারে প্ররোচিত করিয়াছে। একটি প্রেমের মাঝারে "সকল প্রেমের স্মৃতি, সকল কালের সকল কবির গীতি" মিশিতে চলিয়াছে। স্বপ্নোত্থিত নির্ঝর প্রথম, স্রোতস্বিনীর স্বচ্ছন্দ প্রবাহে, ও তাহার পর সমুদ্রের সীমাহীন বিস্তার ও অতল গভীরের দিকে আপনার পরিণতির পথ খুঁজিতে ছুটিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-চেতনা ধীরে ধীরে উন্মেষিত হইয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে স্ব-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। প্রথম যুগে কবিমনের কুয়াশা ও রূপসুষমাহীন তত্ত্বচিন্তার অতিব্যাপ্তির ফাঁকে ফাঁকে নিসর্গ সৌন্দর্যের ক্ষীণ, বিচ্ছিন্ন আভাস উঁকি দিয়াছে। এই বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিতগুলি কবিপ্রাণের পরোক্ষ অনুরাগের চিহ্ন বহন করিলেও কোন অখণ্ড তাৎপর্য ও রসনিবিড়তা লাভ করিতে পারে নাই। 'মানসী'-তে প্রকৃতির রূপ-আস্বাদনে তত্ত্বচিন্তাই প্রথম প্রথম প্রধান হইয়া উঠিয়াছে।

'নিষ্ঠুর সৃষ্টি,' 'প্রকৃতির প্রতি,' 'সিন্ধুতরঙ্গ,' 'শূন্য গৃহে' প্রভৃতি কবিতায় প্রকৃতির নিঃস্নেহ ঔদাসীন্য ও মানবজীবনের মায়ামমতার সহিত উহার আপাত-বিরোধ কবিচিত্তে বিষাদ-ভাবনা জাগাইয়াছে। ইহাদের প্রকাশসৌষ্ঠবের সঙ্গে ভাবসংশয়ের সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। 'কুহুধ্বনি', 'শ্রান্তি', 'সন্ধ্যায়' প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক কয়েকটি কবিতায় প্রকৃতির শব্দ-রূপ ও ভাবাবহের মধ্যে কবিচিত্ত জীবন-তাৎপর্যের কেন্দ্রবিন্দুটি খুঁজিয়াছে। এগুলিতে মনে হয় যে প্রকৃতি-প্রভাবের কেন্দ্রিকতা তত্ত্বরূপে, অনুভূতি-প্রগাঢ়তা ব্যতীতই, কবির নিকট প্রতিভাত হইতে চলিয়াছে।

'মানসী'-তে প্রকৃতির প্রধান সক্রিয়তা প্রণয়াবেশের সহিত সহযোগিতায়, উহার ব্যাপ্তি ও ভাবনিবিড়তা—সম্পাদনে। অবশ্য তত্ত্বপ্রধান কবিতাবলীতেও দার্শনিক মননের অন্তরালে সমুদ্র ঝটিকার উন্মত্ত আস্ফালন, বায়ুতাড়িত ফেনপুঞ্জের "তীক্ষ্ণ শ্বেত রুদ্র হাসির" বর্ণনা প্রকৃতির সঙ্গে কবির চিত্তসংযোগের পরিচয় দেয়। প্রেমের খেলায় শ্রান্ত প্রেমিক-হৃদয়ের উদাস দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সুর মিলাইয়া—

থেকে থেকে সন্ধ্যাবায় করে ওঠে হায় হায়
অরণ্য মর্মরি উঠে কাঁপিয়া কাঁপিয়া। (পুরুষের উক্তি)

নির্জন সন্ধ্যা-গোধূলিতে স্নানরতা প্রণয়িনী সরমহীনভাবে নিজ অঙ্গ-সুষমাকে অনাবৃত করিয়া দেয়, কেননা সে দেখে যে প্রকৃতিই তাহার চারিদিকে ছায়ান্তরাল রচনা করিয়াছে—

বনের ছায়া ধরার চোখে
দিয়েছে পাতা টানি। (অপেক্ষা)

'সুরদাসের প্রার্থনা'-য় অন্ধতা-বরণের ঠিক প্রাক্-মুহূর্তে প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য, চিরতরে হারানোর উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে, উত্তেজিত কল্পনার গাঢ়বর্ণে সুরদাসের মানস নেত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নাটকীয় সংঘাত-তীব্রতার সূত্রে বিচ্ছিন্ন দৃশ্য পরস্পর একটি নিবিড় ভাবগত ঐক্যে বিধৃত হইয়াছে। 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ'—কবিতায় দুইটি বিপরীত মনোভাবের পাশাপাশি স্থাপনের পরিহাস-সরস পরিবেশে কবির প্রকৃতি বর্ণনা এক অপ্রত্যাশিত ভাবসূক্ষ্মতা ও কল্পনা-সমুন্নতির পর্যায়ে আরোহণ করিয়াছে।

এ বর সাধারণ ভাবোচ্ছ্বাস প্রবণ বঙ্গ-যুবক নয়, উহার কণ্ঠ হইতে রবীন্দ্রভারতী উদ্‌গীরিত হইয়াছে। 'ভালো করে বলে যাও' নামে একটি মধ্যমশ্রেণীর প্রেমকবিতাতে প্রকৃতি অকস্মাৎ প্রেমিকার ব্যাকুল অন্তঃকরণ হইতে কথা বলিয়া উঠিয়াছে :—

আজি অন্ধতামসী নিশি।
মেঘের আড়ালে গগনের তারা
সবগুলি গেছে মিশি।
শুধু বাদলের বায় করি হায় হায়
আকুলিছে দশ দিশি।

প্রকৃতির সুর ও মানবের হৃদয়তন্ত্রী সহানুভূতির এক যুগ্ম সুরে একযোগে ধ্বনিত হইয়াছে।

'মরণ স্বপ্ন' কবিতাটি বিশেষ জনপ্রিয় নয়, কিন্তু এই কবিতাটিতে তাঁহার প্রথম যুগের শিথিল দার্শনিক তত্ত্বকল্পনা একটি সংসক্তিনিবিড়তা লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যপরিণতি যে এই তত্ত্ববাষ্পকে আত্মসাৎ করিয়াছে ও রূপঘনতা দিয়াছে ইহাতেই উহার অগ্রগতির সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। জীবনতত্ত্বানুভূতিতেও কবির মনন আরও গভীর ও গূঢ়ানুপ্রবেশী হইয়াছে, বোঝা যায়। 'কুহুধ্বনি', 'জীবন-মধ্যাহ্ন,' 'কবির প্রতি নিবেদন,' 'ভৈরবী গান', 'বিদায়' প্রভৃতি কবিতায় কবির জীবন-সমীক্ষা ক্রমশঃ ভাব-সংহত ও ব্যক্তিঅনুভূতিকেন্দ্রিক হইয়া উঠিতেছে। জীবন-ব্যাখ্যাতারূপে তাঁহার অন্তর্দৃষ্টি ও প্রকাশসৌষ্ঠব সার্বভৌম তাৎপর্যের মর্যাদালাভের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

'মানসী'-তে এক শ্রেণীর কবিতা আছে যাহাতে কবির ব্যঙ্গাত্মক মনোভাব প্রকট। মনে হয়, এই কাব্যগ্রন্থেই কবির কবিসুলভ মধুর রসের সহিত যে অম্লরসের বিসদৃশ মিশ্রণ ছিল তাহার শেষ-নিঃসার উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহার পর কবির কাব্যে প্রসন্ন নির্মল হাস্যরস ছাড়া আক্রমণাত্মক তিক্ত উত্তেজনা বিশেষ দেখা যায় না। মিষ্টরসের প্লাবন আসিয়া সমস্ত নোনা স্বাদকে ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ 'মানসী'-তে কৈশোরসুলভ অম্লরসপ্রিয়তা অতিক্রম করিয়া পরিণতশক্তি কবির সৌন্দর্যস্থিরতায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। 'দুরন্ত আশা'-য় কৌতুক-কটাক্ষ ও বিচিত্র জীবনরস-পিপাসার সহাবস্থান উভয় রসকেই ঘনীভূত ও আস্বাদ্যতর করিয়াছে—লঘু ব্যঙ্গের আদি ও অন্ত্য স্তরের মধ্যবর্তী আত্মপ্রসারণের গভীর সুরটি আরও অর্থগ্রাহী হইয়াছে। 'দেশের উন্নতি' 'বঙ্গবীর' বাঙালী-জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার শ্লেষতীক্ষ্ণ উদ্‌ঘাটন, তবে ইহাদের অযথা দৈর্ঘ্য ইহাদের আঘাতকে অনেকটা লঘু করিয়াছে। ধনুর্বিদ্যায় নবদীক্ষিত তরুণ তীরন্দাজ লক্ষ্যবেধ অপেক্ষা ইতস্ততঃ নিজ শরক্ষেপনৈপুণ্যের যদৃচ্ছপ্রয়োগ করিতেই বেশী

ব্যস্ত। এই সাধারণ আক্রমণের মধ্যে কবির সাহিত্যিক জীবনের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণ নিন্দুকদের সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিমান অপেক্ষাকৃত নিগূঢ়তর সুর-প্রবর্তনের হেতু হইয়াছে। 'নববঙ্গদম্পতির প্রেমালাপ'-কবিতায় অলস প্রেমনিবেদনের অসংগতি কাব্যাধারে যে ছিদ্র রচনা করিয়াছে তাহার মধ্য দিয়া অপূর্ব কাব্যের সুরভিত নির্যাস প্রায় সবটাই নির্গত হইয়াছে, কিন্তু যে কয়েকটি বিন্দু অবশিষ্ট আছে, তাহারই গন্ধ আমাদের অনুভূতিকে বিহ্বল করিয়া তোলে। কবি যে ব্যঙ্গের দ্রাবকরসে জীর্ণ পাত্রে এই অমৃত পরিবেশন করিয়াছেন তাহাতেই মনে হয় যে তাঁহার বিমিশ্র মনোভাব এখনও সম্পূর্ণ-ভাবে কবিস্বভাবোচিত সৌন্দর্যশাসন মানে নাই। তবে উপহাসের বিপরীত পথেই কবি প্রণয়ের আদর্শরূপের প্রতি তাঁহার ভালবাসা প্রকাশ করিয়াছেন।

'মানসী' কাব্যের সর্বশ্রেষ্ঠ দুইটি রচনা—'মেঘদূত' ও 'অহল্যার প্রতি'। এই কবিতাদ্বয়ে কবির কাব্যকলা পরিণতির এক নূতন ঊর্ধ্বায়ন লাভ করিয়াছে। ইহারা গীতিকবিতার আবেগোচ্ছল সুরে ও স্বতঃউৎসারিত ছন্দঃস্পন্দে লেখা নয়। ইহাদের মধ্যে গভীর মনন, মননের অনুরূপ ভাবমন্থর ও ভাবপ্রয়োজননিয়ন্ত্রিত ছন্দ অতীত যুগের মহাকবির ভাবধারাকে নূতন তাৎপর্যমণ্ডিত করিয়া নিজস্ব করার বিরল শক্তি, জড়প্রকৃতির মধ্যে প্রাণচেতনা-উদ্বোধনের মৌলিক, রূপান্তরকারী কবিদৃষ্টি—আশ্চর্য সমন্বয়ে মিলিত হইয়াছে। কবি আর শুধু প্রেমকবিতা ও গীতিকাব্য উৎসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবেন না —এখানে তাহার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ঘোষিত। তিনি কেবল লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মতো শুধু আবেগের ঊর্ধ্বাকাশে বিচরণ করিবেন না; তিনি জীবনের গভীর তলদেশ হইতে কাব্য-উৎস অবারিত করিয়া, জীবন-সত্যের সমস্ত ভার বহন করিয়া ও অভিনব, চমকপ্রদ কল্পনার সমস্ত নব নব পথচারী-লীলা সঞ্চরণকে এক নিগূঢ়, অমোঘ তাৎপর্যে সংহত করিয়া কাব্যোৎকর্ষের এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করিয়াছেন। আবেগ ও মনন, কবিকল্পনা ও সুগভীর জীবন রহস্যবোধ, সংযম ও উচ্ছ্বাস, কাব্যপাঠ ও বিজ্ঞানতথ্যের দিব্য কাব্য-রূপান্তরের এরূপ অপূর্ব সমন্বয় বাংলাসাহিত্যে নূতন। কবি-ভবিষ্যৎ আমাদের সমস্ত পূর্বধারণাকে বিপর্যস্ত করিয়া এক অজ্ঞাত সম্ভাবনার রোমাঞ্চদীপ্তিতে আমাদের সামনে জ্যোতিষ্কের মতো উদ্ভাসিত হইল।

॥ পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ ॥

প্রেমেন্দ্র মিত্র

উদ্ভিদ-জগতে ফণিমনসার মতো ক্যাক্টাস-জাতীয় গাছ যেমন আছে তেমনি আছে অশথ বট শাল শিমুল। এক জাতের গাছ নিজেকে নিজের মধ্যে মুড়ি দিয়ে সংগোপন করে রাখে, বাইরে নিজেকে যতটুকু কম প্রকাশ করে রাখা যায় তারই চেষ্টায়। আর অন্য জাতের গাছ ডালপালার বিস্তারে ফুল আর পাতার অজস্রতায় নিজেকে শুধু মেলে ধরবার জন্যই উন্মুখ; সেই আনন্দে বিভোর। আকাশ-বাতাস রোদ-বৃষ্টিতে সে উচ্ছ্বসিত হয়ে সাড়া দেয় প্রতি পলে পলে। জমিয়ে রাখার কোনো গরজ তার নেই। প্রতিক্ষণের পাওনা প্রতিক্ষণেই সে অসংকোচে ফেলে-ছড়িয়ে দিয়ে যায় ডালপালা দুলিয়ে পাতা গজিয়ে কাঁপিয়ে-ঝরিয়ে।

গাছপালার জগতে যেমন মানুষের মধ্যেও তেমনি এই দুই জাতই আছে; এমন কি সাহিত্যের রাজ্যেও।

প্রকাশ করাই সাহিত্য। তবু এমন সাহিত্যিকও অনেক আছেন ক্যাক্টাসের মতো যাঁরা প্রকাশ-কৃপণ। তাঁরা অনেক সঞ্চয়ের পর কদাচিৎ কিছু দুর্লভ ফুল ফোটান হয়ত, কিন্তু প্রতিমুহূর্তে সবকিছুতেই সাড়া দেবার শক্তি বা উৎসাহ তাঁদের নেই।

সাহিত্যের রাজ্যে সৃষ্টি ও জীবনের সবকিছুতে অনায়াস সাড়া দেবার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথে। মানুষের চেতনায় যা প্রতিফলিত হয়, তার মধ্যে মূল্যবান এমন-কিছু নেই বললেই হয়, যা তাঁর লেখনীমুখে রূপান্তরিত হয়ে বিচ্ছুরিত হয়নি।

সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রকেই উর্বর করে তুলে তিনি বিস্ময়কর নতুন ফসল ফলিয়েছেন তবু তাতেও তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয় ধরা পড়ে না বলে মনে হয়। পরমাশ্চর্য এক বাদ্যযন্ত্রের মতো এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পর্শসচেতন তাঁর মন যে ছুঁতে না ছুঁতেই বেজে ওঠে। তাঁর সেই মনের রণন আমরা কবিতা গান গল্প উপন্যাস নাটক প্রবন্ধ ছবি ইত্যাদি সব-কিছুতেই পেয়েছি কিন্তু সবচেয়ে তা স্বতঃস্ফূর্ত স্বাচ্ছন্দ্যে ও বৈচিত্র্যে তাঁর পত্রাবলীতে পেয়েছি যদি বলি, খুব অত্যুক্তি হয় কি?

চিঠি তো আমরা সবাই লিখি, সাহিত্যিকেরা তো বটেই। নানা দেশের নানা যুগের প্রতিভাধরদের চিঠি সাহিত্যের একটি বিশেষ বিভাগই সৃষ্টি করেছে। অনেক সাহিত্যিকের রচনার চাবিকাঠি তাঁর চিঠির মধ্যে পাওয়া যায়, চিঠির ইঙ্গিতে ও আলোয়

কোনো কোনো লেখককে আমরা নতুন করে চিনি।

শুধু সাহিত্য কি সাহিত্যিককে বোঝানো চেনানো কিংবা সাহিত্যস্থষ্টির নেপথ্যে তাঁর চিন্তা-ভাবনার পরিচয় দেওয়া ছাড়াও চিঠিপত্রের আর-একটি বিশেষ মূল্য ও আকর্ষণ আছে। সে মূল্য ও আকর্ষণ একদিক দিয়ে সার্থক-সাহিত্যের চেয়ে বেশী বই কম নয়।

চিঠিপত্র যেখানে স্বতঃউৎসারিত সেখানে তার মধ্যে এমন-একটা অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা থাকে যা মার্কামারা সাহিত্যের পক্ষে শুধু দুরায়ত্ত নয় কিছুটা প্রকৃতি-বিরুদ্ধও বটে। সাহিত্য যত সহজই হোক তার একটু পোশাকী ভাব যাবার নয়। তাকে সচেতনভাবে সভায় গিয়ে বসতে না হোক পাঁচজনের সামনে বার হতে হয়। চুলের পাট কি পোশাকের ভাঁজটা তাই সে অবজ্ঞা করবার কোথাও চেষ্টা করলেও ভুলে থাকতে পারে না একেবারে। অযতনের ভঙ্গিটার মধ্যেও সযত্ন-প্রয়াস তাই নিজেরও অগোচরে লুকিয়ে থাকে।

স্বতঃস্ফূর্ত চিঠিপত্রের জাত ও চেহারাই কিন্তু একেবারে আলাদা। বাইরে যিনি বিশিষ্ট, এ যেন তাঁকে ঘরের-মানুষ হিসেবে অসতর্ক অন্যমনস্কতার সুযোগে পাওয়া।

অসামান্যদের সব-চিঠিপত্র অবশ্য এমন নয়। বাঁধা-ধরা প্রসঙ্গ-সীমার শাসন একটু-আধটু শিথিল করে নিয়েও অনেকের অনেক চিঠি ধারালো ও ভারালো পোশাকী সাহিত্যেরও মহলা। যেমন গ্যেটের চিঠির কথা বলা যায়। গ্যেটে জীবনে প্রায় দশহাজার নাকি চিঠি লিখেছেন, তাঁর শিলার শ্লেগেল ও তখনকার দার্শনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তানায়কদের কাছে লেখা বিখ্যাত চিঠিগুলি, বিষয়বৈচিত্র্যে অপূর্ব ও বাক্‌বৈদগ্ধে উপাদেয় হলেও বিশুদ্ধ চিঠির চেয়ে ভাষণেরই নিকটাত্মীয়।

রবীন্দ্রনাথ এধরনের চিঠিপত্র লেখেন নি এমন নয়। শাঁসালো ধারালো গুরু-গম্ভীর বিষয়ের আলোচনা অনেকের সঙ্গে অনেক চিঠিতে তিনি করেছেন। কখনো উপদেষ্টা কখনো ব্যাখ্যাতার আসনে বসে ভাষণ-জাতীয় চিঠিও তাঁকে লিখতে হয়েছে কিন্তু তাঁর যে-চিঠির জন্যে আজও সুদূর-কালের পাঠকসমাজ চিরকৃতজ্ঞ থাকবে তার উৎস প্রেরণা ও প্রকৃতি সবই ভিন্ন। সে চিঠি আকাশ-বাতাসের আমন্ত্রণে ও স্পর্শে অরণ্যের পাতা-ধরা ও ঝরার মতো অনায়াস স্বতঃস্ফূর্ত। এসব চিঠি যাদের লেখা হয়েছে তারা উপলক্ষ্য মাত্র। অন্তরের অদম্য আনন্দোচ্ছলতায় এসব চিঠি লেখা হয়েছে, কোনোখানে কোনো লাভের আশা না রেখে বাইরের কোনো তাগিদ ছাড়া-ই।

এসব চিঠির গূঢ় রহস্যের কথা রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যেতে পারে।

তিনি বলছেন······সৃষ্টির একটা দিক আছে যেটা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার বিশুদ্ধ বকুনি। সেদিক থেকে এমনও বলা যেতে পারে—তিনি আমাকে চিঠি লিখছেন। আমার কোনো

চিঠির জবাব নয়, তাঁর আপনার বলতে ইচ্ছা হয়েছে বলে। কাউকে তো বলা চাই। অনেকে বলে, এ তো সারবান নয়। এ তো বন্ধুর আলাপ, এ তো সম্পত্তির দলিল নয়। ......আমি একটা গর্ব করে থাকি, ঐ চিঠি-লিখিয়ের চিঠি পড়তে পারৎপক্ষে কখনো ভুলিনে। বিশ্ববকুনি যখন-তখন আমি শুনে থাকি।

রবীন্দ্রনাথ বিধাতার সেই বিশ্ববকুনি শুধু শোনেন নি, তাই আবার আমাদের শুনিয়েছেন। তিনি শুনেছেন দেখেছেন আর দেখিয়েছেন শুনিয়েছেন তাঁর সেই অপরূপ মুকুর-স্বচ্ছ ভাষায় কোনো ক্যামেরা কি রেকর্ডার যার নাগাল পায় না।

তিনি যা দেখেছেন শুনেছেন তাও সাধারণ শ্রাব্য দ্রষ্টব্যের কোঠায় তো পড়ে না। সে দেখা-শোনা তথাকথিত বিজ্ঞ বিদ্বান বিচক্ষণের দেখাশোনা নয়। এ যেন এক আশ্চর্য চিরশিশুর তীক্ষ্ণ সজাগ চেতনা যা এই বিশ্বলীলার সব-কিছু মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রতিফলিত করে।

এই দেখা-সম্বন্ধেই তিনি বলেছেন,—মোহের কুয়াশায় অভ্যাসের আবরণে সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে 'আছে' বলে অভ্যর্থনা করবার আমরা না পাই অবকাশ না পাই শক্তি। সেইজন্যে জীবনের অধিকাংশ সময় আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চলেছি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই মারা গেলাম।

তিনি আবার বলছেন,—আমি বলি দেখো। তবেই দেখাতে পারবে। সত্তার প্রবাহিনী ঝরে পড়ছে। তারই স্রোতের জলে মনের অভিষেক হোক। ছোটো বড় সুন্দর অসুন্দর সব-কিছু নিয়ে তার নৃত্য। সেই প্রকাশ-ধারার বেগ চিত্তকে স্পর্শ করলে চিত্তের মধ্যেও প্রকাশের বেগ প্রবল হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের সারা-জীবনের অগণন চিঠিপত্রের মধ্যে প্রবাহিনী-সত্তার এই নিরন্তর বিচ্ছুরণই আমরা সবচেয়ে বেশী করে পাই।

সতেরো-আঠারো বছর বয়সে লেখা 'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে'ই তার স্পষ্ট আভাস।

লিখছেন,—মেঘ বৃষ্টি বাদল অন্ধকার শীত—এ আর একদণ্ডের তরে ছাড়া নেই। আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয় তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ বজ্র বিদ্যুৎ ঝড়—তাতে কেমন একটা উল্লাসের ভাব আছে। এখানে এ তা নয়, এ টিপ-টিপ করে সেই একঘেয়ে বৃষ্টি ক্রমাগতই অতি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলেছে তো চলেছেই। রাস্তায় কাদা, পত্রহীন গাছগুলো স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে, কাঁচের জানালার ওপর টিপ-টিপ করে জল ছিটিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশে স্তরে-স্তরে মেঘ করে। এখানে আকাশ সমতল, মনে হয় না যে মেঘ করেছে। মনে হয় কোনো কারণে আকাশের রংটা ঘুলিয়ে গিয়েছে, সমস্তটা জড়িয়ে স্থাবর জঙ্গমের একটা অবসন্ন মুখশ্রী। লোকের মুখে সময়ে-সময়ে শুনতে পাই বটে যে কাল বজ্র ডেকেছিল কিন্তু বজ্রের নিজের এমন গলার জোর নেই যে তার মুখ

থেকেই সে খবরটা পাই। সূর্য তো এখানে গুজবের মধ্যে হয়ে পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম-জীবনের লেখা চিঠিপত্র থেকে এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি এই জন্যেই করলাম যে পরবর্তী সারা-জীবনে তাঁর পত্রসাহিত্য যে অভিনব রসলোক সৃষ্টি করবে তার সূচনা এইখানেই দেখা যায়।

'য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে' ওই বয়সের এক যুবকের পক্ষে প্রায় অবিশ্বাস্য বিচারবোধ ও পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় যেমন পাই সেই সঙ্গে পাই সেই দুর্লভ প্রকৃতি-চেতনার প্রথম উন্মেষ যা তাঁকে পৃথিবীর সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে মহিমাময় স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে।

সত্যিকথা বলতে গেলে য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে একটু অবহিত হলে ভাবী রবীন্দ্রনাথের বিরাট বিচিত্র প্রতিভার অনেক অঙ্কুরই বোধহয় পাওয়া যায়। তাঁর পত্রালাপের সমস্ত সুরের মেলার তো বটেই। স্নিগ্ধ শান্ত মধুর করুণ থেকে কৌতুকোজ্জ্বল শ্লেষতীক্ষ্ণ প্রায় সমস্ত রসই তার মধ্যে উপস্থিত।

য়ুরোপ তাঁর আগেও অনেকে গেছেন, তাঁর পরেও। সে যুগের সে য়ুরোপও আর নেই। কিন্তু সেই য়ুরোপের যে ছবি তিনি সেই বয়সে এঁকে গেছেন তার তুলনা আমাদের ভাষায় অন্তত এখনো আর কোথাও পেয়েছি বলে মনে পড়ে না। এ রচনার বিশেষত্ব এইখানে যে সত্যিই আগাগোড়া তা চিঠির মেজাজে লেখা—সেই স্বত-স্বাভাবিক স্রোত যা অবলীলাক্রমে বয়ে যায় আর তরল লঘু ভঙ্গিতেই একটু ছুঁয়ে অনেক-কিছু প্রকাশ করে।

য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রে যা শুরু পত্রালাপের সেই আশ্চর্য অভিনব রসমাধুর্য ও বৈচিত্র্য আরো পরিণতভাবে তাঁর সারা-জীবনের অজস্র চিঠিতে নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তবু নমুনা হিসেবে তাঁর ভাবী পত্রসাহিত্যের বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গীর কয়েকটি অঙ্কুর সেখানে লক্ষ্য করা যেতে পারে। যেমন, হাল্কা কৌতুকরসের সাক্ষাৎ তো প্রথম পত্রের শুরু থেকেই পাই। সমুদ্রে প্রথম পাড়ি দিয়েই সমুদ্র-পীড়ায় ছ'দিন শয্যাশায়ী থাকার পর প্রথম এডেনের কাছাকাছি এসে বিছানা ছেড়ে উঠে লিখছেন,—বিছানা ছেড়ে তো উঠলাম। উঠে দেখি যে সত্যিই ইঁদুরের মতো দুর্বল হয়ে গেছি। মাথা যেন ধার-করা, কাঁধের সঙ্গে তার ভালো করে বনে না। চুরি-করা কাপড়ের মতো শরীরটা যেন আমার গায়ে ঠিক লাগছে না।

টনব্রিজ ওয়েলসের স্বাস্থ্যকর জলের উৎস সম্বন্ধে লিখছেন,—উৎস শুনেই কল্পনা করেছিলাম না জানি কী সুন্দর দৃশ্য হবে। চারিদিকে পাহাড়-পর্বত গাছ-পালা সারস-মরালকুল-কূজিত কমল-কুমুদ-কহ্লার-বিকশিত সরোবর, কোকিলকূজন মলয়বীজন ভ্রমরগুঞ্জন ও অবশেষে এই মনোরম স্থানে পঞ্চশরের প্রহার ও এক ঘটি জল খেয়ে

বাড়ি ফিরে আসা। গিয়ে দেখি একটা হাটের মধ্যে একটা ছোটো গর্ত পাথর দিয়ে বাঁধানো।

পরে সেই জায়গা সম্বন্ধে আবার লিখছেন,—যখন টনব্রিজ ওয়েলসে ছিলাম তখন ভাবতুম এখানে যদি মদন থাকে, তবে অনেক বনবাদাড় ঝোপঝাপ কাঁটাগাছ হাতড়ে দু'চারটে বুনো ফুল নিয়েই তাকে কোনমতে ফুলশর বানাতে হয়—

য়ুরোপ ও বিলেতের মানুষজন আচার-ব্যবহার সামাজিক রাষ্ট্রিক রীতিনীতির অম্লমধুর সরস বিবরণের মাঝে সেই যুগেও রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-তন্ময়তার পরিচয় নানা জায়গায় ছড়ানো। একটি উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হয়েছে। আর-একটিও এই সূত্রে দিলে বোধহয় বাহুল্য হবে না।

ডেভেনসায়ারের সমুদ্রতীর সম্বন্ধে লিখছেন,—এখানকার সমুদ্রের ধার আমার বড় ভালো লাগে। যখন জোয়ার আসে তখন সমুদ্রতীরে খুব প্রকাণ্ড পাথরগুলো জলে ডুবে যায়, তাদের মাথা বেরিয়ে থাকে। ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো দেখায়।…এক-একটা পাহাড় সমুদ্রের জলের ওপর খুব ঝুঁকে পড়েছে, আমরা প্রাণপণ করে এক-এক দিন সেই অতিদুর্গম পাহাড়গুলোর ওপর উঠে বসে নিচে সমুদ্রের ঢেউ-এর ওঠা-পড়া দেখি। শব্দ উঠছে, ছোট-ছোট নৌকো পাল তুলে চলে যাচ্ছে, চারিদিকে রোদ্দুর, মাথার ওপর ছাতা খোলা…আলস্যে কাল কাটাবার এমন জায়গা কোথায় পাব?

এই বর্ণনা আমাদের মনকে আপনা থেকেই সুদূর ইংলণ্ডের সমুদ্রতীর থেকে বাংলার প্রান্তে অপরূপ একটি নদীর রাজ্যে নিয়ে যায় না কি? ডেভনসায়ারের টর্কির সমুদ্রকূল থেকে শিলাইদহের পদ্মার ভৌগোলিক দূরত্ব যতই হোক য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রই ছিন্নপত্রে পৌঁছোবার প্রথম সেতু।

রবীন্দ্রনাথ সারা-জীবনে কত চিঠি লিখেছেন তা পণ্ডিতদের কাছে জানবার অপেক্ষায় রইলাম। আমাদের তা গণনার বাইরে। তাঁর চিঠিপত্রের সন্ধান আজও শেষ হয় নি, এখনও তা প্রায় অফুরন্তভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। মহারণ্যের পত্রপুঞ্জের মতোই তাঁর চিঠির রাশি তিনি দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সে সমস্ত চিঠি সংগৃহীত হবার পরও কিন্তু ছিন্নপত্রের মর্মরই তার মধ্যে প্রধান বলে জানা যাবে বলে মনে হয়!

ছিন্নপত্র শুধু রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রের মধ্যেই নয় পৃথিবীর সমস্ত পত্র-সাহিত্যের মধ্যেও অনন্যপূর্ব বললে বোধহয় বেশী বলা হয় না। বাংলাসাহিত্যে শুধু নয় বাংলাভাষার বিবর্তনে, ছিন্নপত্র ও তাঁর সেই প্রথম যৌবনের য়ুরোপপ্রবাসীর পত্রের দান তো অবিস্মরণীয়। তা এখনো আমাদের যথোচিত সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি পায়নি বলেই সন্দেহ হয়।

বাংলা গদ্যে কথ্যভাষার সাবলীল বেগ প্রথম সঞ্চারিত করবার দুঃসাহসী সার্থক পরীক্ষা 'সবুজ পত্রে'র ঘোষণামুখর আন্দোলনের বহুপূর্বে রবীন্দ্রনাথই করেছিলেন।

কিন্তু ছিন্নপত্রের কাছে ভাষার এই মুক্তি-প্রেরণা আমাদের উপরি-পাওনা মাত্র। ছিন্নপত্রে আমরা এমন-কিছু পাই, যে-কোন দেশের সাহিত্যে যা দুর্লভ। তুলনা হিসেবে অ্যামিয়েলস জার্নাল বা সেই জাতীয় কিছু যদি মনেও আসে একটু বিচার করলেই রবীন্দ্রনাথের চিঠির সঙ্গে তার পার্থক্য বুঝতে কষ্ট হবে না। রবীন্দ্রনাথের পত্র রোজনামচা তো নয়ই, এমন কি সচেতন চিন্তাবিলাসও নয়; তা যেন আশ্চর্য এক আনন্দঘন চেতনার গুঞ্জন যা অন্তরঙ্গভাবে উপভোগ করবার আশাতীত সৌভাগ্য আমরা পেয়েছি। সাহিত্যের অন্য যে-সব ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ সচেতন স্রষ্টা, সেখানে অসামান্য সব কীর্তি তিনি রেখে গেছেন আমাদের মুগ্ধ বিস্ময় জাগাতে, কিন্তু তাঁর চিঠিপত্রে আমরা যা পাই তা যেন তাঁর সেই প্রবাহিনী সত্তারই অবিরাম আত্মবিভোরতার কলতান, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যেও সচেষ্ট যে কৃত্রিমতাটুকু প্রায় অপরিহার্য বলা যায় তাও যার মধ্যে অনুপস্থিত।

রবীন্দ্রনাথ গতানুগতিক আত্মজীবনী লিখে যান নি এবং তার বিস্তারিত জীবনী লেখার উপকরণ দুষ্প্রাপ্য বলে অনেককে দুঃখ করতে শুনি। এমন কি তাঁর পঠিত পুস্তকের তালিকা না পাওয়ার জন্যেও নাকি আক্ষেপ শোনা যায়। আমার তো মনে হয় এ যেন তীর্থদর্শন সেরে এসে ছাপানো টাইম-টেবল না পাওয়ার আক্ষেপ। তীর্থ মানে তো স্টেশনের খবর, গাড়ি-বদলের হদিশ আর পাণ্ডার নাম-ঠিকানা নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষের জীবনও তেমনি নয় শুধু কটা বাইরের ঘটনা আর তারিখের ফিরিস্তি, স্থূল কৌতূহল মেটাবার ঘটনানির্ভর বিবরণ নয়, রবীন্দ্রনাথের কাছে আরো গভীর কিছু দুর্লভ কিছু আমরা পেয়েছি,—পরমাশ্চর্য এক চেতনা-প্রবাহের প্রায় নিত্যকার দিনলিপি।

তাঁর সারাজীবনের অপরূপ অপর্যাপ্ত পত্রধারাই সাহিত্যলোকের অনন্যপূর্ব সার্থকতম আত্মজীবনী নয় কি?

[প্রথম অধিবেশন]

রবীন্দ্রনাথ, বাংলাসাহিত্য ও জাতীয় জীবন

লীলা মজুমদার

বহুকাল আগে ভীন ইং বলে একজন ইংরেজ বলেছিলেন—প্রাচ্যদেশকে জয় করা যে এত সহজ তার কারণ হল, কে রাজকর আদায় করল না-করল, তাই নিয়ে ওসব দেশের লোকেরা মাথা ঘামায় না। তারা একটা অদৃশ্য রাষ্ট্রের প্রজা, সেখানে হস্তক্ষেপ করার কারো সাধ্য নেই। আর "স্বদেশে" কবি বলছেন,—

"আমরা চতুর্দিকে মানসিক বাঁধ নির্মাণ করে, কালস্রোতকে বন্ধ করে দিয়ে, সমস্ত নিজের মনের মতো গুছিয়ে নিয়ে বসেছিলুম। চঞ্চল পরিবর্তন ভারতবর্ষের বাহিরে সমুদ্রের মতো নিশিদিন গর্জন করত, আমরা অটল স্থিরত্বের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, গতিশীল নিখিল সংসারের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে বসেছিলুম। এমন সময় কোন ছিদ্রপথ দিয়ে চির-অশান্ত মানবস্রোত আমাদের মধ্যে প্রবেশ করে সমস্ত ছারখার করে দিলে। পুরাতনের মধ্যে নূতন মিশিয়ে, বিশ্বাসের মধ্যে সংশয় এনে, সন্তোষের মধ্যে দুরাশার আক্ষেপ উৎক্ষিপ্ত করে দিয়ে, সমস্ত বিপর্যস্ত করে দিলে।"

সেইদিনই হয়েছিল আমাদের জাগরণ, জাতীয় জীবনের প্রথম ক্ষীণ-প্রাণ-স্পন্দন। তার আগে পর্যন্ত কবি বলছেন,—

"এখানে ছেলেমেয়েরা সারাদিন খেলা করে কিন্তু জানে না তা খেলা এবং বয়স্ক লোকেরা নিশিদিন স্বপ্ন দেখে, কিন্তু মনে করে তা কর্ম"। আসলে পাঠান-মোঘল-ইংরেজ আমাদের ধ্বংস করে নি, ধ্বংসের বীজ ছিল আমাদের হৃদয়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়,—

"পৃথিবীতে যেখানে এসে তুমি থামবে, সেইখান হতেই তোমার ধ্বংস আরম্ভ হবে।" আর্যদের সেই প্রচণ্ড প্রাণবেগ স্তিমিত হয়ে এল যখন, জাতীয় জীবন তখন টেঁকে কী করে? যে মানব-সম্প্রদায় যখন তার হৃদয়ের প্রকৃত লক্ষ্যের সন্ধান পেয়ে, তার সমস্ত শক্তি ও সাধনাকে সেই দিকে প্রয়োগ করে, তখনি জাতীয় জীবন স্পন্দিত হয়ে ওঠা সম্ভব হয়। নইলে শুধুমাত্র একই ভূমিখণ্ডে বাস করে একই ভাষা উচ্চারণ করে একই মন্দিরে পুজো করেও কিছু হয় না। আমাদেরও সেই লক্ষ্য হারিয়ে গিয়েছিল, আমরা পথভ্রষ্ট হয়েছিলাম।

জড় পদার্থের ওপর ছাপ দেওয়া যত সহজ, সজীব পদার্থের ওপরে ততটা নয়। সে স্থান পরিবর্তন করে, আয়তনে বাড়ে, তার নিজের ইচ্ছায় কাজ করে। তাকে আয়ত্ত

করতে হলে, এমন প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন হয়, যে তার বাইরের সমস্ত আবরণ ভেদ করে প্রাণের মর্মকোষে গিয়ে পৌঁছতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট ছাঁচে তাকে ঢালাই করা যাবে না, কিন্তু তার রক্তস্রোতে তেজ সঞ্চারিত হবে।

একটা গোটা জাতির মধ্যে, শুধু সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সে শক্তি সঞ্চার করা যায় না। বাংলাদেশেও যায় নি।

জাতীয় জীবন হঠাৎ একদিনে তৈরি হবার নয়। তার ধারা অনেকটা নদীর মতো। ইতিহাসের কোন অতীত হিমালয়ে তার উৎস ছিল, তারপর যেখান দিয়েই সে প্রবাহিত হয়েছে সেখান থেকেই কিছু পেয়েছে, কিছু খুইয়েছে, কখনো বেড়েছে কখনো কমেছে, কখনো বন্ধ্যা মরুভূমির মধ্যে দিয়ে গেছে, কখনো বা হরিৎ শস্যখেতের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু উৎস না থাকলে কে পেরেছে নদী তৈরি করতে?

নদীর বেগ কমে এলে পলিমাটি জমে ক্রমে সে গভীরতা হারায়, চড়া পড়ে, সমুদ্রে পৌঁছবার আগেই সে বাধা পায়। সে বাধা দূর করতে হলে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন হয়, কিন্তু নদীর মুখের বাধা সরে গেলে, স্রোতের বেগ আপনি আসে।

জাতীয় জীবনের বেলাও তাই। সেই প্রচণ্ড শক্তি শুধু সাহিত্য থেকে আসতে পারে না। অবিশ্যি সাহিত্যে তার প্রতিফলিত রূপটি দেখা যায়। আর শুধু সাহিত্যে কেন, শিল্পে, সাধনায়, সামাজিক চেতনায়, তার প্রাণের বিকাশ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তখনই দেখা যায় দেশজোড়া প্রতিভার বিকাশ, তখনি অপূর্ব তেজোময় সাহিত্য রচনা হয়। কিন্তু জাতীয় জীবনের চেতনা না হলে কিছুই হয় না। এ এমন জিনিষ যে মনে ভাবলেই সে অস্তিত্ব পায়, ডাকলেই সে সাড়া দেয়, সাধনা করলেই সে শক্তিমান হয়ে ওঠে।

যতদিন বাঙ্গালীরা পুরোনো নিয়মগুলিকে আঁকড়ে ধরে মুখ গুঁজে পড়েছিল, ততদিন জাতীয় জীবনের সাড়া পাওয়া যায় নি। সে ছিল মরার মতন, যকের ধন আগলানোর মতন, কারো কোনো কাজে আসছিল না।

একদা যে প্রবল আর্যশক্তি সামনে যা কিছু পেয়েছিল, তার কিছুটা ধ্বংস করে, কিছুটা আয়ত্ত করে, কিছুটা মেনে নিয়ে, সমগ্রটাকেই হৃদয়ংগম করতে পেরেছিল, সে শক্তিও খুব বেশি দিন টেঁকে নি। নদীর জল যেন দীঘিতে পড়ে থিতিয়ে গেল, প্রবাহের সঙ্গে যা এনেছিল সেও জলের নিচে সমাধিস্থ হল, তখন তাকে উদ্ধার করাই হোয়ে উঠল এক কঠিন সাধনা।

বাইবেলে আছে If salt shall lose her saltness, what shall be seasoned therewith? নুন যদি তার লবণত্ব হারায়, তবে আর সে কোন কাজে

আসে ?—ভারতের ভারতীয়তাই যদি আর চেনা গেল না, তবে রইল কী ? ইংরেজরা এসে মনে করল এই অন্ধ কুসংস্কার, এই রক্ষণশীলতা, এই কর্মবিরাগ, এই বুঝি তবে ভারতীয়তা ; এমন কি, আমাদেরই একদল প্রতিভাসম্পন্ন বাঙ্গালীও তাই মনে ক'রে, যা কিছু দেশীয়, যা কিছুকে প্রাচীন ঐতিহ্যের চিহ্ন বলা চলে, সে সমস্ত দূর করে দিয়ে, পশ্চিমের উজ্জ্বল নব্য চিন্তার পথকে আমাদের বেঁচে উঠবার একমাত্র উপায় বলে মনে করেছিলেন।

সেই ভুলের মধ্যে দিয়েই আমাদের জাতীয় জীবনের প্রাণ-সঞ্চার হয়েছিল। প্রাণ-সঞ্চার হয়েছিল তাঁদের হাতে নয়, মুষ্টিমেয় উন্নত-দৃষ্টিসম্পন্ন, উদারচেতা সত্য-সন্ধানী বাঙ্গালীর সাধনায়। রাজা রামমোহন রায়ের অনুপ্রেরণায় রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। ব্রাহ্মসমাজের সেই পথিকৃৎদের যত্নেই হয়েছিল ভারতের বর্তমান জাতীয় জীবনের উন্মেষ।

তারই পাশে হল সাহিত্যের স্থান। সত্যদ্রষ্টারা যে চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, বাংলার লেখকরা কবিরা তাকেই সমুত্থিত, সংহত, সমাহৃত, সমিদ্ধ, সমুৎসুক করে তুলেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের ঋষিরা বাংলাদেশে যে জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন, আজ সমগ্র ভারত তাকে সানন্দে গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর না থাকলেও, তাঁদেরি খুঁজে-পাওয়া জাতীয় জীবনের উৎস থেকেই এই স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। সে কথা আজ সকলের মনেও নেই।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই চেতনারই পুরোধা। সুগভীর দেশপ্রেমিক সাহিত্যিকদের মধ্যে আরো অনেকেই ছিলেন, কিন্তু দেশপ্রেম আর জাতীয়-জীবন একই লক্ষ্যে ধাবিত হলেও, এক নয়। দেশপ্রেম যখন পথের সন্ধান পায়, পাথেয় সংগ্রহ করে, কেবল মাত্র তখনি হয় জাতীয়-জীবনের শুভ উদ্বোধন। সেই পথের সন্ধান দিয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায়, পাথেয় অনেকখানিই জুগিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে বটে যে এ ক্ষেত্রে কবির চেয়ে রাষ্ট্রনেতাদের অবদানেরই বেশি মূল্য হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের মতো পরাধীন দেশে ঠিক তা হয় নি, ভাঙ্গার কাজে তাঁরা অগ্রণী হলেও, সঙ্গে সঙ্গে যদি গড়ার কাজে কবি নিজের সমস্ত উদ্যম নিবেদন করে না দিতেন, আমাদের একটা সুষ্ঠু জাতীয়জীবন গড়ে উঠতে আরো অনেক কাল কেটে যেত। আমাদের যে একটা আপনত্ব আছে, সে-কথা বুঝবার অনেক আগেই আমাদের সমস্ত সংস্কৃতি ছারখার হয়ে যেত, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে কোনো কোনো প্রাচ্যদেশে যেমন হয়েছে। সে নিঃস্বতার মহা-দুঃখ থেকে আমরা অব্যাহতি পেয়েছিলাম কেবলমাত্র একটি কারণে। পশ্চিমের দুর্বার

শক্তির সমকক্ষ হবার যোগ্য আমাদের আত্মশক্তির সাধনাও সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গিয়েছিল ব'লে।

এবং সেইজন্যই গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথকে গুরুদেব বলে ডেকেছিলেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে নানান ভাবে, নানান ভাষায়, বারবার এই কথাই শোনা গিয়েছিল যে বাংলার আলাদা করে একটা জাতীয়জীবনের কথা ভাবা যায় না। যে ভারতীয় ঐতিহ্য আবহমান কাল বিভিন্নকে সমন্বিত করে এসেছে, জাতীয়জীবনের এই ধারাকেও সে তার একান্ত আপনার ধন বলে গ্রহণ করবে। জাতীয়জীবনের কথা মনে করলেই বুঝতে পারি, কবি সমগ্র ভারতবর্ষের কথাই ভেবেছেন, বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেন নি। পূর্বে বলেছি বাঙ্গালী সাহিত্যিকদের মধ্যে দেশপ্রেমিকের অভাব ছিল না। হেমচন্দ্র, নবীন-চন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় দেশপ্রেমিকের নাম বাংলা কখনো ভুলবে না। তাঁরা দেশবাসীদের মনে আশা দিয়েছিলেন, দেহে বল দিয়েছিলেন, কণ্ঠে তেজ দিয়েছিলেন, বিশ্বসমাজের সামনে উচ্চ রব তুলে প্রমাণ করেছিলেন বাঙ্গালীরা এখনো মরে নি। কিন্তু মাতৃভুমিকে উদ্ধার করার পরে, দেশের লোকের জীবনযাত্রা কোন ধারায় চলবে, তার সুস্পষ্ট নিশানা দিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ। দেশ স্বাধীন হবার আগেই, স্বাধীন দেশের সাধারণ-জীবনের পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, নইলে আমাদের শহিদ্‌দের উত্তরাধিকার রক্ষা করা খুব সহজ হত না।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন, "ইংরেজের ছেলে জানে তাহার বাপ-পিতামহ অনেক যুদ্ধজয় দেশ-অধিকার ও বাণিজ্য-ব্যবসায় করিয়াছে। সেও নিজেকে রণগৌরব রাজ্যগৌরবের অধিকারী করিতে চায়। আমরা জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও বাণিজ্য বিস্তার করেন নাই। এইটে জানাইবার জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস। তাঁহারা কী করিয়াছিলেন জানি না, সুতরাং আমরা কী করিব তাহাও জানি না। সুতরাং পরের নকল করিতে হয়।·········আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকেরাও ক্ষণে ক্ষণে হতবুদ্ধির ন্যায় বলিয়া উঠেন, দেশ তুমি কাহাকে বল, আমাদের দেশের ভাবটা কী, তাহা কোথায় আছে, তাহা কোথায় ছিল? প্রশ্ন করিয়া ইহার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ কথাটা এত সূক্ষ্ম, এত বৃহৎ যে ইহা কেবলমাত্র যুক্তিদ্বারা বোধগম্য নয়।······কোনো দেশের লোকই আপনার দেশীয় ভাবটি কী, দেশের মূল মর্মস্থানটি কোথায়, তাহা এক-কথায় ব্যক্ত করিতে পারে না; তাহা দেহস্থিত প্রাণের ন্যায় প্রত্যক্ষ সত্য, অথচ প্রাণের ন্যায় সংজ্ঞা ধারণার পক্ষে দুর্গম। তাহা শিশুকাল হইতে আমাদের জ্ঞানের ভিতর, আমাদের প্রেমের ভিতর আমাদের কল্পনার ভিতর নানা অলক্ষ্য পথ দিয়া নানা আকারে প্রবেশ করে। সে

তাহার বিচিত্র শক্তি দিয়া আমাদিগকে নিগূঢ়ভাবে গড়িয়া তোলে; আমাদের অতীতের সহিত বর্তমানের ব্যবধান ঘটিতে দেয় না; তাহারই প্রসাদে আমরা বৃহৎ, আমরা বিচ্ছিন্ন নহি। এই বিচিত্র উদ্যমসম্পন্ন গুপ্ত পুরাতনী শক্তিকে সংশয়ী জিজ্ঞাসুর কাছে আমরা সংজ্ঞার দ্বারা দুই-চার কথায় ব্যক্ত করিব কী করিয়া।

বার বার কবি বলছেন অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ গড়া যায় না। জাতীয়জীবনের ধারা ব্যাহত হলেও, গোপন গূহ্যভাবে তার প্রবাহকে বাঁচিয়ে রাখা দরকার। তা একবার বন্ধ হয়ে গেলে, ভারতের ভারতীয়তাকেও রক্ষা করা যাবে না। If salt shall lose her saltness, what shall be seasoned therewith?

কবি আরো বলেছেন, "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিংসংশয়রূপে, অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে-সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা।·········ভারতবর্ষ একদিন আপনার সমস্ত ইতিহাসের একটি চরম তত্ত্বকে দেখিয়াছিল। মানুষের ইতিহাসে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম অনেক সময় স্বতন্ত্র ভাবে, এমন কি পরস্পর-বিরুদ্ধ ভাবে আপনার পথে চলে; সেই বিরোধের বিপ্লব ভারতবর্ষে খুব করিয়াই ঘটিয়াছে বলিয়াই এক জায়গায় তাহার সমন্বয়টিকে স্পষ্ট করিয়া সে দেখিতে পাইয়াছে।"

সেই উন্নত দৃষ্টি দিয়ে, হাজার বছরের পরিপ্রেক্ষিতে, পিছনে ফিরে এই যুগকে চেয়ে দেখলে, ইংরেজের হাতে আমাদের এই দুশো বছরের পরাধীনতাকেও, মুক্তির পথের ইঙ্গিত বলে মনে হতে পারে। এ যেন একটা মঙ্গলময় পরম দুঃখ, যা আমাদের আত্ম-বিস্মৃতি থেকে জাগিয়ে দিয়ে, ভবিষ্যতের পথে পরিচালিত করে দিয়েছিল।

এমনি করে ইতিহাসের প্রসাদ দিয়ে জাতীয় জীবন গড়ে ওঠে। যে গ্রহণ করতে শিখেছে, অথচ বর্জনের নিয়মও জানে, সে-ই সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারী হয়। সেই রকম জাতীয় জীবনেরই পথ দেখিয়েছেন কবি।

জ্ঞান, ভক্তি, কর্মের সমন্বয় সাধন করতে হলে ভারতের বহুনিন্দিত কর্মবিরাগ ত্যাগ করতে হবে। অনেকে বলে থাকেন ঐহিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার এই অভাবের গোড়াতে আছে বৌদ্ধধর্মের ইঙ্গিতে সংসার-বিরাগের প্রভাব। কবি বলেছেন "অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়-কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধ সভ্যতার প্রভাবে এদেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই।

"তাহার কারণ এই, মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই

মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেন-না তাহা আত্মারই শক্তি, পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।"

রবীন্দ্রনাথ ভারতের স্বাধীনতা চর্মচক্ষে দেখে যান নি বটে, কিন্তু যে-সব সমস্যার সম্মুখীন তাঁকে হতে হয়েছিল তার অনেকগুলিই প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেকার কথা হলেও, তাদের সমাধান আজ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। এমন কি পরাধীনতার অনেক সমস্যাই স্বাধীন ভারতে আরো প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশী প্রথাকে পুরোপুরি বর্জন করে ইংরেজি আদর্শ শিরোধার্য করার মূঢ়তা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে বহুবার বলেছিলেন। সে সমস্যার আজও সমাধান হয় নি, আমাদের জাতীয়-জীবনের স্রোতের সঙ্গে মেলে না এমন বিপরীত ধারা আজও চোখে পড়ে।

কবি পশ্চিমকে বলছেন, "তোমরা অনেক জেনেছ অনেক পেয়েছ, কিন্তু সুখ পেয়েছ কি? আমরা যে বিশ্বসংসারকে মায়া বলে বসে আছি এবং তোমরা যে এ-কে ধ্রুব সত্য বলে খেটে মরছ, তোমরা কি আমাদের চেয়ে বেশি সুখী হয়েছ?"

রাশিয়াতে গিয়ে সেখানকার শিক্ষার রূপ দেখে কবি বড় খুশি হয়েছিলেন। লিখেছেন, "এরা তিনটি জিনিস নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত আছে, শিক্ষা, কৃষি, যন্ত্র। এই তিন পথ দিয়ে এরা সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা করছে।······কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের ক্ষেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে······এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলছে।······

আমাদের দেশেও বিদ্যালয় আছে, কিন্তু বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধি বড়, সংবাদের চেয়ে শক্তি বড়, পুঁথির পংক্তির বোঝার ভারে চিত্তকে চালনা করবার ক্ষমতা আমাদের থাকে না।·········শিক্ষাবিধি সম্বন্ধে রিপোর্ট এবং বই পড়ে অনেক জানা যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষার চেহারা মানুষের মধ্যে যেটা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সেটাই সব চেয়ে বড় কাজের।"

জাতীয়-জীবনের কথা কবি যখনই ভেবেছেন তখনই মানুষকে খুব বড়ো করে দেখেছেন। নিয়ম দিয়ে মানুষ হয় না, মানুষই নিজের সুবিধার জন্য নিয়ম তৈরি করে, এই কথা বিশ্বাস করে এসেছেন। ঐ রাশিয়ার শিক্ষারই আরেকটা দিকের কথা বলছেন,—

"শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে, কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে, তা হলে হয় একদিন ছাঁচ ফেটে হবে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে কিম্বা কলের পুতুল হয়ে

দাঁড়াবে।

মানুষের ব্যক্তিত্ব যদি নষ্ট হয়, সে হবে দেশের পক্ষে বড় দুর্দিন। জাতীয় জীবন মানে এ নয় যে সমস্ত ব্যক্তিত্ব লোপ পেয়ে, সব মানুষের চেতনা বেদনা প্রয়াস একই ধারায় মিশে যাবে। মতের চেয়ে মানুষ বড়। কবি বলছেন,—

"যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হয়েছে সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করি নে।" জাতীয় জীবনের ভবিষ্যতে যে সমবায়-নীতির একটা প্রকাণ্ড স্থান থাকবে সে কথা কবি বিশ্বাস করতেন, সে বিষয় বলছেন, "এই নীতিতে যে সহযোগিতা আছে তাতে সহযোগীদের ইচ্ছাকে চিন্তাকে তিরস্কৃত করা হয় না বলে মানব-প্রকৃতিকে স্বীকার করা হয়। সেই প্রকৃতিকে বিরুদ্ধ করে দিয়ে জোর খাটাতে গেলে সে জোর খাটবে না।"

আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কথা বলতে আরো বলছেন, "গ্রামের মধ্যে সেই প্রাণ আনতে হবে যে প্রাণের উপাদান তুচ্ছ ও সংকীর্ণ নয়, যার দ্বারা মানবপ্রকৃতিকে কোনো দিকে খর্ব ও তিমিরাবৃত না রাখা হয়।"

শিক্ষার বাহনের কথা বলতে কবি বলছেন, "দৈন্য জিনিসটাকে আমি বড়ো বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগ-সামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাব মাত্র নহে।" আরো বলেছেন, "মানুষের সকলের চেয়ে যাহা পরম আশার সামগ্রী তাহা কখনো অসাধ্য হইতে পারে না, এ বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় আছে। আমাদের জাতির মুক্তি যদি পার্শ্বের দিকে না থাকে, তবে উপরের দিকে আছেই, এ কথা এক মুহূর্ত ভুলিলে চলিবে না,······উচ্চের দিকের গতিও জীবনের গতি; সেখানেও সার্থকতার ফল সম্পূর্ণ হইয়াই ফলে। আসল কথা, একদিকে হউক বা আরেক দিকে হউক, ভূমার আকর্ষণকে স্বীকার করিতেই হইবে; আমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে, আরো বড়ো হইতে হইবে। সেই বাণী আমাদিগকে কান পাতিয়া শুনিতে হইবে যাহা আমাদিগকে কোণের বাহির করে, যাহা আমাদিগকে অনায়াসে আত্মত্যাগ করিতে শক্তি দেয়, যাহা কেবলমাত্র আপিসের দেয়াল ও চাকরির খাঁচাটুকুর মধ্যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বদ্ধ করিয়া রাখে না। আমাদের জাতীয় জীবনে সেই বেগ যখন সঞ্চারিত হইবে, সেই শক্তি যখন প্রবল হইয়া উঠিবে, তখন প্রতি মুহূর্তেই আমাদের অবস্থাকে আমরা অতিক্রম করিতে থাকিব।···

এই প্রশস্ত পথের নির্দেশ দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। মনে রাখতে হবে তিনি যখন ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন তখন বাঙ্গালীরূপ বা ভারতীয়রূপ বলে নির্দিষ্ট কিছু ছিল না। বাংলা-

দেশের শিক্ষিত সমাজের সভাসমিতিতে লোকে বাংলা বলতে লজ্জা পেত, অভিজাত সমাজের সভ্যরা খাঁটি দেশী পোশাক পরে সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতেন না, বাঙ্গালী মেয়েদের বাড়ির বাইরের কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেবার উপযুক্ত পোশাক পর্যন্ত পরিকল্পিত হয় নি, পারিবারিক জীবন ছিল পঙ্গু। সামাজিক জীবনও মেয়েদের সাহচর্যের অভাবে ছিল অসম্পূর্ণ, দেশী সংস্কৃতি ছিল বিস্মৃতির মুখে, দেশী শিল্প ছিল অনাদৃত। এ সকল উপকরণ জাতীয় জীবনের সজীবতার লক্ষণ হলেও, এ সব দিয়ে জাতীয় জীবনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

একদা রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ও ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের জন্য যে প্রয়াস করেছিলেন, তার মূল্য কিছু কম না হলেও, যে প্রবল প্রাণশক্তির বন্যাকে তিনি আমাদের জাতির শিরায় শিরায় প্রবাহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন তার মূলে ছিল মানবজাতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা।

দেশ তখনো স্বাধীন হয় নি, পদে পদে দেশের লোকে সরকারী সাহায্যের প্রার্থী, এই সময় তিনি বারে বারে দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। 'স্বদেশী সমাজে' 'জাতীয় বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠার ভাষণে এই একই কথা বলেছেন, "যা তোমাদের নিজেদের জিনিস, ভিক্ষার মতো পরের কাছ থেকে তা নিলে তোমাদের মনুষ্যত্বকে খর্ব করা হয়।" বলেছেন, "স্বদেশ যে আমাদেরি কর্মক্ষেত্র এবং আমরাই যে তাহার সর্বপ্রধান কর্মী, এমন কি অন্যে অনুগ্রহপূর্বক যতই আমাদের কর্মভার লাঘব করিবে, আমাদের স্বচেষ্টার কঠোরতাকে যতই খর্ব করিবে, ততই আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কাপুরুষ করিয়া তুলিবে·········রাজা যে আমাদের পক্ষে কত বড় অনুকূল তাহা নহে, কিন্তু ইচ্ছা যে আমাদের মধ্যে কত বড় শক্তি, ইহাই বুঝিবার জন্য আমাদের একান্ত অপেক্ষা ছিল।"

একই ভাবে দিন-যাপন, একই দেশে বাস, একই পিতামহকুলের বংশধর হওয়া, একই ভাষায় কথা বলা, একই দেবতার পূজা করা—এ সমস্তের মধ্যে দিয়েও জাতীয়-জীবনের মর্মে পৌঁছনো যায় না। তার লক্ষ্য আছে অলক্ষ্যের মাঝে। সে একটা জীবন-যাত্রার ধারা, মঙ্গলচিন্তার প্রবাহ, অন্তরের দৃষ্টি। হাত দিয়ে তাকে ধরা যায় না, নাম দিয়ে তাকে বাঁধা যায় না। হৃদয় দিয়ে তাকে বোধ করতে পারলে তবেই তাকে ঘরে ডেকে আনা যায়।

আজ যে পৃথিবীর চোখের সামনে ধীরে ধীরে ভারতের একটা স্বকীয়তা প্রকাশিত হচ্ছে, ভারতীয় সাহিত্য, ভারতীয় শিল্প, ভারতীয় দর্শন পৃথিবীর লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে, সেইটেই সব চেয়ে বড় কথা নয়। বড় কথা হল যে প্রাণশক্তির এগুলি ফলিত রূপ, সে যেন দিনে দিনে প্রবলতা লাভ করে,—ভারতের নির্মাণে, নির্মিতিতে, বাক্যে,

চিন্তায় ভারতের জাতীয় জীবনবোধের সাক্ষ্য দেয়। ১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ শান্তি-নিকেতন আশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রদের যে উপদেশ দেন, তা ভারতের সন্তানদের মনে রাখবার মতো কথা :—

"আমি সেই প্রাচীন ঋষিদের সত্য বাক্য, তাঁদের উজ্জ্বল চরিত মনের মধ্যে সর্বদা ধারণ করে রেখে তোমাদের সেই মহাপুরুষদের পথে চালনা করতে চেষ্টা করব—আমাদের ব্রতপতি ঈশ্বর আমাকে সেই বল সেই ক্ষমতা দান করুন। যদি আমাদের চেষ্টা সফল হয় তবে তোমরা প্রত্যেকে বীর পুরুষ হয়ে উঠবে। তোমরা ভয়ে কাতর হবে না, দুঃখে বিচলিত হবে না, ক্ষতিতে ম্রিয়মাণ হবে না, ধনের গর্বে স্ফীত হবে না; মৃত্যুকে গ্রাহ্য করবে না, সত্যকে জানতে চাইবে, মিথ্যাকে মন থেকে কথা থেকে কাজ থেকে দূর করে দেবে।...কর্তব্যকর্ম প্রাণপণে করবে, অথচ যখন কর্তব্যবোধে ধনসম্পদ ও সংসার ত্যাগ করতে হবে তখন কিছুমাত্র ব্যাকুল হবে না। তাহলে তোমাদের দ্বারা ভারতবর্ষ আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে—তোমরা যেখানে থাকবে সেইখানেই মঙ্গল হবে, তোমরা সকলের ভালো করবে এবং তোমাদের দেখে সকলে ভালো হবে।"

এই হল ভারতীয় সাধনার মূলমন্ত্র, এরই উপরে নির্ভর করে আমাদের জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠিত হোক। এই অভয়-বাণী আসুক আমাদের জীবনে, আমরা তাকে অভ্যর্থনা করি :—

দুঃখ-সুখের দোলে এসো,
প্রাণের হিল্লোলে এসো।
ছিলে আশার অরূপবাণী
ফাগুন-বাতাসে
বনের নিশ্বাসে,
এবার ফুলের প্রফুল্লরূপ
এসো বুকের পরে,
এসো আমার ঘরে।

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয় জীবন

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

জাতীয় জীবন কথাটার মধ্যে দুদিকের দুটি ইঙ্গিত রয়েছে। একদিকে তা প্রধানভাবে রাজনীতি-ঘেঁষা, যে-ক্ষেত্রে তার পরিণতি দেখতে পাই আজকালকার দিনে বহু-প্রচলিত জাতীয়তাবাদ কথাটির মধ্যে। আর একদিকে তার ঘনিষ্ঠ যোগ সমাজ-জীবনের সঙ্গে—যে সমাজ-জীবনের বিস্তীর্ণ ব্যাপকতার মধ্যে রাজনৈতিক দিক্‌টা আর পাঁচটার মত একটা দিক্ মাত্র, তার একাধিপত্য নিয়ে ত নয়-ই, তার প্রাধান্য নিয়েও নয়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও যখন তাঁর সঙ্গে জাতীয় জীবনের সম্পর্কের প্রশ্ন তোলা যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে দুদিক থেকে জিজ্ঞাসা দেখা দিতে পারে। প্রথম জিজ্ঞাসাটাকে এইভাবে স্থাপনা করা যেতে পারে,—আমাদের উনবিংশ এবং বিংশ শতকে জাতীয়জীবনের যে আলোড়ন ও বিবর্তন দেখা দিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ তাতে কিভাবে কতটুকু অংশ গ্রহণ করেছেন। এখানে অবশ্য প্রথমেই আবার আর একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। আমাদের জাতীয় জীবন বলতে আমরা এখানে কি বুঝব? আপাততঃ বলে রাখছি, আমাদের অর্থ এখানে বাঙালীদের। দ্বিতীয় জিজ্ঞাসাটির স্থাপনা করা যায় এইভাবে, বিশ্বজীবনের মধ্যে বাঙালী জাতির একটি বিশেষ অস্তিত্ব অর্থাৎ একটি বিশেষ জীবন-যাপন-প্রথা রয়েছে—যা বিশ্বজীবনের মধ্যেই বাঙালী-জীবনকে আবার স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে দিয়েছে। এই যে আমাদের বিশেষভাবে চিহ্নিত একান্ত বাঙালী-জীবন তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কতটুকু যোগ ছিল এবং তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সেই পরিচয় কোথায় কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

পূর্বে কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের কথা বললে আমরা বিশেষ করে আমাদের বৃহৎ সমাজজীবনের কথাই ভাবতাম। রবীন্দ্রনাথ অন্ততঃ এ-কথাটা স্পষ্টভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন যে আমাদের দেশে জাতীয় জীবন বলতে মুখ্যতঃ সমাজ-জীবনকেই বোঝাত; রাষ্ট্র এইজন্য কোনোদিনই আমাদের দেশে একটা সর্বগ্রাসী মর্যাদা লাভ করে নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নানাভাবে বিশ্লেষণ-বিচার করে রবীন্দ্রনাথ তাই বার বারই এই জিনিসটি দেখাতে চেয়েছেন যে ভারতবর্ষের জাতীয় শক্তি কোন যুগেই রাষ্ট্রের ভিতরে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠেনি—যুগ যুগ ধরে সমগ্র বিবর্তনের পিছনে বেশিভাবে কাজ করেছে সমাজের বিভিন্নস্তরে বিকেন্দ্রিত সমাজ-শক্তি।

রাষ্ট্রবন্ধনের উপরে রবীন্দ্রনাথের একটা সহজাত অবিশ্বাস—সুতরাং অশ্রদ্ধা ছিল, বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা ছিল তাঁর সমাজবন্ধনের উপরে। কারণটাও খুব দুর্ণিরীক্ষ্য নয়; রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, দশদিকে দশপ্রহরণ ধারণ করে রাষ্ট্র বলে যে যন্ত্রটি মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠে, এবং তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত শক্তির একটা একাধিপত্যের প্রবণতা যেভাবে মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে—ওটা মানববিকাশের কোন স্বাভাবিক পথে দেখা দেয় না; দেখা দেয় ক্রূর কুটিল পথে মানুষের অপরিমিত লোভ এবং ক্ষমতালিপ্সার প্রচণ্ড আবেগের সঙ্গে জড়িত হয়ে। এই লোভ এবং ক্ষমতামত্ততার নেতৃত্ব এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত সমাজ তার বৃহৎ পরিধির মধ্যে ছড়িয়ে ছড়িয়ে সৃষ্টি করে নেয় যে শক্তি তার পিছনে মানবমঙ্গলের একটা স্বাভাবিক গতি আছে; কারণ, তা গড়ে ওঠে মানুষের স্বভাবকে অবলম্বন করে, আর রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল, মানুষ যে পর্যন্ত অপরিমিত লোভ এবং ক্ষমতা-প্রমত্ততার প্রচণ্ড পাকে পড়ে বিকৃত না হয়ে ওঠে সে পর্যন্ত মানুষ স্বভাবতঃ ভাল—সে নীতিপ্রবণ; তার এই স্বভাবগত নৈতিক প্রেরণাই তার মধ্যে সৃষ্টি করে ধর্মের এষণা; এই ধর্ম তাকে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত করেই ধারণ করে রাখে। এটা রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত বিশ্বাসও বটে, আবার আজীবনের অভিজ্ঞতা-জাত দৃঢ় সিদ্ধান্তও বটে। দুদিক থেকেই শক্তি পেয়ে এই প্রত্যয় তাঁকে উজ্জীবিত করে রেখেছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস-প্রবণতাই তো সব মানুষের বিশ্বাস-প্রবণতা নয়, আর রবীন্দ্রনাথ যে-কালে যে-দেশে যে-জাতির মধ্যে জন্মালেন তার ইতিহাসেরও সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথের রুচি-মেজাজের অনুগরূপে আবর্তিত হবার কথা নয়। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে বাঙালী জাতির মধ্যেও যে জাতীয়তাবাদের জাগরণ দেখা দিল তার আশে পাশে সর্বতোভাবেই একটা জাগরণের আশা-আকাঙ্ক্ষা দেখা দিলেও জাতির বিদ্রোহী শক্তি ক্রমে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠতে লাগল রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে, জাতীয় আন্দোলনের মুখ্য দাবী রূপে দেখা দিল পরজাতির কাছ থেকে নিজের জাতির হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া। ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল কংগ্রেস আন্দোলন। রবীন্দ্রনাথকে একদিন তাঁর কবিসত্তা নিয়েই এসে যুক্ত হতে হল এই কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কিছুদিন অন্ততঃ প্রত্যক্ষভাবে এবং খানিকটা সক্রিয়ভাবেই যার সঙ্গে এসে যুক্ত হলেন সেটাকে ঠিক কংগ্রেস আন্দোলন বলব না, সেটাকে বলব 'স্বদেশী-আন্দোলন'। এই উভয় আন্দোলনকেই সাধারণতঃ এক করে ধরা হয়; কিন্তু আমার কাছে এই দুয়ের মাঝখানে একটা তফাৎ আছে বলে মনে হয়। কংগ্রেসের সামনে ছিল ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তিকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের রাষ্ট্রশক্তি গড়ে তোলা এবং তাই দিয়ে

দেশ শাসন করার লক্ষ্য ; স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে এই উদ্দেশ্য নিহিত থাকলেও তার মধ্যে একটু অস্পষ্টভাবে হলেও আর একটা ব্যাপক দৃষ্টি দেখা দিয়েছিল ; সে দৃষ্টি হল শুধু কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় যন্ত্রটিকে নয়—আমাদের বৃহৎ সমাজ-জীবনটাকেই নূতন করে গড়ে তুলবার দৃষ্টি। স্বদেশে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করবার এবং স্বদেশজাত সকল দ্রব্যকে শ্রদ্ধায় আদরে মাথায় তুলে নেবার যে দুরন্ত আগ্রহ দেখা দিল, যেখানে দেখা দেয় নি সেখানে সেই আগ্রহকে জাগিয়ে তুলবার ঐকান্তিক চেষ্টা দেখা দিল—সেটা শুধু আর্থিকক্ষেত্রে অপর জাতিকে পরাজিত করবার জন্য নয়, আত্ম-বিস্মৃত জাতিকে, আত্ম-সম্মানে বঞ্চিত জাতিকে সর্বতোভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠ করে তুলবার একটা দৃঢ়পণ সাধনাও তার ভিতর দিয়ে সত্য হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে যেটুকু যুক্ত করে তুললেন তা হল এই সাধনার সঙ্গে।

স্বদেশীযুগের বাইরের আন্দোলনের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে চিন্তারও একটা মস্ত বড় আন্দোলন চলছিল, স্থায়িমূল্যের দিক্ থেকে সেই আন্দোলনটাকেই বড় স্থান দিতে হবে। সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ দেখা দিয়েছিলেন পুরোধারূপেই। তিনি প্রকাশ্য মঞ্চে উচ্চৈস্বরে অনেক বক্তৃতা দিয়ে জননেতারূপে জনসাধারণের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন না বটে, কিন্তু জাতীয় জীবনের সমস্ত সমস্যাগুলির কথা এবং তাদের সমাধানের কথা তিনি যেমন গভীর করে এবং তন্ন তন্ন করে ভাবলেন এবং তাকে প্রবন্ধে ভাষণে প্রকাশ করতে লাগলেন তেমন ব্যাপক এবং গভীরভাবে সেই সময়ে আর কেউ তা করেছেন বলে জানা নেই। কিন্তু তবু তিনি তৎকালে যে প্রচণ্ড জননেতা বলে স্বীকৃতি লাভ করলেন না তার মুখ্য কারণ রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতাকে অচিরাৎ করায়ত্ত করবার জন্য তখন যে অত্যুগ্র আকাঙ্ক্ষা সমস্ত সমস্যার অগ্রভাবে দেখা দিয়েছিল, তার উষ্ণতা রবীন্দ্রনাথকে তেমন তপ্ত করে তুলতে পারে নি। ঠিক হোক আর বেঠিক হোক, ইংরেজ তাড়াবার জন্য অত্যন্ত একটা তাড়া কোনদিনই তিনি তেমনভাবে অনুভব করেন নি যেমন অনুভব করেছেন জাতিকে সব দিক্ থেকে যথার্থ মনুষ্য-চেতনায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তুলবার তাড়া। উগ্রপন্থীদের কথা ছেড়ে দিলে স্থিতধী যে সব নেতা মনে করতেন যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের হাতে না পাওয়া পর্যন্ত জাতির সমাজ-জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলা কখনই সম্ভব নয়, এবং সেই কারণে সকল দৃষ্টিকে এবং শক্তিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের সংগ্রামে কেন্দ্রীভূত করাই ছিল জাতি-গঠনের প্রাথমিক কাজ, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি।

জাতীয়তাবাদের সহচর রূপে দেখা দেয় যে প্রবল জাত্যভিমান, এ যুগে রবীন্দ্রনাথের লেখায় সে জিনিসটি স্পষ্ট প্রকট হয়ে উঠেছিল ; কিন্তু সে জাতি বাঙালী জাতি নয়, সে জাতি ভারতীয় জাতি। স্বদেশ বলতেও রবীন্দ্রনাথ কোন দিনই বাঙলাদেশের

কথা ভাবেন নি, ভেবেছেন ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষের মধ্যেই আবার বাঙালী বলে যে একটা অভিমান সেটা রবীন্দ্রনাথের মনকে কোন দিনই তেমন সাড়া দিতে পারে নি। বাংলার মাটি বাংলার জল প্রভৃতি গানকে স্মরণ করেও এ-কথা বলছি।

ভারতবর্ষের ধর্ম, ঐতিহ্য সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সমাজের যথার্থ পরিচয় প্রকাশ করে এ যুগে রবীন্দ্রনাথ অনেক লেখা লিখেছেন। এ লেখাগুলির মধ্যে আক্রমণাত্মক সুর নেই, পৃথিবীর অপর কোন জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের কোনও অত্যুৎসাহী প্রচেষ্টা নেই, আছে নিজের পূর্বপরিচয়টা যে মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকবার পক্ষে কোন দিক্ থেকেই অগৌরবের নয়—সেই সত্যটির খ্যাপন। এ সত্যটির খ্যাপন তখনকার দিনে আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যই কবি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেছিলেন। জাতির আসল জীবন বলতে রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই মনে করতেন জাতির সমাজজীবন। উনবিংশ শতকে আমাদের সমাজজীবনে প্রাণশক্তির অনেকখানি ভাঁটা পড়ে গেল,—তার অবশ্যম্ভাবী ফল দেখা দিল বিবিধ বিকৃতিতে। এই প্রাণশক্তির ক্ষীণতা এবং তজ্জনিত বিকৃতির উপরে এসে সহসা প্রবলবেগে যখন লাগল ইউরোপ থেকে বয়ে-আসা অফুরন্ত প্রাণশক্তির প্রবল ধাক্কা, তখন একটা কথাই আমাদের কাছে প্রতিপন্ন হয়ে উঠতে চাইল,—যে-জীবনযাত্রা নিয়ে আমরা বেঁচে ছিলাম, মানুষ হিসাবে তেমন করে বেঁচে থাকবার আমাদের কোন অর্থ ছিল না ; বেঁচে থাকবার অধিকার পেতে হলে আমাদের বাঁচবার ধারাটাকেই আমূল পরিবর্তিত করে নেওয়ার প্রয়োজন। একে ঠিক পরিবর্তন করে নেওয়াও বলা যায় না, এটা যেন একটাকে একেবারে ছেড়ে দিয়ে অপরটাকে একেবারে নূতন করে গ্রহণ। এইখানে রবীন্দ্রনাথের মনে লেগেছিল একটা বড় ধাক্কা। সংস্কারাবৃত দৃষ্টিতে তিনি যে নূতনের আকৃতিটাকে এবং প্রকৃতিটাকে ঠিক বুঝতে পারলেন না—এবং সেইজন্য অন্ধ প্রতিক্রিয়ায় রক্ষণশীল হয়ে উঠলেন তা নয় ; ইউরোপ থেকে যা কিছু এসেছিল নূতন, তাকে খুব ভালভাবে চিনতে পেরে—তার ভিতরকার মঙ্গলময় সত্যটুকুকে অকুণ্ঠ-চিত্তে এবং সাগ্রহে অভ্যর্থনা জানিয়েও তিনি আন্তরিক ভাবেই এই বোধে প্রতিষ্ঠিত হলেন যে, ভারতবর্ষ নামক পৃথিবীগ্রহের যে অঞ্চলটিতে হাজার হাজার বৎসর ধরে কোটি কোটি মানুষ জীবনের যে মূল্যবোধ নিয়ে যে জীবনযাত্রা গড়ে তুলেছে, মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার পক্ষে সেটা সম্পূর্ণ অগৌরবের নয়। আমাদের সমাজ-জীবনে যে সজীব প্রাণের প্রবাহ ছিল তার বিমল শক্তিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে পারলেই আমাদের দেহের বহুস্থানে যে বিকৃতির লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে তা দূরীভূত হবে এবং আমরা মানুষের মত স্বাস্থ্য ও আনন্দময় বিকাশ লাভের অধিকারী হব।

এ-কথাটা আজকাল আমরা ঐতিহাসিক সত্য বলেই ধরে নিয়েছি যে কবি প্রথম বয়সে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে খানিকটা চলতে চলতেই তাঁর কবি-প্রবণতা নিয়ে পাশ কাটিয়ে একটু দূরে সরে পড়লেন। কথাটাকে ডাহা মিথ্যা বলব না। সহজাত কবি-প্রকৃতি কর্মসংগ্রামের কোলাহল এবং ধূলিলিপ্ততা থেকে কবিকে যে খানিকটা বিমুখ করে রেখেছিল সে কথা মানতেই হবে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে এই কথাটিই সবখানি কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ যে সরে দাঁড়ালেন সেটা যথার্থ স্বদেশী-আন্দোলন থেকে নয়, সেটা কংগ্রেস আন্দোলন থেকে ; তার কারণও শুধু তাঁর কর্মকোলাহল-বিমুখ কবি-প্রকৃতি নয়, তার কারণের ইঙ্গিত পূর্বেই দিয়েছি—তা হল জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নেবার সংগ্রামকে শুধু প্রধান নয়—প্রায় একমাত্র করে তুলবার দুর্বার আগ্রহ। জাতীয় আন্দোলনের এই রূপটাই যখন অত্যন্ত উগ্র হয়ে প্রকটিত হল, তখন রবীন্দ্রনাথের জাতীয় আন্দোলনের উপরে অবিশ্বাসটাও ঘনীভূত হয়ে উঠল—সবটা সত্য বুঝতে হলে এ কথাটাও নির্ভুলভাবে লক্ষণীয়।

এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তিনি যাঁকে শুধু ভারতবর্ষের নেতা হিসাবে নয়—জগতের মধ্যে একজন মানুষ হিসাবে সমসাময়িক মানুষদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করতেন সেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে এ-বিষয়ে তিনি যখন প্রকাশ্য বাদ-প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সেখানে দেখি মহাত্মা গান্ধীর 'স্বরাজে'র আদর্শটিই কবির মনঃপূত ছিল না, কবির আদর্শ ছিল মুক্তির আদর্শ। এ মুক্তি মুখ্যভাবে হল চিত্তের মুক্তি, অজ্ঞতা থেকে জড়তা থেকে কুসংস্কার থেকে মুক্তি—যে মুক্তি ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলবে নিরন্তর মনুষ্যত্বের বিকাশের পথে। কবি বুঝতে পারলেন, তাঁর দেশবাসীকে এই বিকাশের পথে এগিয়ে দেবার কাজেই ছিল তাঁর স্বধর্ম, স্বদেশী আন্দোলনের ভিতর থেকে এই স্বধর্মকেই তখন তিনি তাই বেছে নিলেন।

একটা যুগে ভারতবর্ষের মহিমাখ্যাপনে কবি প্রায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছিলেন। তার ভিতরে এমন উক্তি বা মনোভাব আবিষ্কার করা কিছু কঠিন নয় যে ভারতবর্ষের প্রতি বিধাতার একটি বিশেষ করুণা রয়েছে যার ফলে মানব-মহত্ত্বের এমন কতকগুলি দিক্ ভারতবর্ষে বিকাশ লাভ করেছে যা অন্যত্র বিরল। কিন্তু এর পরে চলল বিশ-পঁচিশ বছর ধরে কবির কেবলই ভ্রমণের পালা। এশিয়া ইউরোপ আমেরিকা—কোথাও বাকি রইল না, দেশ-বিদেশে যে শুধু প্রচুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুলাভ ঘটল তা নয়, দেশ-বিদেশের বিচিত্রধরণের মানুষের সঙ্গে ঘটতে লাগল প্রত্যক্ষ এবং আন্তরিক পরিচয়। এই পরিচয় কবির স্বাজাত্যের মোহকে ভেঙে দিয়েছে। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর সামনে দেখতে

পেলেন মানুষকে—সে মানুষের কোন দেশগত বা কালগত পরিচয় নেই—সে মানুষ সর্বদেশের মানুষ—সর্বকালের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গান-কবিতার ভিতরেই অস্পষ্টভাবে একটা ভাবধারা দেখতে পাই—নিখিলসৃষ্টি কালে কালে তার সকল প্রবাহের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করতে চাইছে তার মর্মবাণী চেতন মানুষের অনন্ত বৈচিত্র্যময় এবং রহস্যময় প্রকাশের ভিতর দিয়ে। এই ভাবধারা ক্রম-পরিণতির ভিতর দিয়ে গিয়ে যেখানে একটি ধ্রুবপদের মতন কবির মনে ও সুরে দেখা দিল তখন নিখিলমানবের বিবর্তন কবির মনে একটি নিরন্তর জীয়মান 'ব্রহ্মকমলে'র রূপ পরিগ্রহ করল। এই 'ব্রহ্মকমলে'র মহিমা কবির মনকে যখন সবটুকু অধিকার করে বসল তখন আর 'ভারত-কমলে'র দিকে পৃথক করে চাইবার অবকাশ রইল কোথায়? আর 'বঙ্গকমল' যে কোনদিনই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে কবির দৃষ্টি ও মনকে আকর্ষণ করতে পারে নি, এ-কথা তো পূর্বেই স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

আরম্ভেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয় জীবনের যোগ আলোচনার দুটি দিক্ রয়েছে। একটা দিক্ নিয়ে আলোচনা করলুম, স্বাভাবিকভাবেই আর একটা দিক্—অর্থাৎ রবীন্দ্রসাহিত্যে বাঙলার জাতীয় জীবন কি করে প্রতিফলিত হয়েছে—তার কথা উঠবে। সাহিত্য বা সাধারণভাবে শিল্পের ক্ষেত্রে এই প্রশ্নটা আমরা যখনই তুলি তখনই আমাদের মনের মধ্যে একটি বিশেষ বাসনা থাকে। আমরা জানি, নিখিল মানুষ দেশে দেশে কালে কালে বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীতে বা সমাজে ভাগ ভাগ হয়ে পড়েছে, আমরা এই ভাগগুলিকে সাধারণভাবে বলে থাকি জাতি। বিশেষ ধরণের একটা ভৌগোলিক অবস্থান, নৃতত্ত্ব, জীবন-যাত্রা এবং নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি, ধর্মবিশ্বাস, ভাষা-সাহিত্য, প্রথা-সংস্কার —সব নিয়ে বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে বিচিত্র রঙ-রেখা জেগে ওঠে। মনুষ্য-সামান্যে জীবনের যে রঙ-রেখা তার চেয়ে জাতীয় জীবনের এই বিশেষ রঙ-রেখার প্রতি অনেক সময় আমাদের একটা বিশেষ মমতা এবং আকর্ষণ থাকে। অনেকের সাহিত্যে এই উপাদানই জোগায় মধুর একটি স্বাদ, যেমন স্বাদ রয়েছে শরৎচন্দ্রের বিভূতিভূষণের তারাশঙ্করের অনেক গল্প-উপন্যাসে। কবি হিসাবে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায় প্রভৃতির কিছু কিছু কবিতার উল্লেখ করতে পারি যেখানে বাঙালীত্বের স্পর্শ আস্বাদনের মধ্যে একটা বিচিত্র মমতার সৃষ্টি করেছে। বাঙালীজীবনের আনাচে-কানাচে ছড়ান এই যে রঙ-রেখার একান্ত বিশেষ বৈচিত্র্য তা রবীন্দ্রনাথের মনকে খুব বেশি আকৃষ্ট করে নি। নিজেই অসঙ্কোচে সে কথা স্বীকার করেছেন, জীবনের বিচিত্র ঐকতানে সবখান থেকে যারা সুর মিশিয়েছে তার সব স্তরে গিয়ে তাঁর দৃষ্টি পৌঁছয় নি বলেই আকর্ষণও বড় হয়ে দেখা দেয় নি। শরৎচন্দ্রের অঙ্কিত 'কাঙ্গালীচরণের মা', বিভূতিভূষণের

'ইন্দির ঠাকুরুণ', তারাশঙ্করের 'শবলা', মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কুবের জেলে'—এদের জন্যে আমাদের মনে একটা বিশেষ মমতা এবং আকর্ষণ রয়েছে—এ-কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বাঙালীজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এদের পর্যন্ত গিয়ে বিস্তৃতি লাভ করে নি।

কিন্তু মানুষ হিসাবে বাঙলাদেশের মানুষের প্রতিই রবীন্দ্রনাথের একটা বিশেষ আকর্ষণ এবং প্রীতি খুব বড় হয়ে দেখা না দিলেও বাঙলাদেশের প্রকৃতির প্রতি কবির একটা বিশেষ আকর্ষণ গড়ে উঠেছিল এ কথা অতি স্পষ্ট। তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর গানে—তাঁর কবিতায়। তাঁর স্বদেশ সম্বন্ধে যে গান তার ভিতরেই এ পরিচয় এবং আকর্ষণ সবচেয়ে বড় হয়ে উঠেছে এ কথা বলব না, এ-পরিচয় এবং আকর্ষণের প্রমাণ ছড়িয়ে আছে সব যুগের কবিতা এবং গানের মধ্যেই।

ইতিহাসকে অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলা জাতীয় জীবনের প্রসঙ্গে এই সব আলোচনা করলুম বটে, কিন্তু আলোচনার অন্তে মনে হচ্ছে, এহ বাহ্য। রবীন্দ্রনাথ কখন কোন্ জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে কেন এবং কতটুকু যোগ দিয়েছিলেন না দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার জাতীয় জীবনের সম্বন্ধ বুঝতে সেইটাই বড় কথা নয়। আজ রবীন্দ্রনাথের জন্মের এক শত বৎসর পরে নিজেদের দিকে যখন ভাল করে তাকিয়ে দেখছি তখন দেখতে পাচ্ছি যেখানে যেটুকু জেগে উঠেছি তার পিছনে রবীন্দ্রনাথের আহ্বান রয়েছে, আর রয়েছে, বিকাশকামী চিত্তের পাপড়িতে পাপড়িতে তাঁর সুরের সুকুমার স্পর্শ। একটা জাতি যদি জীবন্ত জাতি হয় তবে কালের প্রবাহকে অবলম্বন করে জীবনের সঙ্গে তাকে চলতেই হবে, আর চলা থাকলেই তার ভিতরে অনুস্যূত হয়ে থাকবে একটা গতি-নির্দেশ। রবীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের জাতীয় জীবনে চলার সেই গতি-নির্দেশের সঙ্কেত নিয়ে। এই গতি-নির্দেশের মধ্যেই জেগে ওঠে জাতির সমগ্র শ্রেয়োবোধ—জীবন সম্বন্ধে তার চরম মূল্যবোধ। সেইখানে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ নিয়ন্ত্রণের কাজ নিয়ে—সে নিয়ন্ত্রণ সতত সক্রিয় হয়ে উঠেছে তাঁর মননে তাঁর আচরণে—তাঁর ছন্দে সুরে রঙে রেখায়। এইখানেই বাঙলা জাতীয় জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় যোগের সর্বোত্তম পরিচয়।

রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা

জগদীশ ভট্টাচার্য

১

যিনি মহাকবি তিনি প্রতি মানবের কবি। এই অর্থেই তিনি বিশ্বকবি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "মানুষ আপন উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসীমাকে পেরিয়ে বৃহৎ মানুষ হয়ে উঠছে, তার সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাধনা এই বৃহৎ মানুষের সাধনা।"[১] একের মধ্যে এই অনেকের প্রতিষ্ঠা, জীবভাব থেকে বিশ্বভাবে বিকশিত হয়ে ওঠাই জীবন-সাধনার মর্মকথা। রবীন্দ্র-দৃষ্টিতে মানুষ ত্রিজ ; তার জন্মভূমি তিনটি। তিনটিই একত্র জড়িত। তার প্রথম জন্ম নিখিল পৃথিবীতে, দ্বিতীয় জন্ম নিখিল ইতিহাসে, তৃতীয় জন্ম আত্মিকলোকে সর্বমানব-চিত্তের মহাদেশে।[২] একই জীবনে এই নব নব জন্মগ্রহণেরই অন্য নাম যাত্রা! এই অর্থেই মানুষ পথিক, মানুষ অনাগারিক।

যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগযুগান্তের।

অনন্ত লোক যে পথে চলেছে সে পথপ্রান্তের এক পার্শ্বে থেকে যুগযুগান্তের বিরাট স্বরূপকে দেখা—এই তো বিশ্বদৃষ্টি! এবং এই দৃষ্টিই তো সত্যদৃষ্টি। কেননা সবার সাথে চলাই সত্যকার পথে চলা। মহাভারতের বনপর্বে বক-যুধিষ্ঠির-সংবাদের শেষ প্রশ্নচতুষ্টয় ছিল, 'কা চ বার্তা, কিমাশ্চর্যম্, কঃ পন্থাঃ, কশ্চ মোদতে। পথ কি বল, এই প্রশ্নের উত্তরে জ্যেষ্ঠপাণ্ডবের কণ্ঠে মহাকবি বেদব্যাস বলছেন,

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥ বন।২৬৭।৮৪ ॥

মহাজন-গত পথই পথ। মহাজন অর্থ মহৎ জন নয়। বহুজন, সর্বজন, বিশ্বজন। 'ভারতভাবদীপ' টীকায় নীলকণ্ঠ বলেছেন, "অতোঽনন্তাসু ধর্মশাস্ত্রবিদ্যাসু শ্রমমকৃত্বা বহুজনসম্মতমেব মার্গমনুসরেদিতি ভাবঃ।" বৌদ্ধরা যখন বলেন, 'বহুজনসুখায় বহুজন-হিতায় জগদ্ধিতায় চ', তখন তাঁরা মহাকবির সঙ্গেই কণ্ঠ মিলিয়ে কথা বলেন। কবিমানসে এই বিশ্বমানসের যখন জন্ম হয় তখনই তিনি হন মহাকবি।

২

রবীন্দ্রনাথ মহাকবি। তাঁর মানসলোকে বিশ্বমানসের জন্মের ইতিহাস অনুসন্ধিৎসার যোগ্য বিষয়। রবীন্দ্রনাথ রাজার দুলাল। জোড়াসাঁকোর প্রাসাদমালায় তাঁর জন্ম। তাঁর পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ মহালক্ষ্মীর প্রসাদলাভে কৃতার্থ হয়েছিলেন। রাজৈশ্বর্য নিয়ে তিনি ছিনিমিনি খেলেছেন। রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পিতৃঋণ-মুক্তির জন্যে বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্বস্ব দক্ষিণা পণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জন্মলগ্নে পিতামহের ঐশ্বর্যদীপাবলী নির্বাপিত হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি ধনের মধ্যে জন্মাই নি, ধনের স্মৃতির মধ্যেও না।"[৩] কথাটা সত্যি। দ্বারকানাথের ঐশ্বর্য তখন নিঃশেষিত। কিন্তু দুই পুরুষে মিলে মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতীর সাধনায় চারুশীলন ও শুচিশীলনের সমন্বয়ে যে দুর্লভ সাংস্কৃতিক আভিজাত্য ঠাকুর-পরিবারে গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের জন্ম সেই আভিজাত্যের তুঙ্গশিখরে।

সেই তুঙ্গশিখর থেকে একদিন কবি নেমে এলেন জনারণ্যের সমতল ক্ষেত্রে। নেমে এলেন সাধারণ মানুষের সংসারের তীরে। রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনার জন্ম হল।

কবি সংসারী হলেন বাইশ বৎসর সাত মাস বয়সে। ১২৯০ বঙ্গাব্দের ২৪ অগ্রহায়ণ তাঁর বিয়ে হল। বিয়ের মাত্র দুদিন আগে বকসার থেকে লেখা পিতৃদেবের এক পত্র এসে পৌঁছল কবির হাতে। নভোচারী দিব্যবিহঙ্গের পায়ে শিকলি বেঁধে দেবার নির্মম নির্দেশ বহন করে আনল পত্রখানি। মহর্ষিদেব লিখলেন, "এইক্ষণে তুমি জমিদারির কার্য পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও; প্রথমে সদর কাছারিতে নিয়মিতরূপে বসিয়া সদর আমিনের নিকট হইতে জমাওয়াশিল বাকি ও জমাখরচ দেখিতে থাক এবং প্রতিদিনের আমদানি রপ্তানি পত্রসকল দেখিয়া তার সারমর্ম নোট করিয়া রাখ। প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাহার রিপোর্ট দিলে উপযুক্তমতে তোমাকে আমি উপদেশ দিব এবং তোমার কার্যে তৎপরতা ও বিচক্ষণতা আমার প্রতীতি হইলে আমি তোমাকে মফঃস্বলে থাকিয়া কার্য করিবার ভার অর্পণ করিব।"[৪]

স্বপ্নদেখা রোমান্টিক কবিজীবনে এই পত্র যেন বাস্তবের নিষ্ঠুর প্রতিশোধ। একে পিতৃদেবের শাস্তিও বলা যেতে পারে। কবি নিজেই বলেছেন, "আমি ইস্কুল-পালানো ছেলে, পরীক্ষা দিই নি, পাস করি নি।"[৫] অভিভাবকগণ পাঠিয়েছিলেন বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে। তরুণ রবির ভাগ্যবিধাতা সেখানেও বাদ সাধলেন। ছাত্রজীবনে কবি ইস্কুল-কলেজের শিক্ষাসরস্বতীকে যে ফাঁকি দিয়েছিলেন যেন তারই শাস্তি হয়ে এল এই নির্বাসন-দণ্ড। জোড়াসাঁকোর প্রাসাদমালা থেকে রাজপুত্র নির্বাসিত হলেন পূর্ববঙ্গের নদীপ্রান্তর-পরিবৃত আত্মীয়স্বজনহীন পল্লীগ্রামে। কিন্তু এই নির্বাসন-দণ্ডের

ছদ্মবেশ পরেই এল কবিজীবনে তাঁর জীবনদেবতার পরম আশীর্বাদ। প্রতিদিনের রূঢ় বাস্তবের পটভূমিতে ভাগ্যবিড়ম্বিত জনজীবনকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলেন কবি, 'যে পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে সে পথপ্রান্তের এক পার্শ্ব' থেকে যুগযুগান্তের বিরাট স্বরূপকে তিনি কবিদৃষ্টিতে দেখলেন। গোত্রান্তর হল তাঁর। জন্মান্তর। জমিদার-তনয় হলেন সর্বহারা প্রজাসাধারণের জীবনের শরিক। তাদের প্রাণের দোসর। রোমান্টিক কবিমানসে মহাকবিচেতনার আবির্ভাব হল।

৩

মহাকবির সেই নবজন্মের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়ে আছে ছিন্নপত্রাবলীতে। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২০শে মাঘ সাজাদপুর থেকে কবি ভ্রাতুষ্পুত্রীকে লিখেছেন,—

"প্রজারা যখন সসম্ভ্রম কাতরভাবে দরবার করে, এবং আমলারা বিনীত করযোড়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তখন আমার মনে হয় এদের চেয়ে এমনি আমি কী মস্ত লোক যে আমি একটু ইঙ্গিত করলেই এদের জীবনরক্ষা এবং আমি একটু বিমুখ হলেই এদের সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আমি যে এই চৌকিটার উপর বসে বসে ভাণ করছি যেন এই সমস্ত মানুষের থেকে আমি একটা স্বতন্ত্র সৃষ্টি, আমি এদের হর্তাকর্তাবিধাতা, এর চেয়ে অদ্ভুত আর কি হতে পারে! অন্তরের মধ্যে আমিও যে এদেরই মতো দরিদ্র সুখদুঃখকাতর মানুষ, পৃথিবীতে আমারও কত ছোটো ছোটো বিষয়ে দরকার, কত সামান্য কারণে মর্মান্তিক কান্না, কত লোকের প্রসন্নতার উপরে জীবনের নির্ভর! এই-সমস্ত ছেলেপিলে-গরুলাঙল-ঘরকন্না-ওয়ালা সরলহৃদয় চাষাভুষোরা আমাকে কী ভুলই জানে! আমাকে এদের সমজাতি মানুষ বলেই জানে না।"[৬]

সোওয়া দু বৎসর পরে ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৭।২৮ বৈশাখ [১০ মে, ১৮৯৩] আবার লিখছেন :

"আমার এই দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে —এরা যেন বিধাতার শিশুসন্তানের মতো—নিরুপায়—তিনি এদের মুখে নিজের হাতে কিছু তুলে না দিলে এদের আর গতি নেই। পৃথিবীর স্তন যখন শুকিয়ে যায় তখন এরা কেবল কাঁদতে জানে; কোনোমতে একটুখানি খিদে ভাঙলেই আবার তখনই সমস্ত ভুলে যায়। সোসিয়ালিস্টরা যে সমস্ত পৃথিবীময় ধন বিভাগ করে দেয় সেটা সম্ভব কি অসম্ভব ঠিক জানি নে—যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে বিধির বিধান বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ ভারী হতভাগ্য! কেন-না, পৃথিবীতে যদি দুঃখ থাকে তো থাক্, কিন্তু তার মধ্যে এতটুকু একটু ছিদ্র একটু সম্ভাবনা রেখে দেওয়া উচিত যাতে সেই দুঃখমোচনের জন্যে মানুষের উন্নত অংশ অবিশ্রাম চেষ্টা করতে পারে, একটি আশা পোষণ করতে পারে।

যারা বলে, কোনো কালে পৃথিবীর সকল মানুষকে জীবনধারণের কতকগুলি মূল আবশ্যকীয় জিনিষও বণ্টন করে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব অমূলক কল্পনা মাত্র, কখনোই সকল মানুষ খেতে পরতে পাবে না, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ চিরকালই অর্ধাশনে কাটাবেই, এর কোনো পথ নেই—তারা ভারী কঠিন কথা বলে।"[৭]

১৩০০ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে [২১ আগস্ট ১৮৯৩] কবি পুনরায় লিখেছেন,

"কোথায় প্যারিসের আর্টিস্ট্‌-সম্প্রদায়ের উদ্দাম উন্মত্ততা আর কোথায় আমার কালীগ্রামের সরল চাষী প্রজাদের দুঃখদৈন্য-নিবেদন! আহা, এমন প্রজা আমি দেখিনি —এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে। আমার কাছে এই-সমস্ত দুঃখপীড়িত অটলবিশ্বাসপরায়ণ অনুরক্ত ভক্ত প্রজাদের মুখে এমন একটি কোমল মাধুর্য আছে, এদের দিকে চেয়ে এবং এদের কথা শুনে সত্যি সত্যি বাৎসল্যে আমার হৃদয় বিগলিত হয়ে যায়। বাস্তবিক, এরা যেন আমার একটি দেশ-জোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্তনির্ভরপর সরল চাষাভুষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে। এদের ভাষা শুনতে আমার এমন মিষ্টি লাগে—তার ভিতর এমন স্নেহমিশ্রিত করুণা আছে! এরা যখন কোনো-একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে—অন্য নানা ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়। এরা অনেক দুঃখ অনেক ধৈর্য-সহকারে সহ্য করছে, তবু এদের ভালোবাসা কিছুতেই ম্লান হয় না।"[৮]

এই চিঠি লেখার তিনমাস পরে কবি লিখলেন 'বসুন্ধরা' কবিতা। বসুন্ধরায় কবির বিশ্বানুভূতি ভাষা পেয়েছে। কবি লিখলেন, 'ইচ্ছা করে, আপনার করি যেখানে যা-কিছু আছে।' 'সকলের ঘরে ঘরে জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।' উদ্ধৃত তিনখানি পত্রে কবির করুণাঘন মূর্তিরই প্রকাশ। নিপীড়িত লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত মানুষের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি এবং সমপ্রাণতার রসেই কবিহৃদয় নিষ্ণাত। কবিচিত্তে জনচেতনার এই নিগূঢ় সঞ্চার অবিস্মরণীয় কাব্যরূপ পেল ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৩ ফাল্গুন। কবি লিখলেন তাঁর নবজন্মের অভিষেক-কাব্য 'এবার ফিরাও মোরে'। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে বিলাসের কোলে লালিত ভারতের এক রাজপুত্র একদিন পথের পাশে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকবলিত মানুষের দুঃখের স্বরূপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মানবজীবনের এই নিষ্করুণ নিয়তি দেখে পরম বেদনায় কপিলবাস্তুর সেই রাজার দুলাল প্রাসাদমালার সুখস্বপ্ন পরিত্যাগ করে নেমে এসেছিলেন পথের ধুলোয়। মানুষের হাতে তুলে দিয়েছিলেন দুঃখতরণ মন্ত্র,—মৈত্রী ও করুণার সঞ্জীবনী বাণী। 'এবার ফিরাও মোরে'র কবির মানস-লোকেও আমরা অনুরূপ লীলাই প্রত্যক্ষ করব। দুঃখাভিহত নিয়তিবিড়ম্বিত মানুষের

অভিশপ্ত দিনযাত্রা প্রত্যক্ষ করে তিনিও বললেন :

ওই-যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী ; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার,—
তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি,
নাহি ভৎ'সে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি,
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে,
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।

৪

শত শতাব্দীব্যাপী মানুষের বেদনার এই করুণ কাহিনী কবিমানসে কী গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার জলন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে এই সময়কার লেখা একটি ছোট-গল্প। তার নাম 'শাস্তি'। ১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসে লেখা। যে চেতনার আদর্শায়িত কাব্যরূপ 'এবার ফিরাও মোরে', সেই চেতনারই বাস্তবায়িত গল্পরূপ হল 'শাস্তি।' রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই গল্পটি। দুখিরাম রুই আর ছিদাম রুই দুই ভাই এ গল্পের নায়ক। এরা কৃষি-মজুর, অর্থাৎ পল্লীসমাজের সর্বনিম্নস্তরের মানুষ। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, সর্বহারা মানুষ বংলার কথাসাহিত্যে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের হাতেই নায়ক-নায়িকার সর্বোচ্চ আসনের অধিকার লাভ করল। 'শাস্তি' গল্পটি শুধু রবীন্দ্রনাথেরই এক অনবদ্য সৃষ্টি নয়, বিশ্বসাহিত্যেও তার তুলনা পাওয়া কঠিন।

এই হতভাগ্য মানুষগুলোর অবস্থা বর্ণনা করে 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় কবি বলেছেন :

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা,—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।

ছোট গল্পের ব্যবহার্য সাংকেতিক ভাষায় কবি বলেছেন "বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জলমগ্ন পাটের ক্ষেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচীরের মতো জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।"

"অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড়ো স্থির ভয়ংকর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙিয়া লোকালয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন-কি ভাঙনের ধারে দুই-চারিটা আম-কাঁটাল গাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।"

সংকেত-ভাষণের দিক দিয়ে এই বর্ণনা যে অসামান্য ব্যঞ্জনা বহন করছে তা বলাই বাহুল্য। সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্পের নিশ্চল প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এই মানুষগুলো তাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত আঙুলগুলো শূন্যে একটা-কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়ে ধরতে চাইছে।

এই ভাবে প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটের উপর যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করে গল্পটির সূত্রপাত। জমিদারের অত্যাচারে নিপীড়িত নিঃসহায় একটি কৃষিশ্রমিক পরিবারের মর্মান্তিক ট্রাজেডিই এই গল্পের বিষয়বস্তু। জমিদার অবশ্য রঙ্গমঞ্চে সাক্ষাৎ পদার্পণ করেনি, সে নিয়তির মতোই নেপথ্যচারী। গল্পকার লিখছেন,

"দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারির ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ও-পারের চরে জালিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোক মাত্রেই কেহ বা নিজের খেতে কেহ বা পাট কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল, কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবর্দস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারিঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল, তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে—উচিতমতো পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটুকথা শুনিতে হইয়াছে সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।"[১]

পথের কাদা এবং জল ভেঙে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে এসে দুভাই দেখলে ছোটো জা চন্দরা ভূমিতে আঁচল পেতে চুপ করে পড়ে আছে, আর বড়ো জা রাধা মুখটা মস্ত করে দাওয়ায় রয়েছে বসে।

"ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল, "ভাত দে।"

"বড়োবউ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মতো এক মুহূর্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

"সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে, প্রজ্জলিত ক্ষুধানলে, গৃহিণীর রুক্ষবচন, বিশেষত শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জনে বলিয়া উঠিল, "কী বললি।" বলিয়া মুহূর্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।"

এখানেই গল্পের প্রথমাংশের শেষ। দ্বিতীয়াংশে দেখা গেল এই বিড়ম্বিত মানুষগুলো কি ন্যায় কি অন্যায়, কি আচরণীয় কি অনাচরণীয় তাও বুঝতে পারে না। দাদাকে হত্যার দায় থেকে বাঁচাতে গিয়ে ছোটভাই দোষ চাপালে চন্দরার ঘাড়ে। বিমূঢ় বিশ্বাসে ভেবেছিল, মিথ্যা কথা ধর্মাধিকরণে মিথ্যা বলেই প্রমাণিত হবে। কিন্তু আদালতের বিচারে নিরপরাধা চন্দরাই দোষী বলে সাব্যস্ত হল। হল তার প্রাণদণ্ডের আদেশ। অভিমানিনী চন্দরা মুখ বুজে সেই শাস্তি মাথা পেতে নিলে।

"জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?"

"চন্দরা কহিল, "একবার মাকে দেখিতে চাই।"

"ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"

"চন্দরা কহিল, "মরণ!—"

মৃত্যুর পটভূমিতে দাঁড়িয়ে অভিমানক্ষুব্ধ নারীর এই চরম ধিক্কার-বাণীতেই গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। বলাই বাহুল্য, জোড়াসাঁকোর প্রাসাদমালায় এ শব্দকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলার মৌনমূক জনপদের দলিত মথিত চিত্ত ওর মধ্যে কথা কয়ে উঠেছে।

৫

'শাস্তি' গল্পে জমিদার-রবীন্দ্রনাথের গোত্রান্তর পরিলক্ষণীয়। তাঁর সমস্ত সহানুভূতি নিগৃহীত প্রজাদের পক্ষে। এই গল্পের দুবৎসর পরে ১৩০২ সালে লেখা 'দুই বিঘা

জমি'তেও একই চেতনা :

এ জগতে হায় সেই বেশি চায় আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

শুধু সহানুভূতি নয়, দুর্গতের দুঃখহরণের মহাসংকল্পও তিনি গ্রহণ করলেন। সারস্বত সন্তানের মহাব্রত :

এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ;

নিজের কবিসত্তাকে সম্বোধন করে বললেন,

কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান।

* * *

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য-মাঝারে কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি॥

এ সংকল্প শূন্যগর্ভ সুভাষিতমাত্রই নয়, জনচিত্তে স্বর্গীয় বিশ্বাস সৃষ্টির দুশ্চর তপশ্চর্যা শুরু হল রবীন্দ্রনাথের জীবনে। কবি হলেন জনগণের শিক্ষাগুরু। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, "সকলের গোড়ায় চাই শিক্ষিত মন।" জোড়াসাঁকোর রাজপ্রাসাদে তিনি আর ফিরে গেলেন না। বীরভূমের রুক্ষমাটির দেশে, যেখানে বঙ্গজননী গৈরিক বসনে সন্ন্যাসিনী সেজেছেন সেখানে শুরু হল নবজীবনের সাধনা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় আদর্শে ও চর্যায় প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার পাঁচ বৎসর পরে 'শিক্ষা-সংস্কার' সম্পর্কে আলোচনায় তিনি বলেছেন, "চাকরির অধিকার নহে, মনুষ্যত্বের অধিকারের যোগ্য হইবার প্রতি যদি লক্ষ্য রাখি তবে শিক্ষা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-চেষ্টার দিন আসিয়াছে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই। দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্বপ্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব—অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, বুদ্ধিতে মরিব, চরিত্রে মরিব—ইহা নিশ্চয়।"[১০] এই উক্তি থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার প্রেরণার উৎস কোথায় ছিল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের শিক্ষানীতির উল্লেখ করেছেন। টলস্টয় বলেছেন,

"It seems to me that it is now specially important to do what is right quietly and persistently, not only without asking permission from Government, but consciously avoiding its participation. The strength of the Government lies in the people's ignorance, and the Government knows this, and will therefore always oppose true enlightenment. It is time we realised that fact."[১১]

রবীন্দ্রনাথ দুর্গত জনগণের শিক্ষাগুরু হিসাবে টলস্টয়ের নাম পরম শ্রদ্ধায় উচ্চারণ করে সেদিন তাঁকে বলেছেন, 'য়ুরোপে গুরুর আসনে' 'একটিমাত্র সাধক'। বস্তুত শিক্ষাগুরু হিসাবে টলস্টয় ও রবীন্দ্রজীবনের মধ্যে একটি আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। আদর্শ একই, পার্থক্য এই যে টলস্টয় তাঁর নিজের জমিদারিতে তাঁরই প্রজাসাধারণের মধ্যে জ্ঞানের আলোক বিকিরণের ব্রত নিয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র ছিল তাঁর প্রজাসাধারণের প্রতিদিনের জীবন থেকে দূরে। তার হেতু সম্পর্কে একটু আভাস পাওয়া যাবে ছিন্নপত্রাবলীর একখানি পত্রে। কবি লিখছেন, "আমি যদি আমাদের প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতুম তা হলে আমি এদের বড়ো সুখে রাখতুম—এবং এদের ভালোবাসায় আমিও সুখে থাকতুম।"[১২] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, মহর্ষি-দেবের ভাষায়, জমিদারির একজন কার্যপর্যবেক্ষক মাত্র। তাছাড়া, সেদিন ভারতের সাত লক্ষ পল্লীই ছিল বিদেশী শাসনে সন্ত্রাসিত একটি অখণ্ড কারাগার।

শান্তিনিকেতন-পর্বে রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা তাঁর ঈশ্বর-চেতনার সঙ্গেও ওতপ্রোত হয়ে ছিল। সেদিন 'সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা'-রূপেই তিনি অন্তরে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাই 'গীতাঞ্জলি'র ঈশ্বরনিষ্ঠ কবিকণ্ঠে শুনতে পাই :

যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নিচে,
সব-হারাদের মাঝে। [১৯ আষাঢ় ১৩১৭]

ভজন পূজন সাধন আরাধনা
সমস্ত থাক পড়ে।
রুদ্ধদ্বারে দেবালয়ের কোণে
কেন আছিস ওরে।

* * *

তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে
করছে চাষা চাষ,—
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,
খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে,
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি
আয় রে ধূলার 'পরে। [২৭ আষাঢ়, ১৩১৭]

ধূলার 'পরে আসন পেতেই রবীন্দ্রজীবনের দ্বিতীয়ার্ধ জনশিক্ষাব্রতে উৎসর্গীকৃত।

৬

কবিজীবনের অপরাহ্নলগ্নে তাঁর চিত্তে জনচেতনা কী রূপ পরিগ্রহ করেছিল তা জানার কৌতূহল রবীন্দ্র-মানসতীর্থযাত্রীর মুখ্য অভিলাষ। তেত্রিশ বৎসর বয়সে কবির কামনা ছিল, 'সকলের ঘরে ঘরে জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে।' আশি বৎসর বয়সে কবি বলছেন :

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
* * *
বিশাল বিশ্বের আয়োজন;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
* * *
সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন-অন্তরালে
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাইনে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।
* * *
মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।[১৩]

১৩৪৬ সালের বৈশাখে লেখা, 'নবজাতকে'র "এপারে-ওপারে" কবিতায়ও সমান ক্ষোভের সঙ্গেই কবি বলেছিলেন, তাঁর মন "সর্বব্যাপী সামান্যের সচল স্পর্শের" জন্যে ব্যগ্র হয়ে ওঠে, কিন্তু

আপনার উচ্চতট হ'তে
নামিতে পারে না সে যে সমস্তের ঘোলা গঙ্গাস্রোতে।

রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্যের এই কবিতা দুটি বহুল প্রচলিত। কিন্তু আসলে এ দুটি কবিতা নয়, কবিমানসের কড়চা। কবির এই অক্ষমতার ক্ষোভ সত্যকার কাব্যরূপ পেয়েছে 'পুনশ্চে'র "একজন লোক" কবিতায়। শহরের দিকে নাগ্‌রা পায়ে চলেছে রোগা লম্বা একটি মানুষ—আধবুড়ো হিন্দুস্থানি। কবি বলছেন, পথিকটিকে দেখা গেল তাঁর বিশ্বের শেষ রেখাতে যেখানে বস্তুহারা ছায়াছবির চলাচল। তিনি ওকে শুধু জানলেন একজন লোক বলে। ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, বেদনা নেই। ওই লোকটির জীবনেও রবীন্দ্রনাথ শুধু একজন লোক মাত্র। তার জগতের পোড়ো জমির শেষ সীমানায় সে কবিকে দেখে গেছে। তার জীবনে রবীন্দ্রনাথ কোনো ফসলই ফলাতে পারেন নি। কবি বলছেন :

তার ঘরে তার বাছুর আছে,
ময়না আছে খাঁচায় ;
স্ত্রী আছে তার, জাঁতায় আটা ভাঙে
পিতলের মোটা কাঁকন হাতে ;
আছে তার ধোবা প্রতিবেশী,
আছে মুদী দোকানদার,
দেনা আছে কাবুলিদের কাছে।

কিন্তু ওই লোকটির জীবনে কোনোখানেই নেই কবি রবীন্দ্রনাথ। এ না-থাকার মর্মান্তিক হাহাকার কবিতাটিতে ভাষা পেয়েছে। শুধু কবিহৃদয়ের বার্তা নয়, সহৃদয়-হৃদয়-সংবাদী বেদনা ওর প্রতিটি কথার মধ্যে সঞ্চারিত। আসলে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিটি মানুষের 'জীবন্ত হৃদয়ে' স্থান পেতে চেয়েছিলেন এ কবিতায় উচ্চারিত কবির মর্মবেদনা তারি সাক্ষী। আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ যৌবনলগ্নে করুণাঘন মূর্তিতে দেখা দিয়েছিলেন। তাঁর প্রেমঘন মূর্তিই এই চেতনার অন্তিম বিগ্রহ। যে-প্রেম মানবসমাজে উচ্চ নীচ, কিঞ্চন অকিঞ্চনের ব্যবধান দূর করে দেয়, মানুষের মর্মলোককে করে নির্বারিত, অর্গলমুক্ত, সেই প্রেমের মন্ত্রেই কবিচিত্তে জনচেতনার চরম সার্থকতা ঘটল। বুদ্ধদেবের মৈত্রীভাবনা ছিল বাৎসল্যরসাশ্রিত। একমাত্র-সন্তানের প্রতি মাতার জীবনপণ অনুরক্তিই তার উপমান।

রবীন্দ্রচিত্তে জনচেতনা মধুররসাশ্রয়ী। চিত্তরঞ্জক রতিই তার স্থায়িভাব। দুটি মাত্র কবিতার ইঙ্গিত দিয়ে আমরা এই আলোচনার উপসংহার রচনা করব। ১৩৪১ সালে লেখা 'বীথিকা'র "সাঁওতাল মেয়ে" আর ১৩৪৩ সালে [৬ নভেম্বর ১৯৩৬] লেখা 'সানাই'-এর "মুক্তপথে"।

তখন কবির মাটির ঘর 'শ্যামলী' তৈরি হচ্ছিল।

সেখানে কাজ করছিল একটি সাঁওতাল-কিশোরী। ওই কিশোরী মেয়েটিই "সাঁওতাল মেয়ে" কবিতার আলম্বন। অর্থনৈতিক মানুষ নয়, মেহনতি মানুষের শ্রমের মর্যাদার প্রশ্নও নয়, ওর মধ্যে কবি দেখেছেন চিরন্তনী কিশোরীকে।

মোটা শাড়ি আঁট করে ঘিরে আছে তনু কালো দেহ।
বিধাতার ভোলা-মন কারিগর কেহ
কোন্ কালো পাখিটিরে গড়িতে গড়িতে
শ্রাবণের মেঘে ও তড়িতে
উপাদান খুঁজি
ওই নারী রচিয়াছে বুঝি।
ওর দুটি পাখা
ভিতরে অদৃশ্য আছে ঢাকা,
লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর ওড়া।

বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে এই রূপকল্পের তুলনা নেই। কবি বলছেন,

আমি দেখি চেয়ে,
ঈষৎ সংকোচে ভাবি,—এ কিশোরী মেয়ে
পল্লীকোণে যে ঘরের তরে
করিয়াছে প্রস্ফুটিত দেহে ও অন্তরে
নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা
শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধাভরা,
আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি,—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সার দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।

শেষ বাক্যটিতে কবিতার আক্ষেপানুরাগ উচ্ছলিত হয়ে উঠেছে। যে-নারী তার আত্মনিবেদনপরা সহজ শক্তিতে দেহমনপ্রাণকে শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধায় ভরে তুলেছে কবি

তাকে লাগিয়েছেন "কেনা কাজে করিতে মজুরি।" তাই সুধার বদলে সে বহন করে আনছে ঝুড়ি ভরে মাটি! বলাই বাহুল্য, মানব-সম্পর্কের ট্রাজেডি-চেতনাই এ কবিতার বিষয়।

কবির প্রেমের কবিতার সর্বশেষ সংকলন হল 'সানাই'। ওই গ্রন্থের "মুক্তপথে" কবিতাটি যেন কবির প্রেমচেতনার সর্বশেষ সুর। নির্বিশেষ মানবপ্রেমই রবীন্দ্র-মানসের অন্তিম আলম্বন। সে প্রেমের সর্বনিম্ন সোপানে দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে কবি বলছেন :

বাঁকাও ভুরু দ্বারে আগল দিয়া,
চক্ষু করো রাঙা,
ঐ আসে মোর জাত-খোয়ানো প্রিয়া
ভদ্র-নিয়ম-ভাঙা।

ভদ্রনিয়ম-ভাঙা জাত-খোয়ানো প্রিয়া বটে, কিন্তু ওর আত্মিক সত্তায় কবি পেয়েছেন শাশ্বতী মানবীর সন্ধান। তার মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে মৃৎপাত্রে প্রাণের অমৃত। কবি বলছেন :

হঠাৎ কখন এসেছ ঘর ফেলে
তুমি পথিক-বধূ,
মাটির ভাঁড়ে কোথায় থেকে পেলে
পদ্মবনের মধু।

মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার আগে মর্ত্যমানবী পথিক-কবির শেষ পাথেয় নিয়ে এল মাটির ভাঁড়ে পদ্মবনের মধু। আচার্যের উচ্চাসন থেকে একেবারে মাটির বুকে নেমে এসে ওই অন্ত্যজ ওই মন্ত্রবর্জিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কবি বললেন, 'আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।' ১৩৪৩ সালের ১৮ বৈশাখে লেখা 'পত্রপুটে'র পনেরো সংখ্যক কবিতায় কবির অন্তরঙ্গতম আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটিত হল। বিশ্বমনা মহাকবির সেই আত্মকথাই তাঁর বিচিত্ররশ্মি মানসলোক সম্পর্কে শেষ কথা। কবি বলছেন :

আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন।
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হল

দেবলোক থেকে
মানবলোকে,
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে ॥

॥ উল্লেখপঞ্জী ॥

১ 'মানুষের ধর্ম', পৃ° ২।
২ তদেব। পৃ° ৯৯-১০০।
৩ 'আত্মপরিচয়', পৃ° ৭৭।
৪ রবীন্দ্রজীবনী—১। সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫৩। পৃ° ১৪৯।
৫ 'আত্মপরিচয়', পৃ° ৭৯।
৬ 'ছিন্নপত্রাবলী', পৃ° ৩৯।
৭ তদেব। পৃ° ২০৪-২০৫।
৮ তদেব। পৃ° ২৪১।
৯ গল্পগুচ্ছ—১, পৃ° ২৬২।
১০ 'শিক্ষা' গ্রন্থে 'শিক্ষাসংস্কার' প্রবন্ধ। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী—১২, পৃ° ২৯৪।
১১ তদেব। পৃ° ২৯৪-৯৫।
১২ ছিন্নপত্রাবলী, পৃ° ৪৬০।
১৩ "ঐকতান", 'জন্মদিনে' কাব্যগ্রন্থ।

"বাংলার মাটি, বাংলার জলে"র কবি রবীন্দ্রনাথ

শ্রীসজনীকান্ত দাস

১৯০৫ সনের বিশে জুলাই লর্ড কর্জনের বঙ্গচ্ছেদ-প্রস্তাবে ভারতের তদানীন্তন সেক্রেটারি অব স্টেট সম্মতিজ্ঞাপন করিবার ঠিক একুশ দিন পরে সাতই আগস্ট তারিখে কলিকাতার টাউন হলে এদেশীয়দের এক মহতী সভায় তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হইল, রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখিলেন, "বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে একই জাহ্নবী তাঁহার বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃদয়ের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে।" ওই সনের ষোলই অক্টোবর, ১৩১২ বঙ্গাব্দের ত্রিশে আশ্বিন সোমবার সকল প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া ব্যবচ্ছেদ-ব্যবস্থা কার্যকরী হইল। জাতির শোকের জন্য অরন্ধন এবং বিষাদের মধ্যেই ভাইয়ে ভাইয়ে মিলনের রাখীবন্ধন উদ্‌যাপিত হইল। রবীন্দ্রনাথ রাখীবন্ধন-সঙ্গীত রচনা করিয়া স্বয়ং গঙ্গাস্নানান্তে সেদিন কলিকাতায় পথে পথে গাহিয়া বেড়াইলেন

> "বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল,
> পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।...
> বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন,
> এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥"

১৩১৮ বঙ্গাব্দের চোদ্দই মাঘ সমস্ত বঙ্গভাষাভাষীর প্রতিনিধি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যে অভিনন্দন-পত্রে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশৎবর্ষ-পূর্তিতে কলিকাতার টাউন হলে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিলেন তাহাতে ওই রাখীসঙ্গীতের স্মৃতিতে লিখিলেন :

"এক শুভদিনে তুমি যখন বঙ্গজননীর অঙ্কশোভা বর্ধন করিয়া বাঙ্গালার মাটি ও বাঙ্গালার জলের সহিত নূতন পরিচয় স্থাপন করিলে, বঙ্গের নবজীবনের হিল্লোল আসিয়া তখন তোমার অর্ধস্ফুট চেতনাকে তরঙ্গায়িত করিয়াছিল ; সেই তরঙ্গাভিঘাতে তোমার তরুণ জীবন স্পন্দিত হইল, সেই স্পন্দন-প্রেরণায় তোমার কিশোর হস্ত নব নব কুসুম-সম্ভার চয়ন করিয়া বাণীর অর্চনায় প্রবৃত্ত হইল।"

নদীমাতৃক এই দেশকে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত "গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি" বলিয়াছেন—

> "ধ্যানে তোমার রূপ দেখি গো, স্বপ্নে তোমার চরণ চুমি,
> মূর্তিমন্ত মায়ের স্নেহ ! গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি !......

গলায় তোমার সাতনরী হার মুক্তাঝুরির শতেক ডোর,
ব্রহ্মপুত্র বুকের নাড়ী, প্রাণের নাড়ী গঙ্গা তোর !"

রবীন্দ্রনাথই এই গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমির কবি ; বঙ্গদেশ ও বঙ্গের মৃত্তিকা এবং পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে দুই ধারায় প্রবাহিত গঙ্গা তাঁহার কাব্যে গল্পে উপন্যাসে প্রবন্ধে ওতপ্রোত হইয়া আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "বন্দেমাতরম্—সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্" অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী" মাতৃবন্দনা হিসাবে ছোট নয়। রবীন্দ্রনাথের "মাতৃমূর্তি" দশপ্রহরণধারিণী দুর্গা না হইলেও বাংলাদেশের হৃদয় হইতে অপরূপ রূপে সমুত্থিতা সোনার মন্দিরে স্থাপিতা জননী

"ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে
বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি
ললাট-নেত্র আগুন-বরণ।"

দেশের মাটিকে রবীন্দ্রনাথের মত এমন করিয়া আর কেহ নতি নিবেদন করে নাই, বলে নাই—

"ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে
তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা ॥
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে,
তোমার পরেই খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে
তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা মাতার মাতা।"

যিনি বিশ্বভুবনের রবি-রূপে কাব্যকিরণজালে একদা জগৎ পরিপ্লাবিত করিবেন,

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে ॥...
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
সেই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে ॥"

তাঁহার এই ব্যাকুল প্রার্থনা ঐকান্তিক ছিল বলিয়াই শেষ পর্যন্ত পূর্ণ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশপ্রীতি স্বদেশী আন্দোলনের আকস্মিক আঘাতে সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র নয়, ইহা তাঁহার জন্মগত সংস্কার। ইহার প্রমাণ—তাঁহার সর্বপ্রথম মুদ্রিত বেনামী কবিতা "অভিলাষ" (১৮৭৪, নবেম্বর) হইতে আরম্ভ করিয়া "একসূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন" (১৮৭৯) পর্যন্ত স্বনামে বেনামে মুদ্রিত অধিকাংশ কবিতা ও গান স্বদেশ-প্রেম-দ্যোতক, তন্মধ্যে ১৮৭৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে (কবির বয়স যোলো) 'ভারতী'তে প্রকাশিত "উৎসর্গগীতি"টি ঘোরতর বিপ্লবাত্মক। প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে স্বদেশী আন্দোলন পরবর্তী বৈপ্লবিক সংগ্রামের বীর যোদ্ধারা এই গান হইতেই প্রভূত প্রেরণা সংগ্রহ করিয়াছিল। গানটি অংশতঃ এই—

"তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ,
    তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে
    এ বীণা তোমারি গাহিবে গান॥
যদিও এ বাহু অক্ষম দুর্বল
    তোমারি কার্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন
    তোমারি পাশ নাশিবে॥
যদিও হে দেবি, শোণিতে আমার
    কিছুই তোমার হবে না,
তবুও গো মাতা পারি তা' ঢালিতে
    এক তিল তব কলঙ্ক ক্ষালিতে,
    নিভাতে তোমার যাতনা।"

বাল্যের এই উৎকট স্বদেশ-প্রীতি রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য ও কর্মজীবনে ত্রিমূর্তিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে—১। প্রেমে—বন্দনায়, ২। অভিমানে—ব্যঙ্গে এবং ৩। নৈরাশ্যে—ভর্ৎসনায়। বাংলাদেশের প্রতি এই চিরঅন্তঃশীলা প্রেমের ফল্গুপ্রবাহ কখনও অভিমানে ক্ষুব্ধ ও আবিল হইয়াছে, কখনও নৈরাশ্যজনিত ক্রোধে রুদ্র মূর্তি ধরিয়াছে। গহন-গভীর অন্তরের সংবাদ না জানিয়া যাঁহারা রবীন্দ্রনাথের অসীম ভালবাসার শেষ দুই প্রকাশই দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সম্বন্ধে বিচারে ভুল করিয়াছেন।

বঙ্গমাতার প্রতি প্রেম-বন্দনার কথাই আজ আমার আলোচ্য, অভিমান-নৈরাশ্যের কথা নয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বঙ্গপ্রীতির সঙ্গে গঙ্গা-প্রীতি অঙ্গাঙ্গী হইয়া আছে। আমি প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের অধুনাবিস্মৃত বিলুপ্তপ্রায় গদ্য-রচনা হইতেই তাঁহার বঙ্গ ও গঙ্গাপ্রীতির নিদর্শন দাখিল করিতেছি—এগুলি যতদূর সম্ভব কালানুক্রমিক ভাবেই দিতেছি :

১৮৮৩, ১১ই সেপ্টেম্বর [২২ বৎসর ৪ মাস]

আমি এই বঙ্গদেশের কত স্থানের কত পবিত্র গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাইয়াছি। আমি যাঁহাদের চিনি না, তাঁহারা আমার কথা শুনিতেছেন, তাঁহারা আমার পাশে বসিয়া আছেন, আমার মনের ভিতরে চাহিয়া দেখিতেছেন। তাঁহাদের ঘরকন্নার মধ্যে আমি আছি। তাঁহাদের কত শত সুখ দুঃখের মধ্যে আমি জড়িত হইয়া গেছি।

১৮৮৪, এপ্রিল [২৩ বৎসর]

আমার একজন বন্ধু দার্জিলিং কাশ্মীর প্রভৃতি নানা রমণীয় দেশ ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বলিলেন বাঙ্গালার মত কিছুই লাগিল না। কথাটা শুনিয়া অধিকাংশ লোকই হাসিলেন। কিন্তু হাসিবার বিশেষ কারণ দেখিতেছি না। বরং যাঁহারা বলেন, বাঙ্গালায় দেখিবার কিছুই নাই, সমস্তটাই প্রায় সমতল স্থান, পাহাড় পর্বত প্রভৃতি বৈচিত্র্য কিছুই নাই, দেশটা দেখিতে ভালই নহে, তাঁহাদের কথা শুনিলেই বাস্তবিক আশ্চর্য বোধ হয়। বাঙ্গালা দেশ দেখিতে ভাল নয়! এমন মায়ের মত দেশ আছে! এত কোলভরা শস্য, এমন শ্যামল পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, এমন স্নেহধারাশালিনী ভাগীরথীপ্রাণা কোমল হৃদয়, তরুলতাদের প্রতি এমনতর অনির্ব্বচনীয় করুণাময়ী মাতৃভূমি কোথায়! একজন বিদেশী আসিয়া যাহা বলে শোভা পায়, কিন্তু আজন্মকাল ইঁহার কোলে যে মানুষ হইয়াছে সেও ইঁহার সৌন্দর্য দেখিতে পায় না! সে ব্যক্তি যে প্রেমিক নহে ইহা নিশ্চয়ই। সুতরাং বাঙ্গালা দেশে সে বাস করে মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালা দেশ সে দেখেই নি—বাঙ্গালা দেশে সে কখনো যায় নি, ম্যাপে দেখিয়াছে মাত্র। এত দেশে গিয়াছি এত নদী দেখিয়াছি কিন্তু বাংলার গঙ্গা যেমন, এমন নদী আর কোথাও দেখি নাই।...

ভালবাসিয়া আজন্ম প্রত্যহ দেশের পানে চাহিয়া দেখিলে দেশ সদয় হইয়া তাঁহার প্রাণের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যান।

১৮৮৪, আগস্ট—[২৩ বৎসর, ৩ মাস]

শান্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে! গাছপালা, ছায়া, কুটীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি দুই ধারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন

হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যন্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া ঝুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম দুলিতেছে, কতকগুলি সূর্য্যকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিকমিক করিতেছে, আর বাকী কতকগুলি, গাছপালার কম্পমান কচি মসৃণ সবুজ পাতার উপরে চিক্‌চিক্‌ করিয়া উঠিতেছে। একটা বা নৌকা তাহার কাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার নীচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে, মৃদু মৃদু দোল খাইয়া বড় আরামের ঘুম ঘুমাইতেছে। তাহার আর এক পাশে বড় বড় গাছের অতি ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাঁধা একটা পথের মত জল পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলসী কাঁধে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁড়াছুঁড়ি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কি শোভা! নূতন আস্ত ঘাটগুলির যে কোন শোভা নাই তাহা বলিতেছি না। কিন্তু প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলি অনেকদিন একত্রে বাস করাতে চারিদিকের আশপাশের সঙ্গে কেমন ভাব করিয়া লইয়াছে, তাহাদের এক পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে। মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা এক রকম ভুলিয়া যাইতে হয়, এও যেন গাছপালার মত গঙ্গাতীরের নিজস্ব সম্পত্তি। ইহার বড় বড় ফাটলের মধ্য দিয়া অশথ গাছ উঠিয়াছে, ধাপগুলির ইঁটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেছে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গাছের উপরে শেওলা পড়িয়াছে—এবং তাহার রং চারিদিকের শ্যামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়া গেছে। মানুষের কাজ ফুরাইলে—প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব ধবধবে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙা-চোরা বিশৃঙ্খল মাধুর্য স্থাপন করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রকৃতি গৃহস্থ ঘরের শাশুড়ী, তিনি বড় মানুষের ঝিকে ঘরে আনিয়া তাহাকে নিজের ঘরকন্নার উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। এখন এ পাষাণ ঘাটের মুখেও একটা কোমল স্নেহের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রামের যে-সকল ছেলেমেয়েরা নাহিতে বা জল লইতে আসে তাহাদের সঙ্গে ইহার যেন একটা কিছু সম্পর্ক পাতান আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেহ ইহার ভাগ্‌নে, কেহ ইহার মা মাসী। তাহাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যখন এতটুকু ছিল তখন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইহার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের দুই চারি জন লোক আশেপাশে জমা হইত,

তাহার কথা আজ আর কাহারও মনেও নাই। গঙ্গাতীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কি মাহাত্ম্য আছে। তাহার মধ্যে আর দেব-প্রতিমা নাই। কিন্তু সে নিজেই জটাজুটবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মত অতিশয় ভক্তিভাজন ও পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। জীর্ণদেহ অতীতের কিয়দংশ যেন বর্তমানের মাঝখানে বসিয়া আছে। তাহার কী গভীর বিষাদপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য! তাহার সেই প্রাচীনতাবেষ্টিত স্বাতন্ত্র্যের কী একটি পবিত্রতা আছে—এই গঙ্গার তীরে শ্মশানের পার্শ্বে তাহার যেমন উপযুক্ত স্থান এমন আর কোথায়! এক এক জায়গায় কতকটা লোকালয়ের মত—জেলেদের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে, কতকগুলি ডাঙ্গায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে, তাহাদের পাঁজরা দেখা যাইতেছে। কুঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোন কোনটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া—দুই চারিটি গরু আপন মনে চরিয়া বেড়াইতেছে—গ্রামের দুই একটা শীর্ণ কুকুর নিষ্কর্ম্মার মত গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—একটা উলঙ্গ ছেলে মুখের মধ্যে আঙুল পুরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সমুখে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া আছে। হাঁড়ি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোট ছোট জাল লইয়া জেলের ছেলেরা ধারে ধারে চিংড়ি মাছ ধরিয়া বেড়াইতেছে। সুমুখে তীরে বটগাছের জালবদ্ধ শিকড়ের নীচ হইতে নদীস্রোতে মাটি ক্ষয় করিয়া লইয়া গিয়াছে—ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিভৃত আশ্রয় নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ী তাহার দুই চারিটি হাঁড়ি কুঁড়ি ও একটি চট লইয়া তাহারি মধ্যে বাস করে। আবার আর-এক দিকে চড়ার উপরে বহুদূর ধরিয়া কাশবন—শরৎকালে যখন ফুল ফুটিয়া উঠে তখন বায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে থাকে। যে কারণেই হউক, গঙ্গার ধারের ইঁটের পাঁজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ লাগে—প্রায় তাহাদের আশেপাশে গাছপালা থাকে না—চারিদিক পোড়ো জায়গার মত দেখিতে এবড়ো-খেবড়ো, ইতস্ততঃ কতকগুলি ইঁট খসিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ান—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অনুর্বরতা বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলো কেমন হতভাগ্যের মত দাঁড়াইয়া থাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে; সম্মুখে ঘাট, নহবৎখানা হইতে নহবৎ বাজিতেছে, তাহার ঠিক পাশেই খেয়াঘাট। কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের গুঁড়ি দিয়া বাঁধান। আরও দক্ষিণে কুমারদের বাড়ী—চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌঢ়া কুটিরের দেয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাঙ্গণ পরিষ্কার তক্তক্ করিতেছে—কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে তুলসীতলা। সূর্য্যাস্তের সময় নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে

দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্ছায় ম্লান সন্ধ্যালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাছগুলি, মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তব্ধ গাছের মাথাগুলি, স্থির জলের উপর লাবণ্যের মত সন্ধ্যার আভা—সুমধুর বিরাম, নির্বাপিত কলরব, অগাধ শান্তি—সে সমস্ত মিলিয়া নন্দনের একখানি মরীচিকার মত, ছায়াপথের পরপারবর্তী—সুদূর শান্তিনিকেতনের একখানি ছবির মত পশ্চিম দিগন্তের ধারটুকুতে আঁকা দেখা যায়। ক্রমে সন্ধ্যার আলো মিলাইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক-একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতে থাকে—সহসা দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে—পাতা ঝর্‌ঝর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কূলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ-আঘাতে ছল্‌ছল্ করিয়া শব্দ উঠিতে থাকে—আর কিছু ভাল দেখা যায় না—শোনা যায় না—কেবল ঝিঁঝি পোকার শব্দ উঠে—আর জোনাকিগুলি অন্ধকারে জ্বলিতে নিবিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমীর চাঁদ ঘোর অন্ধকারে অশথ গাছের মাথার উপর দিয়া ধীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার, আর উপরে ম্লান চন্দ্রের আভা। খানিকটা আলো, অন্ধকার গঙ্গার মাঝখানে একটা জায়গায় পড়িয়া রহিল, তরঙ্গে ভাঙিয়া যাইতে লাগিল। ও-পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর খানিকটা আলো পড়িল—সেইটুকু আলোতে ভাল কিছুই দেখা গেল না। কেবল ও-পারের সুদূরতা ও অস্ফুটতাকে মধুর রহস্যময় করিয়া তুলিল।

১৮৮৪, অক্টোবর—[২৩ বৎসর, ৫ মাস]

ভরা গঙ্গা।...জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্রকাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেখান পর্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ঐ বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইঁটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের নৌকাগুলি ডাঙ্গার বাবলাগাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল, সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছল ছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে। ভরা গঙ্গার উপরে শরৎপ্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে তাহার কাঁচা সোনার মত রং, চাঁপা ফুলের মত রং। রৌদ্রের এমন রং আর কোন সময়ে ত দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

১৮৮৫, মে—[২৪ বৎসর]

স্বদেশের আকাশ আমাদের সেই পূর্বপুরুষদিগের প্রেমে পরিপূর্ণ—আমাদের পূর্বপুরুষদিগের নেত্রের আভা আমাদের স্বদেশ-আকাশের তারকার জ্যোতিতে জড়িত। স্বদেশের বিজনে আমাদের শত সহস্র সঙ্গীরা বাস করিতেছেন, স্বদেশে আমাদের দীর্ঘ জীবন, আমাদের শত সহস্র বৎসর পরমায়ু।

১৮৮৫, জুলাই—[২৪ বৎসর ২ মাস]

[করাচী-প্রবাসী নগেন্দ্রনাথ গুপ্তকে লিখিত চিঠি]

এবারকার চিঠিতে আপনাকে কেবল বাংলার বর্ষাটা স্মরণ করিয়ে দিলুম—আপনি বসে বসে ভাবুন।—ভরা পুকুর। আমবাগান, ভিজে কাক ও আষাঢ়ে গল্প মনে করুন। আর যদি গঙ্গার তীর মনে পড়ে, তবে সেই স্রোতের উপর মেঘের ছায়া, জলের উপর জলবিন্দুর নৃত্য, ওপারের বনের শিয়রে মেঘের উপর মেঘের ঘটা, মেঘের তলে অশথ গাছের মধ্যে শিবের দ্বাদশ মন্দিরের কথা স্মরণ করুন। মনে করুন পিছল ঘাটে ভিজে ঘোমটায় বধূ জল তুলছে; বাঁশ ঝাড়ের তলা দিয়ে পাঠশালা ও গয়লাবাড়ির সামনে দিয়ে সঙ্কীর্ণ পথে ভিজতে ভিজতে জলের কলস নিয়ে তারা ঘরে ফিরে যাচ্চে; খুঁটিতে বাঁধা গরু গোয়ালে যাবার জন্যে হাম্বারবে চীৎকার করচে; আর মনে করুন, বিস্তীর্ণ মাঠে তরঙ্গায়িত শস্যের উপর পা ফেলে ফেলে বৃষ্টিধারা দূর থেকে কেমন ধীরে ধীরে চলে আসচে; প্রথমে মাঠের সীমান্তস্থিত মেঘের মত আমবাগান, তার পরে একেকটি করে বাঁশঝাড়, একেকটি করে কুটির, একেকটি করে গ্রাম বর্ষার শুভ্র আঁচলের আড়ালে ঝাপ্‌সা হয়ে মিলিয়ে আস্‌চে, কুটীরের দুয়ারে বসে ছোট ছোট মেয়েরা হাততালি দিয়ে ডাকচে "আয় বৃষ্টি হেনে ছাগল দেব মেনে"—অবশেষে বর্ষা আপনার জালের মধ্যে সমস্ত মাঠ, সমস্ত বন, সমস্ত গ্রাম ঘিরে ফেলেচে; কেবল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি—বাঁশঝাড়ে, আমবাগানে, কুঁড়ে ঘরে, নদীর জলে, নৌকোর হালের নিকটে আসীন গুটিসুটি জড়সড় কম্বলমোড়া মাঝির মাথায় অবিশ্রান্ত ঝর্‌ঝর্‌ বৃষ্টি পড়চে।

১৮৮৫, ডিসেম্বর—[২৪ বৎসর ৭ মাস]

এই বঙ্গের প্রান্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই? মানবজাতিকে আমাদের কি কিছু সংবাদ দিবার নাই?…আমাদের এই শ্যামল সুন্দর বঙ্গভূমি কি এই সুবিস্তীর্ণ মানবরাজ্যের মধ্যে সাহারাক্ষেত্র? জগতের একতান-সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তব্ধ হইয়া থাকিবে?…আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে স্বর্গের কোনো গান বহন করিয়া আনিতেছে না?…সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ নিজ নাম খুদিতেছে, বাঙ্গালীর নাম কি কেবল পিটিশনের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে?…

বাংলা দেশের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একবার কাঁদিয়া সকলকে ডাকিতে ইচ্ছা

করে—বলিতে ইচ্ছা করে—'ভাই সকল, আপনার ভাষায় একবার সকলে মিলিয়া গান কর। বহু বৎসর নীরব থাকিয়া বঙ্গদেশের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভাষায় একবার আপনার কথা বলিতে দাও। বাংলা ভাষায় একবার সকলে মিলিয়া মা বলিয়া ডাক। কেরানিগিরির ভাষা আপিসের দেরাজের মধ্যে বন্ধ রাখিয়া মাতৃস্তনধারায় পুষ্ট মাতৃভাষায় জগতের বিচিত্র সঙ্গীতে যোগ দাও। বাঙ্গালী-কণ্ঠের সহিত মিলিয়া বিশ্ব-সঙ্গীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।'

[আনুষঙ্গিক ভাবে একই কালে রচিত একটি কবিতার কয়েক পংক্তিকে এখানেই স্থান দিলাম :

উঠ বঙ্গকবি, মায়ের ভাষায় মুমূর্ষুরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায় সে ভাষা করিবে পান !
চাহিবে মোদের মায়ের বদনে, ভাসিবে নয়নজলে,
বাঁধিবে জগৎ গানের বাঁধনে মায়ের চরণতলে।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে স্থান কিনে দাও তুমি।
একবার কবি মায়ের ভাষায় গাও জগতের গান—
সকল জগৎ ভাই হয়ে যায়—ঘুচে যায় অপমান !]

১৮৯০, অক্টোবর (লণ্ডন)—[২৯ বৎসর ৫ মাস]

এখনো আমাদের সময় উত্তীর্ণ হয় নি। কিন্তু আমি আর এখানে পেরে উঠছি নে। বলতে লজ্জা বোধ হয়, আমার এখানে ভাল লাগছে না।···এখন আমি বাড়ি যেতে পারলে বাঁচি। সেখানে আমি সকলকে চিনি, সকলকে বুঝি ; সেখানে সমস্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করে মনুষ্যত্বের আস্বাদ সহজে পাই। সহজে উপভোগ করতে পারি, সহজে চিন্তা করতে পারি, সহজে ভালোবাসতে পারি।···

এদেশে এসে আমাদের সেই হতভাগ্য বেচারা ভারতভূমিকে সত্যি সত্যি আমার মা বলে মনে হয়। আমার আজন্মকালের যা কিছু ভালোবাসা, যা কিছু সুখ, সমস্তই তার কোলের উপর আছে। এখানকার আকর্ষণ চাকচিক্য আমাকে কখনোই ভোলাতে পারবে না—আমি তার কাছে যেতে পারলে বাঁচি। সমস্ত সভ্য সমাজের কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থেকে আমি যদি তারই এক কোণে বসে মৌমাছির মতো আপনার মৌচাকটি ভরে ভালোবাসার সঞ্চয় করতে পারি তা হলেই আর কিছু চাইনে।

[এই মনোভাবই দীর্ঘ পনোরো বৎসর পরে ১৯০৫ সনের (স্বদেশী আন্দোলন) একটি গানে প্রকাশ হইয়াছে—

যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক
আমি তোমায় ছাড়ব না মা,
আমি তোমার চরণ করব শরণ
আর কারো ধার ধারব না মা।]

গঙ্গার প্রতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ 'জীবনস্মৃতি' পর্বে (১৯১১-১২) তাঁহার দশ বছর বয়সে দেখা পেনেটির গঙ্গা ও ষোল বছর বয়সের চন্দননগরের গঙ্গার অপূর্ব বর্ণনায় প্রকাশ পাইয়াছে। কলিকাতায় ডেঙ্গুজ্বরের তাড়নায় ছাতুবাবুদের পেনেটির বাগান বাড়িতে পলায়নের কথা এই : "এই প্রথম বাহিরে গেলাম। গঙ্গার তীরভূমি যেন কোন্ পূর্বজন্মের পরিচয়ে আমাকে কোলে টানিয়া লইল।...গঙ্গা সম্মুখ হইতে আমার সমস্ত বন্ধন হরণ করিয়া লইলেন।"

চন্দননগরের স্মৃতি এইরূপ: "আবার সেই গঙ্গা। সেই আলস্যে আনন্দে অনির্বচনীয়। বিষাদে ও ব্যাকুলতায় জড়িত, স্নিগ্ধ শ্যামল নদীতীরের সেই কলধ্বনিকরুণ দিনরাত্রি। এইখানেই আমার স্থান, এখানেই আমার মাতৃহস্তের অন্ন পরিবেষণ হইয়া থাকে। আমার পক্ষে বাংলাদেশের এই আকাশভরা আলো, এই দক্ষিণের বাতাস, এই গঙ্গার প্রবাহ, এই রাজকীয় আলস্য, এই আকাশের নীল ও পৃথিবীর সবুজের মাঝখানকার দিগন্ত প্রসারিত উদার অবকাশের মধ্যে সমস্ত শরীর মন ছাড়িয়া দিয়া আত্মসমর্পণ—তৃষ্ণার জল ও ক্ষুধার খাদ্যের মতোই অত্যাবশ্যক ছিল।"

১৯৩২ সনের ৩রা জুন পারস্য ভ্রমণ শেষে কবি দেশে ফিরিয়া খড়দহের গঙ্গা-তীরবর্তী একটি প্রাসাদে কয়েক দিন ছিলেন। সেখানে তাঁহাকে প্রণাম করিতে গেলে তিনি কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, "এই নদীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ নাড়ীর যোগ, আমি গঙ্গার সন্তান।"

১৯৩৭ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি চন্দননগরে অনুষ্ঠিত বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের উদ্বোধন-ভাষণে ওই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছিলেন—

"এই গঙ্গাতীরে আমার কবি-জীবনের উদ্বোধন। সেই সময় আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম যে, বাঙলা দেশের নদীই বাঙলা দেশের ভিতরকার প্রাণের বাণী বহন করে। ...আমারও সেতার ছিল...তার বাঁধা হয় নি, সুর ধরা হয় নি।...সেই মুক্তি পেয়েছিলাম আমি গঙ্গার তীরে, তাই নিজেকে আমি গাঙ্গেয় বলে মনে করি। জীবনে বারংবার আমি তার পরিচয় পেয়েছি।

গঙ্গা যেদিন কাব্যছন্দে কবিকে বিশ্বপ্রকৃতির পথে প্রথম মুক্তি দিয়াছিল সেদিনের স্মৃতি কবির মনে এই রূপ: "সেদিন গঙ্গাতীরের পূর্বদিগন্তে বনরেখার উপরের পথে

প্রতিদিন সকালে সোনার আলোয় মাধুর্যের যে ডালি আসত সে আর কারো চোখে তেমন করে পড়ে নি, আর সূর্যাস্তের নানা রঙের তুলিতে গঙ্গার জলধারায় রেখায় রেখায় যে লেখন দেখা দিত সে বিশেষ করে আমারই জন্যে।”

১৮৮৬ হইতে ১৯০০ সন অর্থাৎ ‘কড়ি ও কোমল’ হইতে ‘কল্পনা’র প্রকাশ কাল পর্যন্ত—এই পনের বৎসর রবীন্দ্র-কাব্যে বঙ্গবাসীর প্রতি প্রবল অভিমান এবং তজ্জনিত ব্যঙ্গ-ভর্ৎসনার কাল। এই কালে অবশ্য প্রেম ভালবাসা স্তুতি-বন্দনারও কমতি নাই। সহস্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এখান-সেখান হইতে এলোমেলো ভাবে কয়েকটি দিলেই যথেষ্ট হইবে। বঙ্গভূমি, গঙ্গা ও পদ্মা, বাংলার পল্লী, হিন্দুবাঙালীর গার্হস্থ্য জীবন রবীন্দ্র-সাহিত্যকে কী ভাবে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করিয়াছে, এই উদ্ধৃতিগুলিতে তাহার পরিচয় মিলিবে।

(১) আমি ভালবাসি, দেব, এই বাঙলার
দিগন্তপ্রসার ক্ষেত্রে যে শান্তি উদার
বিরাজ করিছে নিত্য, মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবীগান, যে মাধুরী একাকিনী
নদীর নির্জন তটে বাজায় কিংকিণী
তরল কল্লোলরোলে, যে সরল স্নেহ
তরুচ্ছায়া-সাথে মিশি স্নিগ্ধপল্লীগেহ
অঞ্চলে আবরি আছে, যে মোর ভবন
আকাশে বাতাসে আর আলোকে মগন
সন্তোষে কল্যাণে প্রেমে—করো আশীর্বাদ
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

(২) এ নদীর কলধ্বনি যেথায় বাজে না
মাতৃকলকণ্ঠসম, যেথায় সাজে না
কোমলা উর্বরা ভূমি নব নবোৎসবে
নবীনবরণবস্ত্রে যৌবনগৌরবে
বসন্তে শরতে বরষায়, রুদ্ধাকাশ
দিবসরাত্রিরে যেথা করে না প্রকাশ

পূর্ণপ্রস্ফুটিতরূপে, যেথা মাতৃভাষা
চিত্ত-অন্তঃপুরে নাহি করে যাওয়া-আসা
কল্যাণী হৃদয়লক্ষ্মী, যেথা নিশিদিন
কল্পনা ফিরিয়া আসে পরিচয়হীন
পরগৃহদ্বার হতে পথের মাঝারে—
সেখানেও যাই যদি মন যেন পারে
সহজে টানিয়া নিতে অন্তহীন স্রোতে
তব সদানন্দধারা সর্বঠাঁই হতে।

(৩) তোমার মাঠের মাঝে, তব নদীতীরে
তব আম্রবনে-ঘেরা সহস্র কুটীরে,
দোহনমুখর গোষ্ঠে, ছায়াবটমূলে,
গঙ্গার পাষাণঘাটে, দ্বাদশ দেউলে,
হে নিত্যকল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন অজস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে।...
...অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যুষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি,
মধ্যাহ্নে পল্লবাঞ্চল প্রসারিয়া ধরি
রৌদ্র নিবারিছ— যবে আসে বিভাবরী
চারিদিক হতে তব যত নদ নদী
ঘুম পাড়াবার গান গাহে নিরবধি
ঘেরি ক্লান্ত গ্রামগুলি শত বাহুপাশে।
শরৎ-মধ্যাহ্নে আজি স্বল্প অবকাশে
ক্ষণিক বিরাম দিয়া পুণ্য গৃহকাজে
হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে
বসিয়া রয়েছ মাতা; প্রফুল্ল অধরে
বাক্যহীন প্রসন্নতা; স্নিগ্ধ আঁখিদ্বয়
ধৈর্যশান্ত দৃষ্টিপাতে চতুর্দিকময়
ক্ষমাপূর্ণ আশীর্বাদ করে বিকিরণ।

হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবি-চক্ষে ভরি আসে জল।

(৪) সেই চিরকলতান উদার গঙ্গা
বহিছে আঁধারে আলোকে,
সেই তীরে চিরদিন খেলিছে বালিকা-বালকে
ধীরে সারা দেহ যেন মুদিয়া আসিছে
স্বপ্নপাখির পালকে।

(৫) আজি নির্মলবায় শান্ত উষায়
নির্জন নদীতীরে
স্নান-অবসানে শুভ্রবসনা
চলিয়াছ ধীরে ধীরে।
তুমি বাম করে লয়ে সাজি
কত তুলিছ পুষ্পরাজি,
দূরে দেবালয়তলে উষার রাগিণী
বাঁশিতে উঠিছে বাজি
এই নির্মলবায় শান্ত উষায়
জাহ্নবীতীরে আজি।
দেবী, তব সিঁথিমূলে লেখা
নব অরুণ সিঁদুর-রেখা,
তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা।
এ কী মঙ্গলময়ী মুরতি বিকাশি
প্রভাতে দিতেছ দেখা।

(৬) নমো নমো নমঃ সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি।
গঙ্গার তীর স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।
পল্লবঘন আম্রকানন রাখালের খেলাগেহ
স্তব্ধ অতল দীঘি কালোজল—নিশীথশীতল স্নেহ।

বুকভরা মধু বঙ্গের বধূ জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান চোখে আসে জল ভরে।

(৭) …ধরাতলে দীনতম ঘরে
যদি জন্মে প্রেয়সী আমার, নদীতীরে
কোনো এক গ্রামপ্রান্তে প্রচ্ছন্ন কুটিরে
অশ্বত্থছায়ায়, সে বালিকা বক্ষে তার
রাখিবে সঞ্চয় করি সুধার ভাণ্ডার
আমারি লাগিয়া সযতনে। শিশুকালে
নদীকূলে শিবমূর্তি গড়িয়া সকালে
আমারে মাগিয়া লবে বর। সন্ধ্যা হলে
জ্বলন্ত প্রদীপখানি ভাসাইয়া জলে
শঙ্কিত কম্পিত বক্ষে চাহি একমনা
করিবে সে আপনার সৌভাগ্য গণনা
একাকী দাঁড়ায়ে ঘাটে। একদা সুক্ষণে
আসিবে আমার ঘরে সন্নতনয়নে
চন্দনচর্চিতভালে, রক্তপট্টাম্বরে,
উৎসবের বাঁশরী সঙ্গীতে। তারপরে
সুদিনে দুর্দিনে, কল্যাণকঙ্কণ করে
সীমন্তসীমায় মঙ্গলসিন্দুরবিন্দু,
গৃহলক্ষ্মী দুঃখে সুখে পূর্ণিমার ইন্দু
সংসারের সমুদ্র শিয়রে।…

উদ্ধৃতিগুলির প্রথম ও দ্বিতীয় কবিতা 'নৈবেদ্যে'র (১৯০১) এবং এই কাব্য হইতেই রবীন্দ্রনাথের মন বিশ্বমুখী হইয়াছে। তাহারও একটু পূর্ব ইতিহাস আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ১৮৮৬ সনের প্রারম্ভে করাচীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনিই বিদেশ হইতে সর্বপ্রথম অনুভব করিয়াছিলেন বাংলার কবির জন্য বিশ্বকবির সিংহাসন ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতেছে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখনও পঁচিশ হয় নাই, নগেন্দ্রনাথ চব্বিশ বর্ষীয় যুবক। ১৮৮৬ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত একটি রচনায় তিনি বলিলেন :

"যিনি যাহাই বলুন এ কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, যে-সকল মহাবাক্য উচ্চারিত হইয়াছে তাহা অধিকাংশ ছন্দগ্রথিত। কাব্যই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন

গ্রন্থ। সহস্র সহস্র বৎসর অতিক্রম করিয়া যে-কথা আমাদের হৃদয়ে আজিও প্রবেশ করিতেছে তাহা কবির কথা। বাল্মীকি ব্যাস কালিদাসকে ছাড়িলে আমরা নিতান্তই দরিদ্র হইয়া পড়ি, হোমর সেক্সপীয়রকে ছাড়িলে ইউরোপের ঐশ্বর্য অল্পই অবশিষ্ট থাকে। জগতের এই যে মহাসঙ্গীত, এই যে কাল-বিজয়ী গান, ইহাতে বাঙ্গালী কখন যোগ দিতে পারিবে কি? এমন কথা কখন কি বাঙ্গালীর মুখ দিয়া বাহির হইবে যে সেই কথা সঞ্চয় করিয়া রাখিবার জন্য জগতের অন্যান্য জাতি কাড়াকাড়ি করিবে?

মহাকবি কখন জন্মগ্রহণ করেন, মহাবাক্য কখন উচ্চারিত হয়? মনুষ্য জাতি সমুদ্র বিশেষ। সেই সমুদ্র মথিত হইলে তবে তাহা হইতে অমৃত উঠে। মনুষ্য-সমাজ এইরূপ অনেকবার মথিত হইয়াছে, অনেকবার অমৃত উঠিয়াছে। অনেক মানুষের হইয়া যখন একজনে কথা কয়, অনেক মানুষকে শুনাইবার জন্য যখন একজন কোন সংবাদ লইয়া আসে, তখন সেই কথা অমৃততুল্য, সেই কথার বিনাশ নাই। বহু দুঃখে কিম্বা বহু সুখে বহু দিন পরে এমন বাক্য নির্গত হয়। বাঙ্গালী কি এমন অবস্থায় পতিত হইয়াছে যে তাহার আকুল হৃদয় মথিত হইয়া অমৃত-মণ্ডিত কোন সঙ্গীত বাহির হইয়া পড়িবে?

* * *

বাঙ্গালীর কি এখনো কিছু হয় নাই?...বহু দূরে বসিয়া [করাচী] সতৃষ্ণ নয়নে স্বদেশের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি। দেখিতেছি চারিদিকে কোলাহল, চারিদিকে আন্দোলন,—সমুদ্র চঞ্চল হইয়াছে। নানা দিক হইতে নানা রকমের স্রোত আসিয়া মিশিতেছে, অসংখ্য লোকে স্রোতের মুখে পড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছে। অসংখ্য লোকে আবর্তে পড়িয়া ঘুরিতেছে, কতকলোকে স্রোতের সঙ্গে যুঝিতেছে।...দুঃখ অভাব চারিদিকে। চারিদিকে লোকের কষ্ট বাড়িতেছে, অন্ন দুষ্প্রাপ্য হইতেছে, লোকে আকুল হইয়া পড়িতেছে। সমুদ্রমন্থন বুঝি বা আরম্ভ হয়।

এখন যাহা হইতেছে তাহা থাকিবে না।...বাঙ্গালী একা থাকিয়া কিছু করিতে পারিত না। ইংরাজ আসিয়া তাহার দশা ফিরাইয়াছে। তাহার মুখের ভাব আর এক রকম হইয়াছে। এখন আবার ভারতবর্ষের অন্য জায়গা হইতে স্রোত বহিয়া বঙ্গদেশে যাইতেছে। বাঙ্গালীর গান ভারতবর্ষের গান হওয়া চাই, তবেই সে গান টিঁকিবে। ভারতবর্ষের এত দুর্দশা হইলেও একতা একেবারে কখন নষ্ট হয় নাই। আচার ব্যবহার বেশভূষায় হাজার প্রভেদ থাকিলেও প্রাণের ভিতর একটা মিল আছে। এই বহু জাতির হৃদয় অলক্ষ্যে মিলিত হইয়া যে গান গাইবে, তাহা বঙ্গদেশেই গীত হইবে। সেই আমাদের গান।

আমরা তবে কি করিতেছি? আমরা সিংহাসন রচনা করিতেছি। বাঙ্গালীর কবি সেই সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিবেন। আমাদের মাথায় পা রাখিয়া তিনি যে গান গাহিবেন পৃথিবীর সর্বত্র সেই গান ধ্বনিত হইবে।..."

ইহার পরেই যুবক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত (১৮৯১) তাঁহার "নিও-রোমান্টিক মুভমেণ্ট ইন বেঙ্গলি লিটারেচার" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথকে ইউরোপীয় কবিদের মধ্যে উচ্চ আসনে স্থাপন করিয়া বলিলেন, রবীন্দ্রনাথ কাব্যজগতে নবযুগের পুরোধা। ১৯০০ সনের ১লা সেপ্টেম্বর ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সোফিয়া' পত্রে ঘোষণা করিলেন, "If ever the Bengali language is studied by foriegners it will be for the sake of Rabindra. He is a world-poet." ব্রহ্মবান্ধবের প্রবন্ধের শিরোনামা "The World-Poet of Bengal," "বঙ্গের বিশ্বকবি।" ঠিক ছয় মাসের মধ্যে ১৯০১ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিলেন—

"বিশাল বিশ্বে চারিদিক হতে
প্রতিকণা মোরে টানিছে।
আমার দুয়ারে নিখিল জগৎ
শতকোটি কর হানিছে।"

বিশ্বভুবনের পথে বাংলার কবির জয়যাত্রা সেইদিন হইতেই আরম্ভ হইল। ধীরে ধীরে বিশ্বসাহিত্যের স্বর্ণসিংহাসনে তাঁহার অধিষ্ঠানের সেই ইতিহাস সর্বজনবিদিত। বাংলার মাটি ও জল, বঙ্গোপসাগরের তমালতালীবনরাজিনীল তটরেখা বিশ্বকবির পুষ্পক-যাত্রায় ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল। শুধু ত্রিভুবন বিজয়ের সংগ্রাম-অবকাশে স্মৃতিপথে বাংলার মাটি ও জলের স্মৃতি ক্ষণে ক্ষণে উঁকি দিয়া ফিরিতে লাগিল। 'জীবনস্মৃতি'তে তাহার পরিচয় আছে। এই পরিচয় 'চিত্রা'র "দিনশেষে" কবিতায় বাংলার মাটি ও জলের "এসেন্স"-স্বরূপ সুরভি বিস্তার করিতেছে—

"ভালো নাহি লাগে আর
আসা যাওয়া বারবার
বহুদূর দুরাশার প্রবাসে।
পূরবী রাগিণী বাজে আকাশে।

"কাননে প্রাসাদ চূড়ে নেমে আসে রজনী,
আর বেয়ে কাজ নাই তরণী।
যদি কোথা খুঁজে পাই
মাথা রাখিবার ঠাঁই

বেচা কেনা ফেলে যাই এখনি—
যেখানে পথের বাঁকে
গেল চলি নত আঁখে
ভরা ঘট লয়ে কাঁখে তরুণী।
এই ঘাটে বাঁধো মোর তরণী ॥"

মাথা রাখিবার ঠাঁই বার বার হারাইয়াছে এবং কবি বার বার খুঁজিয়া পাইয়াছেন। হারাইবার জন্য অনুতাপও অন্তরের অন্তস্তলে আছে, ১৯২২ সনের ৭ই মার্চ রচিত "মাটির ডাক" কবিতা তাহার সাক্ষ্য দিতেছে :

"কার কথা এই আকাশ বেয়ে
ফেলে আমার হৃদয় ছেয়ে,
বলে দিনে, বলে গভীর রাতে,
'যে-জননীর কোলের 'পরে
জন্মেছিলি মর্ত্ত-ঘরে,
প্রাণ ভরা তোর যাহার বেদনাতে,
তাহার বক্ষ হতে তোরে
কে এনেছে হরণ করে,
ঘিরে তোরে রাখে নানান্ পাকে !
বাঁধন-ছেঁড়া তোর সে নাড়ী
সইবে না এই ছাড়াছাড়ি,
ফিরে ফিরে চাইবে আপন মাকে।'
শুনে আমি ভাবি মনে,
তাই ব্যথা এই অকারণে,
প্রাণের মাঝে তাই তো ঠেকে ফাঁকা,
তাই বাজে কার করুণ সুরে—
'গেছিস দূরে, অনেক দূরে'
কী যেন তাই চোখের 'পরে ঢাকা।
তাই এত দিন সকল খানে
কিসের অভাব জাগে প্রাণে
ভালো করে পাই নি তাহা বুঝে ;

ফিরেছি তাই নানা মতে
নানান-হাটে, নানান পথে
হারানো কোল কেবল খুঁজে খুঁজে।

আজকে খবর পেলেম খাঁটি—
মা আমার এই শ্যামল মাটি,
অন্নে ভরা শোভার নিকেতন ;
অভ্রভেদী মন্দিরে তার
বেদী আছে প্রাণ-দেবতার,
ফুল দিয়ে তার নিত্য আরাধন।
এইখানে তার অঙ্ক-মাঝে
প্রভাতরবির শঙ্খ বাজে ;
আলোর ধারায় গানের ধারা মেশে !
এইখানে সে পূজার কালে
সন্ধ্যারতির প্রদীপ জ্বালে
শান্ত মনে ক্লান্ত দিনের শেষে।

* * *

কী ভুল ভুলেছিলেম, আহা,
সব চেয়ে যা নিকট, তাহা
সুদূর হয়ে ছিল এত দিন।
কাছেকে আজ পেলেম কাছে—
চারদিকে এই যে ঘর আছে
তার দিকে আজ ফিরল উদাসীন।"

বিশ্বের সমস্ত দেশের সমস্ত মানুষের হৃদয় জয় করিয়া অশীতিপর কবি-সম্রাট যখন শেষ শয্যা গ্রহণ করিলেন তখন 'রোগশয্যায়' সাময়িক 'আরোগ্য'-অন্তে (৩১ জানুয়ারি, ১৯৪১) তিনি তাজমহলের স্বপ্ন দেখেন না.ই, দেখিয়াছিলেন এই গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমির অপূর্ব স্মৃতি-চিত্র—

"আতপ্ত মাঘের রৌদ্রে অকারণে ছবি এল চোখে
জীবন-যাত্রার প্রান্তে ছিল যাহা অনতিগোচর।

গ্রামগুলি গেঁথে গেঁথে মেঠো পথ গেছে দূর-পানে
নদীর পাড়ির 'পর দিয়ে।
প্রাচীন অশথতলা,
খেয়ার আশায় লোক বসে
পাশে রাখি হাটের পসরা।
গঞ্জের টিনের চালাঘরে
গুড়ের কলস সারি সারি,
চেটে যায় ঘ্রাণলুব্ধ পাড়ার কুকুর ।
ভিড় করে মাছি।
রাস্তায় উপুড়মুখো গাড়ি
পাটের বোঝাই ভরা,
একে একে বস্তা টেনে উচ্চস্বরে চলেছে ওজন
আড়তের আঙিনায়।
বাঁধা-খোলা বলদেরা
রাস্তার সবুজ প্রান্তে ঘাস খেয়ে ফেরে,
লেজের চামর হানে পিঠে।
সর্ষে আছে স্তূপাকার
গোলায় তোলার অপেক্ষায়।
জেলে নৌকো এল ঘাটে
ঝুড়ি কাঁখে জুটেছে মেছুনি ;
মাথার উপরে ওড়ে চিল।
মহাজনী নৌকোগুলো ঢালুতটে বাঁধা পাশাপাশি।
মাল্লা বুনিতেছে জাল রৌদ্রে বসি চালের উপরে।
আঁকড়ি মোষের গলা সাঁতারিয়া চাষী ভেসে চলে
ওপারে ধানের খেতে।
অদূরে বনের ঊর্ধ্বে মন্দিরের চূড়া
ঝলিছে প্রভাত রৌদ্রালোকে।
মাঠের অদৃশ্য পারে চলে রেলগাড়ি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনিরেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে,

পশ্চাতে ধোয়ায় মেলি
দুরন্তজয়ের দীর্ঘ বিজয়পতাকা।

মনে এল, কিছুই সে নয়, সেই বহুদিন আগে,
দুপহর রাত্তি,
নৌকা বাঁধা গঙ্গার কিনারে।
জ্যোৎস্নায় চিক্কণ জল,
ঘনীভূত ছায়ামূর্তি নিষ্কম্প অরণ্যতীরে-তীরে,
কচিৎ বনের ফাঁকে দেখা যায় প্রদীপের শিখা।
সহসা উঠিনু জেগে।
শব্দশূন্য নিশীথ আকাশে
উঠিছে গানের ধ্বনি তরুণ কণ্ঠের,
ছুটিছে ভাঁটির স্রোতে তন্বী নৌকা তরতর বেগে।
মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল;
দুই পারে স্তব্ধ বনে জাগিয়া রহিল শিহরণ;
চাঁদের-মুকুট-পরা অচঞ্চল রাত্রির প্রতিমা
রহিল নির্বাক্‌ হয়ে পরাভূত ঘুমের আসনে।

পশ্চিমের গঙ্গাতীর, শহরের শেষ প্রান্তে বাসা,
দূরপ্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নিচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।
হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বাজরার খেতে;
তর্মুজের লতা হতে
ছাগল খেদায়ে রাখে কাঠি হাতে কৃষাণ-বালক।
কোথাও বা একা পল্লীনারী
শাকের সন্ধানে ফেরে ঝুড়ি নিয়ে কাঁখে।
কভু বহু দূরে চলে নদীর রেখার পাশে পাশে
নতপৃষ্ঠ ক্লিষ্টগতি গুণটানা মাল্লা একসারি।
জলে স্থলে সজীবের আর চিহ্ন নাই সারাবেলা।
গোলকচাঁপার গাছ অনাদৃত কাছের বাগানে;

তলায়-আসন-গাঁথা বৃদ্ধ মহানিম,
নিবিড় গম্ভীর তার আভিজাত্যচ্ছায়া।
রাত্রে সেথা বকের আশ্রয়।...

পথে-চলা এই দেখাশোনা
ছিল যাহা ক্ষণচর
চেতনার প্রত্যন্ত প্রদেশে
চিত্তে আজ তাই জেগে ওঠে ;
এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।"

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিবর্ষ জন্মজয়ন্তীতে সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক, শিল্পী ও মনীষীরা নানাভাবে তাঁহাকে সম্বর্ধিত করিয়াছিলেন, কিন্তু বাঙালী বিপিনচন্দ্র পাল যাহা বলিয়াছিলেন, বাংলার মাটি ও বাংলার জলের কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে—

"And the greatest contribution of Rabindranath is this, namely, that he has secured a place for his provincial thought and literature in the world-thought and world-literature of our day."

উন-অশীতি জন্মদিনে "গাঙ্গেয়"-বন্দনা রচনা করিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম, তাহা হইতে উদ্ধৃত করিয়া আজিকার প্রসঙ্গ শেষ করিতেছি—

গঙ্গার মেটে জল
হল উদ্বেল পুঞ্জে পুঞ্জে সফেন ঢেউয়ের রূপে ;
গাঙ্গেয়, তব জীবন এবার মরণ বিহারে মাতে।
সমুদ্র হতে মানস-বলাকা উড়ে হিমাচল পানে
অদৃশ্যজল বিরাট নদীর কায়াহীন পথ ধরি।
ঝঙ্কারময় ভুবন-মেখলা তোমারে উতলা করি
নাড়ীতে নাড়ীতে জাগায় তোমার চপল পদধ্বনি···
হংস-বলাকা উড়িল আকাশপথে
শূন্যে তুলিয়া বিস্ময়-জাগরণ—

সারা জীবনের স্বপ্ন তোমার, গঙ্গার সন্তান,
ভাষা পেল যেন বলাকা-পাখায় নিঃশব্দের মাঝে
গাহিয়া উঠিলে গান—
তোমার চরম গান
ধ্বনিয়া উঠিল একটি প্রশ্ন মাঝে।···
মানস আকাশে গঙ্গা আবার ধূর্জটিজটাজালে
বাঁধা পড়ে গিয়ে তুলিল কলধ্বনি।···
গাঙ্গেয় পুনঃ গঙ্গোত্রীতে তোমার যাত্রা শুরু ॥

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প ও বাংলার সামাজিক জীবন

কাজী মোতাহার হুসেন

রবীন্দ্রসাহিত্যের কাব্য, সঙ্গীত নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, অভিভাষণ, পত্রালাপ প্রভৃতি বহুপর্যায়ে বাংলার সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে শুধু ছোটগল্পের ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ লোকের পরিবার, সমাজ, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, ধর্মবোধ প্রভৃতির কি চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে, তারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করব।

কথা আরম্ভ করবার আগে বলে নেওয়া ভাল, ত্রিশ চল্লিশ বছর আগে গল্পগুচ্ছ পড়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। কোনো কোনোটা হয়ত স্পষ্ট করে না বুঝেও আভাসেই মোটামুটি বুঝে নিয়েছিলাম। তবে রস গ্রহণ করবার পক্ষে বুঝবার প্রয়োজন যতই থাক না কেন, আমার বিশ্বাস অনুভবের ক্ষমতাই বেশী সাহায্য করে। যা হোক, পূর্বস্মৃতির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে 'একত্র প্রকাশিত' গল্পগুচ্ছের চুরাশিটা গল্পের মধ্যে শতকরা-পঁয়তাল্লিশটা আবার পড়ে নিয়েছি। যৌবন কালের পড়া আর বুড়ো বয়সের পড়ার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে বৈকি। কিন্তু আপনাদের কাছে তার বিশেষ পরিচয় না-ই বা দিলাম। গল্পগুচ্ছ পড়ে রবীন্দ্রনাথের বাক্-সংযম আয়ত্ত করতে না পারলেও, অন্ততঃ একটু চেষ্টা করে দেখা মন্দ কি? এ সত্ত্বেও স্পষ্ট ব'লে রাখছি, আমার কাছে গভীর পাণ্ডিত্য বা বিচার-বুদ্ধির আশা করবেন না;—যা বলতে যাচ্ছি, সে হচ্ছে একজন পাঠকের অতি সাধারণ মনোভাব সাদা-মাঠা ভাষায় ব্যক্ত করা মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ সমাজকে দেখেছেন সহানুভূতির অন্তরঙ্গতার আলোকে। মানুষের ব্যথা, অবমাননা, অবিচার, অত্যাচার; বুদ্ধির অ-মুক্তি, বিধিলিপির সহজ-স্বীকৃতি; সভ্যতার সংঘাতে সমস্যাসৃষ্টি, কালধর্মের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলার দুরূহতা, চিন্তা ও ব্যবহারিক জীবনের অসামঞ্জস্য; সাংসারিক জীবনব্যাপারের উর্ধ্বে সূক্ষ্মতর শাশ্বত সত্যের অন্বেষণ,—এই সব বিষয় কবির দৃষ্টিতে খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, এবং মনেও গভীর দাগ কেটেছে। ছোট গল্পের মধ্যে তিনি এই সব দ্বন্দ্বের চমৎকার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন; অথবা, অন্য কথায়, তাঁর ছোটগল্পের ভিতর দিয়ে আভাসে ও প্রকাশে এই সব সমস্যা দীপ্যমান হ'য়ে উঠেছে।

'উলুখড়ের বিপদ', 'শাস্তি', 'মেঘ ও রৌদ্র', 'সমস্যাপূরণ', 'স্বর্ণমৃগ' প্রভৃতি গল্পে

বিশেষ করে কামিনী, কাঞ্চন বা অন্তবিধ ব্যাপার নিয়ে পৃথিবীতে কত প্রবঞ্চনা ও অত্যাচার হচ্ছে, তার চিত্র পাওয়া যায়। 'উলুখড়ের বিপদে' নায়েব গিরিশবাবু সত্যিই নায়েব-কুলের একজন ঝানু ব্যক্তি। কেমন করে সময় মত পদধূলি নিতে হয়, কি উপায়ে বিরাগভাজনদেরকে মিথ্যার ফাঁসে জড়িয়ে নাস্তা-নাবুদ করতে হয়, এসব ব্যাপারে তিনি সিদ্ধহস্ত। তা-ছাড়া, এই স্বল্প-পরিসর গল্পেও জজ-মুন্সেফের রেশারেশির ফলে কেমন করে নির্দোষ ব্যক্তিরাও অন্-সেফ্ হয়ে পড়েন, তা বিবাদী ভট্টাচার্য মশাইয়ের উকিলের একটি বাক্যেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এইভাবেই উলুখড়ের প্রাণ যায়।

'শাস্তি' গল্পে বাঙালী পরিবারে কিছুদিন আগেও বহু ক্ষেত্রে স্ত্রীর প্রতি যে অপরি-সীম উপেক্ষা ছিল তার একটা উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বড় ভাইকে বাঁচাতে গিয়ে নিরপরাধ স্ত্রীকে মিথ্যে খুনের দায়ে জড়িয়ে ফেলা নেহাৎ মামুলি কাজ, আর রীতিমত বিধিসম্মত। কারণ, স্ত্রী মরলে পাওয়া যাবে, কিন্তু ভাই মরলে ভাই পাওয়া যাবে কোথায়? এ-রকম 'যা শত্রু পরে পরে'—ফিলজফি হয়ত বোকামি হ'তে পারে, কিন্তু এর নৃশংসতা বাস্তবিকই ভয়ঙ্কর।

'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পেও হাকিমদের ন্যায়বোধ আর আমাদের দেশের একদল লোকের মর্যাদাবোধ দুটোই শোচনীয়। "আহম্মুকের ভালো-ই করা যায় না"—এই নীতি বাক্যটা আমাদের পূর্বপুরুষেরা বোধ হয় বারংবার ঠেকে-ঠেকেই আবিষ্কার করেছিলেন! এ-ছাড়া এই সুন্দর গল্পে আর একটা নব-জাত সমস্যার কথাও তুলে ধরা হ'য়েছে, সে হচ্ছে, সমাজের শিক্ষিত যুবকেরা গ্রামে বাস ক'রে আজ আর আনন্দ পায় না। গ্রামে সচরাচর মনের খোরাকের খুবই অভাব; তা'তে আবার গ্রাম্য দলাদলি ও ও ইতরামিতে যোগ দিতে না পারলে সেখানে তিষ্ঠানোই মুশকিল হ'য়ে পড়ে।

'সমস্যা-পূরণ' গল্পে দেখতে পাই, সে কালে নানা কুসংস্কার ও কুপ্রথা থাকলেও জমিদার এবং প্রজাদের মধ্যে বেশ একটা সহজ হৃদ্যতার আদান প্রদান ছিল। বর্তমান বণিক্-সভ্যতার প্রসারে সে হৃদয়ের সম্পর্ক দূর হ'য়ে এখন মানুষে-মানুষে কেবল একটা শুষ্ক যান্ত্রিক সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। মির্জাবিবির পুত্র অছিমুদ্দী যে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করলো, সেটাকে ত একটা মহৎ প্রিন্সিপ্‌ল্ বলা চলে না! এই গল্পে বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার এই ভয়াবহ দিকটা বেশ ফুটে উঠেছে। মনে হয়, দুর্বলতার সঙ্গেও যদি হৃদ্যতা থাকে তবে সেই দুর্বলতাও উৎপীড়নের সহচর কঠোর প্রিন্সপ্‌ল্‌এর চেয়ে ঢের ভাল, এই ছিল কবির মনের কথা। "স্বর্ণমৃগ" গল্পের বৈদ্যনাথ লাঠি চাঁছায় ওস্তাদ হ'লে কি হবে, আসলে অতিশয় নিরীহ নিষ্কর্মা প্রকৃতির লোক। তার অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণ হ'ল তার পিতাকে "প্রচুর স্নেহবাক্য" দিয়ে পিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁর "বিষয়

সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন।" একান্নবর্তী পরিবারে আত্মীয় স্বজনের হক্ মেরে লাভবান হওয়ার চেষ্টা কি গ্রামে, কি শহরে, হামেশাই দেখা যায়। এক ভাইয়ের ঘরে প্রাচুর্য, অন্য ভাইয়ের অন্ন জোটে না—এ তো সাধারণ ঘটনা। বিশেষ ক'রে ঘরের গৃহিণীদেরই এই পার্থক্যের ফলাফল বেশী ক'রে ভুগতে হয়। গৃহিণীর পরামর্শ ও আদেশে গুপ্তধন পেয়ে হঠাৎ বড়লোক হওয়ার আশায় বৈদ্যনাথ কাশী চলে গেলেন। এর তদ্বির করতে, অর্থাৎ সন্ন্যাসীর ভোগ জোগাতে সামান্য যা-কিছু সম্বল ছিল ইতি-মধ্যে তা-ও প্রায় যায়-যায় হ'য়ে উঠেছিল। অবশেষে, গুপ্তধনের মধ্যে পাওয়া গেল লোহার শিকলে বাঁধা একটা মুখ-খোলা ভাঙা ডেগচী মাত্র! অতি স্বাভাবিক, অথচ মর্মান্তিক পরিণতি।

পরিণতির দিক দিয়ে 'রাসমণির ছেলে'—এর জুড়ি গল্প হ'লেও, আদর্শের দিক দিয়ে অনেক পৃথক্। গল্পের ব্যাপারটা হ'ল উইল চুরি, আর জমিদার পুত্র তারাপদ কর্তৃক নির্বোধ খুড়োমশাই ভবাণীচরণকে বোকা বুঝিয়ে সমুদয় পৈত্রিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে উক্ত সম্পত্তি ভাগ করে নেওয়া। ভবাণীচরণের মাতা ছেলেকে প্রায় প্রতিদিন এই বলে আশ্বাস দিতেন যে, "আমি আইন আদালত কিছুই বুঝি না; আমি তোমাকে বলিতেছি, কর্তার সে উইল কখনোই চিরদিন চাপা থাকিবে না। সে তুমি নিশ্চয়ই ফিরিয়া পাইবে।" ভবাণী আজীবন সতীমায়ের আশ্বাস বাণীতে অটল আস্থা বজায় রেখেছিলেন। এই ছিদ্র ধ'রেই ক্রমে ক্রমে তাঁর ক্ষুদ্র সংসারে সর্বনাশ ঘনিয়ে আসলো। ভবাণীচরণের স্ত্রী রাসমণি একটু কম ঘরের মেয়ে হলেও অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি শিশুপুত্র কালীপদকে অতি সাবধানে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে লাগলেন। মেধাবী ছেলে বৃত্তি পেতে পেতে এন্ট্রান্স পাশ করলো। তারপর এল. এ. পড়বার সময় কলকাতার কোনো মেসের নিচের তলায় একটি অন্ধকার সাঁৎসেতে ঘরে থেকে, প্রত্যহ মেস বাড়ীতে গিয়ে ছেলে পড়িয়ে এসে নিজেও পড়াশুনা করতে লাগলো। এই সময় মেসের উপরতালায় অবস্থানকারী কতকগুলো আমুদে ছেলের অত্যাচারে কালীপদকে অনেক নাজেহাল হ'তে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কপালের লিখনে ছেলেদের নির্দয় তামাশাই কালীপদর মৃত্যুর কারণ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে রাসমণির পরিবারের সমস্ত আশা-ভরসাই চূর্ণ হ'য়ে গেল।

'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' গল্পেও মৃত্যুকালীন উইলের থেকে গল্পের সূচনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সরস ভূমিকাটা উল্লেখ না করে পারা যায় না। সেটি এই: "যাহারা বলে গুরুজনের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছিলেন, তাহারা বিশ্ব-নিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে

গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা, এবং চিংড়ী মাছের ঝাল-চচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তাভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল তখন স্তূপাকৃতি চর্বিত ডাঁটা এবং নিঃশেষিত অন্ন পাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন, "দুটো পান্তাভাত যে মুখে দেব, তারও সময় পাওয়া যায় না।" যা-হোক মৃত্যুকালে পতিদেব তাঁর ধর্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে ভুলেন নাই, বরং তাঁহারই নামে নিজের স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যান।" বরদাসুন্দরীর দেবর নির্বোধ রামকানাই নিজহস্তে গুরুচরণের কথিত মত উইলটা লিখে ভাইকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছিলেন। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা অতিশয় স্পষ্ট,—কোনও প্রমাদের অপেক্ষা রাখে না। লিখবার সময় একটু আধটু বদলিয়ে লিখে দিলেই সব ল্যাঠা চুকে যেত, তা না ক'রে— (রামকানাইয়ের স্ত্রীর কথায় "দাদা বললেন লেখো, 'ভাই' অমনি লিখে গেলেন। তোমরা সবাই সমান। তুমিও সময়কালে ওই কীর্তি করবে বলে ব'সে আছ। আমি মরলেই কোন্ পোড়ার-মুখী ডাইনীকে ঘরে আনবে—আর আমার সোনার চাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে। কিন্তু সেজন্য ভেবো না, আমি শিগ্‌গির মরছি নে।" এরপর যা ঘটল তা উল্লেখ না করলেও চলে। শেষ পর্যন্ত নির্বোধ রামকানাইকে কোনো ছুতোয় কাশী পাঠিয়ে দিয়ে উইল জালের মামলা রুজু হ'ল। কিন্তু সমন পেয়ে ফিরে এসে রামকানাই এবারও নির্বোধের মত সাক্ষী দিয়ে স্ত্রী-পুত্রের সমস্ত আশা-ভরসা নির্মূল করে দিয়ে, তারপর অবিলম্বে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। কেন? পৃথিবী থেকে বিদায় যখন নিলেনই, কিছুদিন আগে বিদেয় নেওয়ার কথাটাও মাথায় আসলো না? নির্বোধ আর কাকে বলে?

বদ্ধ সংস্কার যে কত অনর্থ ঘটাতে পারে 'জীবিত ও মৃত' গল্পটা তার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। জমিদার বাড়ীর বিধবা বধূ কাদম্বিনী,—শ্মশানঘাটের খাটিয়া থেকে ফিরে এসে তিনি বেঁচেই আছেন, না মরেই আছেন, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। কারণ, শ্মশানঘাটে দাহ করতে নিয়ে যাওয়ার পর ত ভূতই কেবল বেঁচে থাকে, মরামানুষ কেমন করে বাঁচবে? এই ধাঁধাঁয় পড়ে তিনি সমাজের সঙ্গে আর নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারলেন না,—বাল্য সখীর সঙ্গেও না, আর যে-ভাসুরপুত্র খোকাকে অসীম স্নেহে লালন-পালন করেছিলেন, তার এবং জমিদার বাড়ীর অন্যান্য সকলের সঙ্গেও না। অনেকদিন পরে বাল্য সখীর বাড়ী থেকে এই 'খোকা'র কাছে এসেই কাদম্বিনী নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি বেঁচেই আছেন। কিন্তু আর কেউ তা বিশ্বাস না করাতে, তিনি যে বেঁচে আছেন তা' প্রমাণ করবার জন্য আবার তাঁকে মরতে হ'ল।

'সংস্কার' গল্পটা আরম্ভ হয়েছে এই ভাবে : "চিত্রগুপ্ত এমন অনেক পাপের হিসাব বড়ো অক্ষরে তাঁর খাতায় জমা করেন যা' থাকে পাপীর নিজের অগোচরে।" এই ছোট গল্পটায় প্রথমে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখান হয়েছে। বর্ণনাগুলো বেশ উপভোগ্য সত্য ঘটনা, যা শিল্পীর চোখে পড়ে, অথচ আমরা, সাধারণ লোকেরা, দেখেও দেখতে পাই নে। শেষের ব্যাপারটা এই যে, স্নানান্তে একটি মেথর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সঙ্গে একটা নাবালক নাতি। এই সময় "অহিংসা-ব্রত, পুণ্যার্থী মাড়োয়ারীদের এক দল বহুমূল্য পূজোপচার নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছে।" হয়ত এঁদের কারো সঙ্গে মেথরের গাত্র-স্পর্শ হয়ে থাকবে। সেই দোষে মেথরকে বেদম প্রহার করা হচ্ছে। গল্পের স্বামী-স্ত্রী সেই সময় মোটরে ক'রে কোনও পার্টিতে যাচ্ছিলেন। স্বামী স্থির করলেন, মেথরটিকে নিজের গাড়ীতে তুলে নিয়ে "দেখাবেন, তিনি ঐ সব ধার্মিকের দলে নেই।" কিন্তু তা আর হ'য়ে উঠল না—স্ত্রীর হুকুমে শোফার গাড়ী হাঁকিয়ে চলে গেল। অনুগত স্বামী স্ত্রীর কাছে অধ্যাপক নয়নমোহনের সমাজতত্ত্বঘটিত গভীর যুক্তির আবৃত্তি শুনতে শুনতে, নয়নের-ওখানে চা-পার্টিতে পৌঁছে গেলেন। ঐ মজলিসে, "হিন্দু কালচারে সংস্কার ও স্বাধীন বুদ্ধি, আচার ও বিচারের স্থানটা কী, এবং সেই আপেক্ষিকতায় আমাদের দেশকে অন্যসব দেশের চেয়ে উৎকর্ষ কেন দিয়েছে, এই নিয়ে চায়ের টেবিলে তপ্তচায়ের ধোঁয়ার মতই সূক্ষ্ম আলোচনায় বাতাস আর্দ্র ও আচ্ছন্ন হবার আশু সম্ভাবনা আছে।" অথচ গাত্র-স্পর্শ নিয়ে হাঙ্গামাটা কত অন্যায় হল এ নিয়ে আলোচনা হবারও কোনো সম্ভাবনা নেই।

"প্রায়শ্চিত্ত" গল্পের প্রথম লাইনেই এর সারাংশের আভাস দেওয়া হয়েছে এই ভাবে : "স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝখানে এমন একটা অনির্দেশ্য অরাজক স্থান আছে যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশ-কুসুমের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়ু-দুর্গবেষ্টিত মহাদেশের নাম "হইলে-হইতে-পারিত।" অর্থাৎ, গল্পের নায়ক অনাথবন্ধু, যা-খুশী তাই হতে পারতেন, তবে তিনি কিছুই হতে চাইলেন না,—কারণ, তাঁর চাইবার মত বড় জিনিস ত থাকা চাই ভু-ভারতে! সে যা-হোক, তাঁর স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী স্বামী-গর্বে বিশেষ গর্বিতা।...প্রথম প্রথম ঘর জামাই অনাথবন্ধুর বেশ চলে যাচ্ছিল, শেষে শ্বশুরকুলের তাচ্ছিল্য অনুভব করে স্ত্রীকে নিয়ে স্বগ্রামের কুঁড়ে ঘরে আশ্রয় নিলেন। এখানেও বড় ভাইয়ের অন্ন ধ্বংস করতে লাগলেন, রুজি রোজগারের কোনও চেষ্টাই করলেন না। যা-হোক্, কিছুদিন পরেই শারদোৎসবের সময় তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য শ্বশুরবাড়ী থেকে যানবাহন এসে পড়লো। তারপর সুযোগ বুঝে অনাথবাবু শ্বশুরের ক্যাশবাক্স খুলে টাকা বের করে নিয়ে সরে পড়লেন

একেবারে বিলেতে। বিন্ধ্যবাসিনী সমস্ত দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়ে নিলেন। তাতে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রতি সকলের কি ধারণা হল, তা বলাই বাহুল্য। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর কুঁড়ে ঘরে ফিরে এলেন। স্বামী বিলেতে গিয়েও অর্থের অনটনে পড়েছেন এই মর্মে বারংবার চিঠি লিখতে লাগলেন। আর, বিন্ধ্যবাসিনী ক্রমে ক্রমে বাপের বাড়ী থেকে তাঁর সমুদয় গহনা-গাটি নিয়ে এসে বিক্রয় করে বিলেতে টাকা পাঠাতে লাগলেন। যথাসময় অনাথবন্ধু ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু নিজ বাড়ীতে বা শ্বশুরবাড়ীতে না উঠে উঠলেন হোটেলে। এর মধ্যে এক দুর্ঘটনায় শ্বশুর মশাইয়ের একমাত্র পুত্র নৌকাডুবিতে মারা যাওয়ায় অনাথবন্ধু আবার শ্বশুরের অনুরোধে প্রায়শ্চিত্ত করে শ্বশুরবাড়ীতেই উঠে এসে তাঁদের কৃতার্থ করতে সম্মত হলেন। প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান চলছে, এমন সময় হঠাৎ এক মেম সাহেব, মিসেস অনাট বন্ধু সরকার সভাস্থলে উপস্থিত হ'য়ে অনাথবন্ধুকে আলিঙ্গন ক'রে তাঁহার তাম্বুল-রাগ-রক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন অঙ্কন করিয়া দিলেন।...এই হ'ল অনাথবন্ধুর কাছ থেকে পতি-ধন-গরবিনী বিন্ধ্যবাসিনীর উপযুক্ত প্রতিদান! এমন ঘটনা বাংলার জাতীয় জীবনের ইতিহাসে বিরল নয়, আর এ-যে শুধু বিলাত ফেরতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা-ও নয়। "রাজটিকা" গল্পটায় জাতীয় জীবনে আদর্শ-সঙ্কটের একটা হাস্যোজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ব্যাপারটা এই: রায় বাহাদুরের ছেলে, নবেন্দুশেখরেরও রায় বাহাদুরী মনোবৃত্তি। কিন্তু তাঁর প্রথম স্ত্রী নিঃসন্তান অবস্থায় মারা যাবার পর তিনি যে পরিবারে দ্বিতীয় বিবাহ করেন, তাঁদের সবারই মনোবৃত্তি পৃথক্, অর্থাৎ সাহেব-ঘেঁষা নয়। এই স্ত্রী সুন্দরী, শ্যালী-সম্পদও প্রচুর, আর তাঁরাও সকলেই বেশ সুন্দরী ও হাস্য-রসিকা, কাজে কাজেই বিশেষ আকর্ষণীয়া। তাইতে নবেন্দু পড়েছে ফাঁপরে—একদিকে সাহেব-সুবাদেরও খুশী রাখতে হবে, নইলে রায় বাহাদুরী ফশ্‌কে যায়; আবার অন্যদিকে শ্যালিকারত্নদেরও অবশ্যই মন জোগানো চাই, নইলে জীবনে অনেকখানি রসের থেকে বঞ্চিত হতে হয়। শালীদের নিত্যি নতুন ফন্দী, আর নবেন্দুরও এঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে সাহেব-ভজনের প্রচেষ্টা—এ দুইয়েরই সরস বর্ণনা রয়েছে এই গল্পে। নবেন্দুর দশা দেখে সত্যিই মনে হয়,—"নবেন্দুশেখরের সহিত অরুণ-লেখার যখন বিবাহ হইল, তখন হোম-ধূমের অন্তরাল হইতে ভগবান প্রজাপতি ঈষৎ হাস্য" করেছিলেন। অবশ্য, এ-কথাও ঠিক যে আজকাল এমন (বা অন্য ধরণের) দোটানায় পড়েন নি, এমন লোক বাঙালী সমাজে বিরল।

স্ত্রীপুরুষের ভালবাসার মধ্যে কতখানি মেকি আছে, সমাজবিধানের কাছে হৃদয়ের কি প্রকার লাঞ্ছনা ঘটে, জাত বড় না ভালবাসা বড়—এ সব প্রশ্নের সাধারণ মীমাংসা

নেই ; বিশেষ মীমাংসা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির (প্রধানতঃ পুরুষ ব্যক্তিটির) উপরেই। এর একটা সমাধান তুলে ধরেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ 'ত্যাগ' গল্পে। কুসুম ও হেমন্তের হয়েছিল অসবর্ণ বিবাহ। জানাজানি হওয়ার পর স্বামী যখন তার পিতার আদেশে স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপ শেষ না করে হঠাৎ উঠে চলে গেল, তখন কুসুম বুঝলো, এবার সব সম্পর্ক, ভালবাসার অভিনয় চুকে গেল। বোধ করি, সে ভাবলো, "যে ভালবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা—যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক, যাহার মুহূর্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়, যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যার অবসান কল্পনা করা যায় না—সেই ভালবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর! সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালবাসা চুর্ণ হইয়া এক মুষ্টি ধূলি হইয়া গেল!...ভালবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী, মিথ্যাচারিণী।" এক্ষেত্রে অবশ্য কুসুমের কপাল ভাল। হেমন্ত সেই রাত্রেই আবার ফিরে এসেছিল, এবং দ্বিতীয়বার চটির চট্পটি শুনে শয়নগৃহের দ্বারে উঠে গিয়ে পিতাকে বলতে পেরেছিল, "আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে পারিব না।" পিতা তখন গর্জে উঠে বললেন, জাত খোওয়াইবি? হেমন্ত বলেছিল, "আমি জাত মানি না।" অতঃপর পিতার মুখ দিয়ে সমাজের আদেশ বেরিয়েছিল, "তবে তুই শুদ্ধ দূর হইয়া যা।" খুব সম্ভব হেমন্তের এই সিদ্ধান্ত কেবল গল্পের সিদ্ধান্ত নয়, কবি-গুরুরই অভীপ্সিত সিদ্ধান্ত।

ছোটগল্পের ছোট ছোট খোঁচগুলোও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সংক্ষেপ করতে গেলে এর রসের হানি হয়। কারণ এতে অবয়বটা পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় শুধু কঙ্কালটা। তবু নিরুপায় হয়ে বর্তমান প্রবন্ধে জোর কাটছাঁট করতে হচ্ছে। 'দিদি' গল্পে শশিকলা ও জয়গোপালের দাম্পত্যজীবন বেশ একরকম করে কেটে যাচ্ছিল। মাঝখান থেকে বৃদ্ধ বয়সে জয়গোপালের শ্বশুরের এক পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করায় শ্বশুরের সম্পত্তির উপর শশিকলা বা জয়গোপালের কোনও স্বত্বই আর রইল না। তাই এই ছেলেটিকে জয়গোপাল অত্যন্ত অবাঞ্ছিত বলে মনে করল। শশিকলার মনও প্রথমে বিরূপ হয়ে উঠেছিল, তবে শেষ পর্যন্ত শিশুটার ছলা-কলায় দিদির মন গলে গেল। কিছুকাল পরেই জয়গোপালের শ্বশুর-শাশুড়ীর মৃত্যু হয়। যাহোক মৃত্যুর পূর্বেই শশীর পিতা কন্যার নামে সিকি সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যান, সম্পত্তি রক্ষার ভার দিয়ে যান জয়গোপালের উপর। দেখা গেছে নাবালকের সম্পত্তির রক্ষকই শেষে ভক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। এদিকে নীলমণিকে শশী অত্যধিক স্নেহ করতে লাগলেন ; এটা জয়গোপালের মনঃপূত হল না। নীলমণি বরাবরই দুর্বল ছিল। একদিন হঠাৎ তার খিঁচুনীসহ প্রবল জ্বর হল। জয়গোপাল বিশেষ গ্রাহ্য করল

না। তাই দেখে শশিকলা নীলমণিকে শহরের এক ডাক্তারের বাড়ীতে দেখাতে নিয়ে গেল। কিন্তু জয়গোপাল জানতে পেরে ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হয়ে স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ বাড়ীতে ফিরে যেতে বলল। স্ত্রী ফিরল না। তখন জয়গোপাল বলে গেল, "তা বেশ, তবে এখানেই থাকো। আমার বাড়ীতে আর ফিরে যেতে হবে না।" শশী বলল, "তোমার বাড়ী কিসের? বাড়ী তো নীলমণির।" জয়গোপাল বলে গেল, "সে দেখা যাবে।" বলা বাহুল্য, ইতিমধ্যেই শ্বশুরের সব সম্পত্তি, ঘরবাড়ী, জয়গোপাল বে-নামীতে কিনে নিয়েছে। যাহোক এরপর অনেক ব্যাপার ঘটলো; অবশেষে জয়গোপাল নীলমণি-সহ শশীকে বাড়ীতে নিয়ে গেল। কিছুদিন পরেই একদিন সকালে হঠাৎ শুনা গেল, রাত্রে শশী ওলাউঠায় মারা গিয়েছে, আর রাত্রেই তার দাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত হয়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, এই জয়গোপাল ও শশীকলার মধ্যে নীলমণির আগমনের পূর্বে বেশ ভালবাসা ছিল; আর শশীকলা স্বামীর এমন কোনও অপরাধ কল্পনা করতে পারত না যাতে তাঁর প্রতি কোনও কঠোর মনোভাব পোষণ করা যেতে পারে।

দেনা-পাওনা, পুত্রযজ্ঞ, স্ত্রীর পত্র, হৈমন্তী, বিচারক, ভাই ফোঁটা, শেষের রাত্রি, তপস্বিনী, পয়লা নম্বর, পাত্র-পাত্রী—এসব গল্পে বিবাহ, প্রেম, বংশগৌরব, পণপ্রথা, শাশুড়ী-ননদের হাতে স্ত্রীর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা প্রভৃতি সমাজ ব্যবস্থা, অথবা গুপ্ত অনুরাগ, সমাজ-ত্যাগ প্রভৃতি হৃদয়-ঘটিত ব্যাপার ও তার পরিণতি বিবিধ অনুপাতে মিশিয়ে বিচিত্র ধরণের ছোটগল্প তৈরী হয়েছে। সহজ স্বাভাবিকতায় এগুলো বড় মর্মস্পর্শী। আশেপাশের পারিবারিক ঘটনা ও অবস্থা দৃষ্টে কবিগুরুর মার্জিত মনে যেসব সমস্যা জেগেছে তার বিশিষ্ট রূপ ধরা পড়েছে এই সব ছোট গল্পে।

'দুরাশা' আর 'বোষ্টমী' গল্প দুটোর ভিতরে বাঙালী সমাজ-জীবনের একএকটা বিশিষ্ট দিক ফুটে উঠেছে। 'দুরাশা'তে বদ্রাওনের নবাব গোলামকাদের খাঁর পুত্রীর জীবনেতিহাসের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ যুবকের ধর্মভাবের প্রতি নবাব-পুত্রীর সপ্রশংস দৃষ্টি, এবং পরে উক্ত ব্যক্তির প্রতি অনুরাগ ও আত্ম-নিবেদন; অন্যদিকে ব্রাহ্মণের বিকট বিজাতি-বিদ্বেষ ও নিষ্ঠুর আচরণ। ব্রাহ্মণ ভক্তি-অর্ঘ্যের মর্যাদা দিল না, ঐতিহাসিক ঘটনার পথ ধরে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, আর নবাব-পুত্রী আটত্রিশ বছরের ব্যাকুল অনুসন্ধানের পর তার নিষ্ঠাবান আদর্শ ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে দেখতে পেল, সে এক ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী ও তার গর্ভজাত পুত্র-পৌত্রী নিয়ে দিব্বি আরামে সংসার যাত্রা নির্বাহ করছে। নবাব-পুত্রীর জীবন-বিবৃতির শেষের দিকের কয়েকটি কথা বড়ই মর্মস্পর্শী:—"এতদিন আমি কী মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম! যে ব্রাহ্মণ আমার কিশোরী হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল,

আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস, তাহা সংস্কার মাত্র? আমি জানিতাম তাহা ধর্ম, তাহা অনাদি অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোল বছর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্না-নিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগকম্পিত দেহ-মন-প্রাণের প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরু-হস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে শিরোধার্য করিয়া লইয়াছিলাম? হায় ব্রাহ্মণ, তুমি ত তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ; আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় পাইব?" এ অবশ্য কুসুম-হেমন্তের ঘনীভূত ক্ষণিক অভিজ্ঞতারই এক সূক্ষ্ম ও দীর্ঘায়িত সংস্করণ—সারাজীবনের ধ্যান ও সাধনার এক আকস্মিক হৃদয়-বিদারক পরিণতি।

'বোষ্টমী'তে নবাব-পুত্রীর 'নিবেদনের'ই আর একটি সূক্ষ্মরূপ দেখতে পাই। সেটি করুণ বা নিরাশ রূপ নয়—শান্ত ও স্নিগ্ধ রূপ। বোষ্টমীরও অতীত ইতিহাস আছে। তার স্বামী ছিল সাধু ভক্ত, কিন্তু লোকে ভাবত বোকার হদ্দ। একটি ছেলে হ'য়েছিল, সে যেন 'গোপাল'-ই,—বোষ্টমীকে পরখ করবার জন্যই এসেছিল, অনাদর পেয়ে আপন দেশে ফিরে গেল। স্বামীর এক বাল্যবন্ধু কাশীতে অধ্যয়ন করে দেশে ফিরে এসেছেন। তিনি বোষ্টমীর স্বামীর গুরুঠাকুর, বোষ্টমীরও গুরু-ঠাকুর। এঁর কাছে একাদিক্রমে পাঁচ বছর ধর্মজ্ঞান শিক্ষা করে আর গুরুসেবা করে দিন কাটতে লাগলো। তারপর একদিন স্নান করে ফিরে আসবার সময় পথে গুরুঠাকুরের সঙ্গে দেখা। গুরুঠাকুর সেদিন বোষ্টমীর "মুখের 'পরে দৃষ্টি রাখিয়া বলিলেন, "তোমার দেহখানি সুন্দর!" এই কথায় সেদিন বোষ্টমী স্পষ্ট দেখতে পেল আকাশ বাতাস সব যেন আলুথালু হয়ে গেছে, ঠাকুর-ঘরের ঠাকুরও যেন নেই। সেই দিন থেকে বোষ্টমীর সংসার ধর্ম শেষ হয়ে গেল। স্বামী বললেন "সংসারে থেকেও ত সংসার ত্যাগ করা যায়।" বোষ্টমী বললেন, "তা' হয়ত যায়, কিন্তু আমার মন বুঝবে না।" বোষ্টমী এতদিনে স্পষ্ট অনুভব করতে পেরেছে,—ভালবাসাই নারায়ণ,—তার কাছে একবার এসেছিলেন স্বামী বেশে, আর একবার ছেলের বেশে। এই বোষ্টমীর শেষ জীবনের দুটি কথা ভাববার মত বা মনের ভিতর গ্রহণ করবার মত: প্রথম, "ভগবান যেখানে আমি সেখানেই তাঁকে খুঁজে বেড়াই" অর্থাৎ "ভগবান সর্বব্যাপী এটা একটা কথা (বা মত মাত্র), কিন্তু যেখানে আমি তাঁকে দেখি, সেখানেই তিনি আমার সত্য।" দ্বিতীয়, "দয়াল ঠাকুর মারতে মারতে তবে মার খেদান। শেষ পর্যন্ত যে সইতে পারে সেই বেঁচে যায়।"

এইবার আমার শতকরা পঁয়তাল্লিশের নমুনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আর আপনাদের ধৈর্যেরও নিশ্চয়ই শেষ আছে। তাই এখন কেবল দুই একটা সাধারণ মন্তব্য করেই বক্তব্যের ইতি করছি।—প্রশ্ন হতে পারে, ছোটগল্পে কি কেবল সমাজের খুঁৎই দেখানো হয়েছে, না গুণেরও কিছু পরিচয় এতে আছে? এর জওয়াব এই যে ভালোর সঙ্গে তুলনাতেই মন্দ ধরা পড়ে, সুতরাং মন্দটাকে স্পষ্টায়িত করতে হলে ভালোর সঙ্গে তার সংঘাত সৃষ্টি না করে উপায় নেই। উদাহরণ স্বরূপ, 'উলুখড়ের বিপদে' নির্যাতিত ভট্টাচার্য মশায়; 'শাস্তি'তে ছোটভাইয়ের অভিমানী দৃঢ়চিত্ত বধূ; 'মেঘ ও রৌদ্রে' এম. এ. বি. এল. পাশ চশমা-পরা শান্তশিষ্ট ক্ষীণদৃষ্টি যুবকটি; 'সমস্যাপূরণে' অছিমদ্দী; 'রাসমণির ছেলে'তে আত্মসম্মানী কালীপদর সাহসিক জীবন সংগ্রাম; 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা'য় রামকানাইয়ের সততা; 'সংস্কারে' অনুগত স্বামীটির আত্ম-গ্লানিবোধ; 'প্রায়শ্চিত্তে' মধুরচরিত্র বিন্ধ্যবাসিনীর সম্মানবোধ ও স্বামীর কলঙ্ক-ধারণে ঔদার্য; 'রাজটিকা'য় নবেন্দুর সম্বন্ধীর আত্মশোধনের পরবর্তী নেতৃত্ব; 'ত্যাগ' গল্পে সমুদয় ঘটনা জানবার পর পিতৃ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে হেমন্তের দৃঢ়তা; 'দিদি'তে শশিকলার অনাবিল ভ্রাতৃস্নেহ আর নির্ভীকতা; 'দুরাশা'য় বদ্রাওনের নবাব-পুত্রীর অটল প্রেম ও অসাধারণ ধৈর্য ও আদর্শনিষ্ঠতা; 'বোষ্টমী'র সহজলব্ধ ভগবদ্ভক্তি ও প্রশান্তি—এই সব স্মরণ করলেই দেখা যায় কবি রবীন্দ্রনাথ সমাজ ব্যবস্থার ও সামাজিক আচারের শুধু ছিদ্রই অনুসন্ধান করেন নি, এর ভালো দিক্‌টার প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'দৃষ্টি আকর্ষণ' কথাটা যোগ করার বিশেষ হেতু এই যে,—কি কাব্যে, কি গল্প-উপন্যাস-নাটকাদিতে আর্ট বজায় রেখেও রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে কল্যাণের দিকে, সত্যের দিকে, মানবতার দিকে। এই কারণে তাঁর ছোটগল্প বা অন্য যে কোনও রচনা পাঠ করলেই বিবেচক পাঠকের মন স্বভাবতঃই ভালোর দিকে আকৃষ্ট হয়, মানুষ-জীবজন্তু ও প্রকৃতির রহস্যের কতকটা যেন খুলে যায়; আর তাইতে বহির্বিশ্বের সঙ্গে সহানুভূতিপূর্ণ পরিচয়ের পথ সুগম হয়। আমার মনে হয়, সমস্ত মহৎ রচনারই এ একটা বিশেষ লক্ষণ। এ জন্য রবীন্দ্ররচনা সুলভ করে যত অধিক লোকের হাতে তুলে দেওয়া যাবে, ততই দেশের নৈতিক চরিত্র তাড়াতাড়ি বলিষ্ঠ হয়ে উঠবে। অন্তত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে মহৎ সাহিত্য পাঠের ব্যবস্থা করবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য মনে করি; আর আশা করি, এ ব্যাপারে সকল দেশের গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকেও উৎসাহ পাওয়া যাবে। মোট কথা শুধু মৌখিক প্রশংসা দ্বারা মহৎ প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের পূর্ণতা হয় না—তার জন্য চাই মহৎ ভাবকে হৃদয়ে ধারণ করে মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছবার সজাগ প্রচেষ্টা। সেই হবে প্রতিভার প্রতি শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দান।

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙলার ঐতিহ্য

গোপাল হালদার

কথাটা শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধেই বলা হয় 'myriad-minded.' রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তা কম সত্য নয়। তিনি সহস্রমনাঃ myriad-minded. রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আর একটি কথাও সেরূপ সত্য—তিনি অখণ্ডমনাঃ। সকল রূপকে নিজ নিজ রূপে দেখা তাঁর কারয়িত্রী প্রতিভার ধর্ম। সকল রূপকে তেমনি সমগ্রভাবে দেখাও তাঁর ভাবয়িত্রী প্রতিভার নিয়ম। সহস্রমনাঃ রবীন্দ্রনাথ তাই অখণ্ডমনাঃ রবীন্দ্রনাথও। সেই বিচিত্রকে যে ঐক্যের দৃষ্টিতে তিনি গ্রহণ করতে চেয়েছেন তাকে নানা নামেই চিহ্নিত করা যায়। তবে 'মানুষের ধর্মের' কবির সেই জীবন দর্শনকে মানবতা বলাই শ্রেয়ঃ। অবশ্য একটু বিশেষ অর্থের মানবতা কারণ, "তিনি ভূমা, কিন্তু মানবিক ভূমা।" কথাটায় কোনো অস্পষ্টতা তিনি রাখেন নি—"আমার বুদ্ধি মানববুদ্ধি, আমার হৃদয় মানবহৃদয়, আমার কল্পনা মানবকল্পনা।" এই মানবতা যেমন সমস্তকে অতিক্রম করে প্রকাশিত, তেমনি সমস্তকে অধিকার করেও প্রকাশিত।

গোড়ার এই কথাটা মনে রেখেই আমরা রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশিষ্ট পরিচয় গ্রহণ করতে চাই। যা তাঁর খণ্ড কাল ও দেশকে অতিক্রম করে যায় তা কতটা তাঁর খণ্ড কাল ও দেশকে অধিকার করেও আছে, তা না জান্‌লে রবীন্দ্রপ্রতিভাকে সম্পূর্ণ জানা হয় না।

।

রবীন্দ্রনাথ 'মানব-সত্য' উপলব্ধি করে মানুষের তিনটি জন্মভূমি স্বীকার করেছেন; 'সমস্ত জাতির পৃথিবী', 'সমস্ত মানুষের স্মৃতিলোক', 'সর্বমানবচিত্তের মহাদেশ।' কবির মতে সকল মানুষেরই তাতে জন্মাধিকার। কিন্তু আমরা জানি এই পরম জন্মভূমি জন্মসূত্রে লাভ হয় না, জীবনসূত্রে তা অর্জন করতে হয়। এবং জন্মসূত্রে মানুষ একটি বিশেষ পরিবেশের বিশেষ স্থান, কাল ও চেতনার উত্তরাধিকারই লাভ করে। রবীন্দ্রনাথও একটি বিশেষ ভূখণ্ডে, একটি বিশেষ কালে, এবং বিশেষ এক চেতনার উন্মেষ-মুহূর্তে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রপ্রতিভা এই বাঙালী পরিবেশকে অধিকার করেই বিকশিত হয়েছে, সেখানে প্রতিষ্ঠিত থেকেই মানব-সত্যে সমুত্তীর্ণ হয়েছে, ভূমি থেকে পৌঁছেছে ভূমায়। শুধু তাই নয়। প্রতিভা যেহেতু নবনবোন্মেষশালিনী, তাই রবীন্দ্রপ্রতিভা সেই জন্মক্ষেত্রকেও নতুন উন্মেষের মধ্যে উত্তীর্ণ করে দিয়েছে, তাকে দিয়েছে নতুন ঐতিহ্য, মানবতার নতুন অধিকার।

রবীন্দ্র পটভূমি

নিজের জীবনের কথা বল্‌তে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেও তার পটভূমিকা নির্দেশ করে গিয়েছেন। তিনটি প্রবল প্রয়াসের মধ্যে তাঁর বাল্য ও যৌবন উদ্‌যাপিত। একটি রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন, দ্বিতীয়টি বঙ্কিম-পরিচালিত সাহিত্যিক আয়োজন, আর তৃতীয়টি জাতীয় আন্দোলন—যা, রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, আসলে জাতীয় আত্ম-প্রতিষ্ঠার বহুমুখী উদ্যোগ। সমগ্রভাবে এই তিন প্রায়সকে আমরা সচরাচর একটি কথাতেই ব্যক্ত করে থাকি—বাঙলার তথা ভারতের রেনেসাঁস বা জাগরণ। এ জাগরণের কেন্দ্র তখন বাঙলাদেশ। তার প্রকাশ দেখা দেয় জাতীয় জীবনের তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে—প্রথম সংস্কার-আন্দোলনে, তারপর সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশে, আর শেষে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের প্রাণময় উদ্বোধনে। তিনটির সঙ্গেই যে রবীন্দ্রনাথ জ্ঞানে-কর্মে-ভাবে আজীবন সংযুক্ত ছিলেন তা সুপরিজ্ঞাত, এ কথা তাই অবিস্মরণীয়—রবীন্দ্র-নাথের জন্মভূমি বাঙলাদেশ; বাঙালীর স্মৃতিলোক,—বাঙালী ও ভারতীয় ঐতিহ্যের সমাবেশে যা রচিত; এবং তৃতীয়ত: সর্বমানবচিত্ত-মহাদেশের সেই প্রাঙ্গণটি যেটি বাঙালী চিত্তের অঙ্গন—যেখানে তাঁর জন্মকালে রেনেসাঁসের আলোড়নে আধুনিক যুগধর্ম বা মানবতার আধুনিক চেতনা উন্মেষিত হয়ে উঠেছিল। এই পরিবেশেই রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছেন—উনবিংশ শতকের বাঙলা দেশের পরিবেশে, আর জাতীয় জীবনের সেই ক্ষেত্র থেকেই অতিক্রান্ত হয়েছেন মানব-ভূমায়—ভূমিভ্রষ্ট নয় যে ভূমা।

কথাটা 'বাঙালিয়ানার' বলে বলছি না, বরং বলছি অন্য কারণে। প্রথমত: রবীন্দ্রপ্রতিভা-জিজ্ঞাসার সৎ-পদ্ধতি নির্ণয়ের দাবীতে,—দেশের মাটি জল থেকেই প্রাণরস গ্রহণ করে কী করে তা বিশ্বাভিমুখে আত্মবিস্তার করেছে, তাই হওয়া উচিত সে জিজ্ঞাসার স্বাভাবিক পদ্ধতি। দ্বিতীয়ত: বাঙলা সাহিত্য ও জাতীয়-জীবনে রবীন্দ্র-প্রতিভা যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে তাও অনুধাবন করা উচিত। কবির শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রবীন্দ্রপ্রতিভার জিজ্ঞাসায় 'পাশ্চাত্য প্রভাবের' ও বিশ্বমুখিতার কথা যত বিঘোষিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের বাঙালী ঐতিহ্যের কথা বা বাঙালী ভূমিকার কথা তত আলোচিত হয়েছে কিনা জানি না। অপর দিকে আবেগ-আতিশয্যে আমরা বাঙালীরা তাঁকে 'আমাদের' বলে নিশ্চয়ই গর্ব করেছি; কিন্তু কী অর্থে তা সত্য সম্ভবত তা যথেষ্ট পরিমাণে বুঝে দেখতে চাই নি। পরিমিত পরিসরে সেই কথাটিই আমার আলোচ্য। রবীন্দ্রনাথকে একান্তভাবে বাঙালী বলে সীমাবদ্ধ করাও যেমন আমার বিবেচনায় হাস্যকর, রবীন্দ্রনাথের জন্মক্ষেত্র যে বাঙলা দেশ, তাঁর সৃষ্টিক্ষেত্র বাঙলা

সাহিত্য, তাঁর চিত্তক্ষেত্রও বাঙালী চিত্তের সুমহৎ বিস্তার, এই কথা অস্বীকার করা আমার মতে তেমনি অসম্ভব।

এই শেষ কথাটা অবশ্য পরিষ্কার করে বোঝার অপেক্ষা রাখে। বাঙলা দেশে এমন বাঙালী ভাবুক ও লেখক এক সময়ে যথেষ্ট ছিলেন যাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিক্ষেত্র থেকে এ কথায় আপত্তি তুলতেন। কেউ মনে করতেন, বাঙালী ঐতিহ্য নয়, বিশ্বভাবনার শূন্যলোকেই রবীন্দ্রনাথ বিচরণ করতেন। আবার কেউ মনে করতেন বাঙালী ঐতিহ্য অপেক্ষা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাই রবীন্দ্রপ্রতিভাকে প্রভাবিত করেছে বেশি। 'নারায়ণ'-গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা মনে করতেন, বাঙালী প্রাণের মধ্যে রবীন্দ্রসাহিত্যের শিকড় নেই, পরভুজের মতো তা আলো আহরণ করে বিশ্বভাবনার আকাশ থেকে। পরবর্তী কালে মনস্বী বিপিনচন্দ্র পাল রবীন্দ্রকৃতিতে বাঙালী স্বাধীন চিত্ততার, যুক্তিবাদিতার ও মানব-ধর্মিতার যুগোপযোগী প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন (Golden Book of Tagoreএর লিখিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু প্রায় সেই সময়েই মোহিতলাল মজুমদারের মতো রবীন্দ্রভক্ত সমালোচক রবীন্দ্রসৃষ্টিতে লক্ষ্য করেছেন বাঙলার জীবননিষ্ঠ সাধনার পরিবর্তে ভারতীয় অধ্যাত্মনিষ্ঠ সাধনার আতিশয্য। বিপিনচন্দ্র বাঙলার বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সাধনধারার প্রবল গ্রহণশক্তির ও উদার মানবতার বিকাশ দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথে। মোহিতলাল বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক ধরনের জীবনলীলা-স্বীকৃতিরই অভাব দেখ্‌লেন রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে; পেলেন উপনিষদের ব্রহ্মবাদ ও অধ্যাত্মচেতনার একাকারিতা। বোঝা যায়, মোহিত-লালের চক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্যে বিরোধ মূলগত। বিপিনচন্দ্র নিশ্চয়ই ভিন্ন মতাবলম্বী।

ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ

এমন লোক বোধহয় কমই আছেন যাঁরা মনে করেন বাঙালী সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতিতে মূলগত বিরোধ আছে। বাঙালী সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ ও পারস্পরিক সম্বন্ধ জানা তাই আবশ্যক, আর ঐতিহ্য কথাটার অর্থও পরিষ্কার করে বোঝা প্রয়োজন। কারণ নিশ্চয়ই বাঙালী সংস্কৃতি একটা বিশিষ্ট জিনিস—যদিও সে বৈশিষ্ট্য কী,—নব্যন্যায় না তন্ত্র, না বৈষ্ণব-সাধনা,—কোন্‌টি কোন্‌টি বাঙালী মানসের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ, তা নিয়ে তর্ক চলে। কিন্তু সে বৈশিষ্ট্য কি ভারত সংস্কৃতিতে অগ্রাহ্য?

তাই ভারতীয় সংস্কৃতির স্বরূপ বোঝাও দরকার। কারণ, বাঙালী, হিন্দুস্থানী, তামিল, তেলেগু সকলের দেশকে নিয়ে যেমন ভারতবর্ষ, তেমনি এই বাঙালা, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সকল জাতিকে নিয়েই ভারতীয় 'মহাজাতি।' ভারত সংস্কৃতিরও তাই দুটি রূপ

আছে। একটি সর্বভারতীয় বা Pan-Indian সামান্য (Common) রূপশ্রী—যা বাঙালার সংস্কৃতিরও আপনার, তামিল তেলেগুর, হিন্দুস্থানী-মারাঠীরও আপনার। কারও পর নয়, কারও একারও নয়। এই কেন্দ্রমূলকে আশ্রয় করেই বিভিন্ন জাতির স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছে। আবার সকলের বৈশিষ্ট্যকে তখন সম্মেলিত করে দেখা যায় ভারত-সংস্কৃতির আর এক রূপ—তার সর্বসম্মেলিত বা Composite রূপ। মধ্যযুগের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় সাধনায় যত বৈচিত্র্য দেখা দিক তা সকলই মূল ভারতীয় সম্পদে পরিণত হয়েছে; বাঙালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সকল ভারতবাসীর Pan-Indian heritage, সমান উত্তরাধিকার। বৈদিক সাধনা, পৌরাণিক হিন্দুসাধনা, বৌদ্ধসাধনা জৈন সাধনা প্রভৃতি এরূপই সকলের আপনার। স্থান ও কালভেদে এসব সাধনার যত বৈচিত্র্য বিকশিত হোক তার কোনো রূপই বাঙালীর, হিন্দুস্থানীর, তামিলের কারও পর নয়, কারও একারও নয়। আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের কথা ওঠে মধ্যযুগের চৈতন্য, নানক, কবীর প্রভৃতির সাধনধারা প্রসঙ্গে। বৈষ্ণব, শিখ, প্রভৃতি কোনো কোনো গোষ্ঠীর আছে বিশিষ্ট সাধনধারা এবং ভারতের সর্বত্র তা সমপ্রচলিত নয়। কিন্তু তাও মূল ভারতীয় সাধনারই প্রকাশ, সেই সাধনার অন্তর্ভুক্ত এবং সর্বস্বীকৃত। এরূপ মূল ও বহু বিচিত্র ধারার সমবায়ে ভারতের সম্মেলিত সংস্কৃতি গঠিত। বাঙালী সংস্কৃতিও তাই এই সম্মেলিত (Composite) ভারত-সংস্কৃতির এক ধাপ, আর সেই Pan-Indian heritage বা সর্বভারতীয় উত্তরাধিকারও তাই বাঙলার ঐতিহ্যের এক প্রধান অঙ্গ।

বাঙালী ঐতিহ্যের স্বরূপ

যিনি মনে করেন উপনিষদের অধ্যাত্মবাদ বাঙালী বৈশিষ্ট্যের বিরোধী তিনি যে শুধু ভারতসংস্কৃতির স্বরূপ সম্বন্ধেই অজ্ঞ তা নয়; বাঙালী ঐতিহ্য সম্বন্ধেও ভ্রান্ত। কারণ, নিছক বাঙালী বৈশিষ্ট্য দিয়ে বাঙলার সংস্কৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্য গঠিত নয়—কোনো ঐতিহ্য বা সংস্কৃতিই সেরূপ গঠিত হয় কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ যা বাঙলার সংস্কৃতি বা বাঙলার ঐতিহ্য সমগ্রভাবে তার পরিচয় গ্রহণ করলে দেখি—তার একটি অংশই মাত্র বাঙলার নিজস্ব। বাঙলাদেশের মাটি জলও লোকজীবন তার আশ্রয়, বাঙলার লোক মানসে তার উদ্ভব। বিদেশীয় ভাষার আশ্রয় নিয়ে এ নিজস্ব বাঙালী অংশকে বল্‌তে পারি—Matter of Bengal, খাঁটি বাঙলার সম্পদ। মঙ্গলকাব্যের কথায় ও পদবলীর ভাব-সম্পদে তার উপাদান মিশে আছে, নিশ্চয়। কিন্তু নব্যন্যায়, তন্ত্র বা বৈষ্ণব-সাধনা—তার অবিমিশ্র ফল কিনা সন্দেহ। বরং ছড়া, গান, রূপকথা, উপকথা,

এবং সহজিয়া সাধনার নানা সূক্ষ্ম স্থূল ভাবে ও রূপে বাঙালী লোক-জীবনের ও লোক মানসের সেই দান সঞ্চয়িত হয়ে আছে অনুমান করতে পারি। লোকচিত্তের এই সম্পদ নানা ভাবেই এখন আচ্ছন্ন; কিন্তু তা লুপ্ত হয়েছে কিনা সন্দেহ। যন্ত্রশিল্পের প্রচণ্ডতায় যদি লোক-জীবন উন্মূলিত হয়ে যায় তখনি আসবে তার বিলুপ্তির দিন—তার পূর্বে নয়।

কিন্তু বাঙলার এই নিজস্ব বস্তুকে আচ্ছাদিত করেই বাঙলার সংস্কৃতিতে বহু যুগ থেকে এসে মিশেছে সেই সর্বভারতীয় সম্পদ ও ভারতের সম্মেলিত সংস্কৃতির উপকরণ। বৈদেশিক ভাষায় একে বলতে পারি—বাঙালী ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত Matter of Indian World, ভারতীয় সম্পদ। এ যে কত বিরাট ও বিচিত্র উত্তরাধিকার, এক সময়ে আমরা তা বিস্মৃত হয়েছিলাম। আমরা মনে করতাম—স্মৃতিশাস্ত্র, পুরাণ, জ্যোতিষ, কিম্বা পৌরাণিক হিন্দুসাধনাই বুঝি আমাদের সব। বৈদিক সংস্কৃতিও প্রায় অবজ্ঞাত হয়ে পড়েছিল। এখন আমরা জানি—বৈদিক বা পৌরাণিক হিন্দু সাধনাই শুধু নয়, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি প্রাচীন সাধনা, এমন কি, মধ্যযুগের ভক্তি-আন্দোলনও আমাদের এই ভারতীয় উত্তরাধিকারেরই অন্তর্ভুক্ত।

তৃতীয় যে সম্পদ আমাদের ঐতিহ্যে এসে মিশেছিল এই দুয়ের তুলনায় তা ক্ষীণকায়। তা Matter of Perso Arabic World, পার্শী-আরব্য সংস্কৃতি-প্রবাহ। মুসলমান বাঙালীর ধর্মাচরণে এবং বাঙালীর আইন-আদালতে, পোশাক-পরিচ্ছদে তা কতকটা স্থায়ী হয়েছে। কিন্তু মূলতঃ এই পার্শী-আরব্য-সংস্কৃতি মধ্যযুগেরই চিত্ত-সম্পদ। সেইদিক থেকেও ভারতীয় সংস্কৃতির তুলনায় তার চিত্তসম্পদ কম বিচিত্র, কম ঋদ্ধিমান্, কম মহত্ত্বপূর্ণ। যেটুকু অভিনবত্ব তাতে ছিল তা মধ্যযুগের মরমীয়া সাধনায় ও লোক-সাধনায় গ্রাহ্য হয়েছে। তা ছাড়া, সিন্ধী, পাঞ্জাবী, ও হিন্দুস্থানী জীবনে তা বিস্তারলাভ করবার যতখানি অবকাশ পেয়েছে, বাঙালী জীবনে ততখানি সময় ও সুযোগ সে পায়নি। অষ্টাদশ শতকের উচ্চবর্গের মধ্যে তা প্রসারলাভ করতে না করতেই তার পথ বন্ধ হয়ে গেল ইংরেজের রাজ্যলাভে,—আর মধ্যযুগের অবসানে। এল যুগান্তর ও আধুনিক যুগের দুকুল-প্লাবী জোয়ার।

ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভেই আমাদের বাঙালীজীবন এই সমাগত আধুনিক যুগের ঘাত-প্রতিঘাতে নবায়িত হতে আরম্ভ করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের দান বহন করেই এতদিন পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতি ও বাঙালী ঐতিহ্য রচিত হচ্ছিল। তাকে কেন, সমস্ত ভারত-জীবনকেই চ্যালেঞ্জ করলে ইতিহাসের নূতন শক্তি। এই যুগধর্মকে গ্রহণ করতে না পারার অর্থ মৃত্যু। ইতিহাসের এই শক্তিকে আপনার করে নেবার সাধনা বাঙলা-

দেশে আরম্ভ হল রামমোহন থেকে। আয়ত্ত হল চতুর্থ এক নূতন সম্পদ। এ সম্পদকে সাধারণত বলা হয় Matter of Western World,—পাশ্চাত্ত্য জগতের সম্পদ।

ঐতিহ্যের রূপান্তর

এইখানে ইতিহাস-বোধের একটু প্রয়োজন। তা না থাক্‌লে দু রকমের ভুল আমরা করি। প্রথমতঃ, মনে করি ঐতিহ্য বা সংস্কৃতি বুঝি একটা স্থাণু জিনিস, তার পরিবর্তন নেই। কালে কালে তার পুনরাবর্তন ও অনুবর্তনই চলে; যুগান্তরেও তার রূপান্তর নিষ্প্রয়োজন। কারণ, রূপান্তরের অর্থ তার স্বধর্মচ্যুতি। বলা বাহুল্য, এ কথা সত্য হলে বাঙালী ঐতিহ্য গঠিত হতেই পারত না। কারণ, বাঙালী বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় উত্তরাধিকারকে আপনার করেই এই ঐতিহ্যের জন্ম। মধ্যযুগের পার্শী-আরব্য দানকে গ্রহণ করতে তো তার বাধে নি। যুগান্তরে আধুনিক যুগধর্মই বা তা হলে তার অস্বীকার্য হবে কেন? বরং, বলা যায় 'সচল মনের প্রভাব সজীব মন না নিয়ে থাক্‌তেই পারে না'। এই রূপান্তরের প্রচেষ্টায় তার প্রাণশক্তি পায় নূতন প্রকাশ, অর্জন করে নূতন জীবনচর্যা, সৃষ্টি করে আপনার নূতন ঐতিহ্য।

দ্বিতীয় ভুলটি এই: এই নবাগত চিত্তসম্পদকে অনেকেই মনে করেন 'পাশ্চাত্ত্য' জীবন-ধর্ম, আর তাই 'প্রাচ্য' জীবনাদর্শের তা প্রতিকূল। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা বুঝতে পারি এই জীবনচর্যা একান্তভাবে পাশ্চাত্ত্যের নয়, কোনো দেশ বা মহাদেশ বিশেষের নয়। এ সামাজিক বিবর্তনেরই ধর্ম। সমাজ বিজ্ঞানের পরিভাষার সহায় নিলে একটি কথাতেই তার স্বরূপ নির্দেশ করা যায়—এ হচ্ছে 'বুর্জোয়া বিকাশ' বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার ও বুর্জোয়া জীবন-চর্যার বিকাশ। এই বিকাশেই সাধারণ ভাবে বলা যায় সকল সভ্যতায় 'মধ্যযুগ' শেষ হয়, 'আধুনিক যুগ' আরম্ভ হয়। এই জীবন-চর্যার মূল সত্য হল Rights of Man বা মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিস্বাধীনতার, যুক্তিবাদিতার, রাষ্ট্রজাতিক আত্মপ্রকাশের প্রয়াসের সঙ্গে এই মানবতাবোধই তখন পরিব্যাপ্ত হয় Man's Man for a' that, অবশ্য একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন, এই 'বুর্জোয়া ব্যবস্থা' আজ বাসি মাল। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকে তা সাম্রাজ্য-বাদী পর্বে পৌঁছে। আপনার শ্রেষ্ঠ নীতিসমূহও সে তখন ত্যাগ করে। বিংশ শতাব্দী থেকে উন্নততর সমাজ ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়। আধুনিক যুগধর্মের আশ্রয় এখন সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা, বুর্জোয়া ব্যবস্থা নয়। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষপাদ পর্যন্ত পৃথিবীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের, ন্যায়-নীতির ভাবসম্পদের শ্রেষ্ঠ মুখপাত্র ছিল বুর্জোয়া-তন্ত্র, এই কথাটা মিথ্যা নয়। মধ্যযুগের সমাজের তুলনায় বুর্জোয়া সমাজই উন্নতির বাহন,

তখনকার বুর্জোয়া বিকাশও তাই শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণযোগ্য। এ বিকাশ প্রথম ঘটেছে পাশ্চাত্ত্য দেশে, বিশেষ করে ইংলণ্ডে। তাই ইংরেজ এই চিত্ত-সম্পদের প্রথম অধিকারী, তারপর তার অধিকারী অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতি, প্রাচ্য দেশে তা আসে আরও পরে। তাই আধুনিক যুগধর্মের মধ্যে ইংরেজি বৈশিষ্ট্য ও 'পাশ্চাত্ত্য' বৈশিষ্ট্যের ছাপ যথেষ্ট থাকবারই কথা। কিন্তু 'এহ বাহ্য'। মূল কথাটা এই যে, তা হচ্ছে 'বুর্জোয়া-ধর্ম'। Rights of Man, মানবমহিমা, বুদ্ধির মুক্তি, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, জাতীয় মুক্তির প্রেরণা, এ সবই আধুনিক যুগধর্ম—মধ্যযুগের পাশ্চাত্ত্য ভূমিতে এসব অগোচর ছিল, প্রাচ্যভূমিতেও অগোচর ছিল। তা স্বীকৃত হয়েছে বুর্জোয়া বিকাশে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সমাজে। আর, প্রাচ্য সমাজেও তা গৃহীত হয় যখন প্রাচ্য সমাজ বুর্জোয়া বিকাশে উদ্যোগী হয়—মধ্যযুগ ছাড়িয়ে প্রবেশ করে আধুনিক যুগে। মধ্যযুগ প্রাচ্যেও যা পাশ্চাত্ত্যেও তা। আধুনিক যুগ বা বুর্জোয়া-যুগও প্রাচ্যেও যা পাশ্চাত্ত্যেও তা। প্রভেদ যা, তা প্রকৃতিগত নয়, আধারগত, বাহ্য ও আকারগত। এই আধারগত বৈশিষ্ট্য ধরে সেই যুগধর্মকে 'পাশ্চাত্ত্য গুণ' বলা এখনো সুপ্রচলিত। রবীন্দ্রনাথও 'প্রাচ্য' ও 'পাশ্চাত্ত্য' প্রভৃতি শব্দ এরূপ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। এরূপ 'প্রাচ্য' বলতে বোঝায় মধ্যযুগের প্রাচ্য, বুর্জোয়া-বিকাশের পূর্বেকার প্রাচ্য। অথচ পাশ্চাত্ত্য বলতে বোঝানো হয় আধুনিক যুগের পাশ্চাত্ত্য বুর্জোয়া বিকাশে সমুত্তীর্ণ পাশ্চাত্ত্য। ঐতিহাসিক বুদ্ধিতে এই Matter of the Western Worldকে 'বুর্জোয়া সম্পদ', অন্তত পক্ষে 'আধুনিক যুগধর্ম' (Modernism) বলাই শ্রেয়ঃ; তা হলে অনেক বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকা যায়।

এখন পূর্ব প্রসঙ্গে আসা যাক্। কথাটা এই—রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্বেই আধুনিক যুগ-প্রকৃতি ভারতীয় সমাজে উন্মেষিত হতে আরম্ভ করে। বাঙালাদেশই হয় তার বিকাশ ক্ষেত্র। বাঙালার ঐতিহ্যের তখন মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের কাল। রবীন্দ্রনাথও 'কালান্তর' প্রভৃতি বহু প্রবন্ধে এই যুগ-বিবর্তনের কথা উল্লেখ করেছেন। একই কালে তখন রেনেসাঁসের তাড়নায় ঘটে ঐতিহ্যের নবাবিষ্কার ও যুগ-ধর্মের প্রবর্তনায় ঘটে ঐতিহ্যের নবায়ণ। এই রেনেসাঁসের প্রেরণায় স্বাভাবিক ভাবেই পার্শী-আরবী সম্পদ গৌণ হয়ে যায়, কিন্তু ভারতীয় সম্পদ ও বাঙালার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নবপ্রাণ লাভ করে। আবার, আধুনিক যুগধর্ম বা বুর্জোয়া ভাব-সম্পদের প্রেরণায় বাঙালার ও ভারতের জাতীয় জীবনে রূপান্তর অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ বাঙালারই ঐতিহ্যের শক্তির পরিচায়ক যে, ভারতের মধ্যে এই ভাবসম্পদকে গ্রহণ করার মতো যোগ্যতার প্রমাণ বাঙালীরাই প্রথম দিয়েছে—রামমোহনের ধর্মসংস্কার, বঙ্কিমের সাহিত্যসাধনা, আর বাঙালীর জাতীয় মুক্তির আন্দোলন বাঙালীর সেই চিত্তসম্পদেরই পরিচায়ক।

আর, সেই বাঙালী চিত্তসম্পদের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মধ্যেই আমাদের ঐতিহ্যের সেই উজ্জীবন ও রূপান্তরের সামঞ্জস্যময় প্রকাশ সার্থক হয়েছে—এই কথাটিই বোঝবার মতো, এবং এইটি বুঝেই রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালী ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ আলোচ্য।

রবীন্দ্রসাহিত্য ও বাঙালী জীবন

বাঙালী জীবনের মধ্যে রবীন্দ্র-প্রতিভার মূল প্রোথিত, এ সত্য প্রমাণ করবার প্রয়োজন হয় তাঁদের কাছে বাঙালী ঐতিহ্য সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা অস্পষ্ট,—যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়তা বুঝি তাঁর বাঙালীত্বের পরিপন্থী, কিংবা বাঙালী ঐতিহ্য বুঝি মধ্যযুগের ধারাতেই আবর্তিত হবে, আধুনিক যুগের নিয়মে রূপায়িত হবার মতো যোগ্যতা বা আবশ্যকতা থাকৃতে নেই। এরূপ ভুল ধারণা না থাকৃলে রবীন্দ্র-প্রতিভাকে বাঙালী ঐতিহ্যেরই সুমহৎ প্রকাশ বলে গণ্য করা স্বাভাবিক।

বাঙালী জীবনের মধ্যে যে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত, এ কথা প্রমাণ করা নিষ্প্রয়োজন। 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল' থেকে প্রাণরস গ্রহণ করতে না পারলে তিনি সত্য হতে পারতেন না। তাঁর নিসর্গ-কবিতায় বাঙালার প্রকৃতি যদি রূপলাভ না করত তা হলেই আশ্চর্য হবার কথা। রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। হয়তো বা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ভিন্ন তাঁর তুলনা নেই। তাঁর নিসর্গ-দৃষ্টিতে যে অধ্যাত্মানুভূতি দেখা যায় তা যতটা ওয়ার্ডস্ওয়ার্থীয় তদপেক্ষাও ভারতীয় চিত্ত-সম্পদেরই সুপরিচিত লক্ষণ—যে ভারতীয় সম্পদে বাঙালীরও উত্তরাধিকার। প্রকৃতির শান্ত গম্ভীর উজ্জ্বল মধুর সকল রূপ সম্বন্ধেই তিনি সচেতন। ঋতুরঙ্গের প্রতি আবর্তনে তিনি সংবেদনশীল। কিন্তু, বাঙালার প্রকৃতি, বিশেষ করে গঙ্গা-পদ্মা-বিধৌত এই শ্যামল বাঙালা দেশ এবং কতকাংশে লালমাটির এই রাঢ়ভূমি, তাঁর কবিতায়, গানে, গল্পে, বর্ণনায় পূর্বাপর আত্মবিস্তার করে আছে, তা স্থূল দৃষ্টিতেও প্রত্যক্ষ। কবি-চৈতন্যে যে কত সূক্ষ্মভাবে এই বাঙালার প্রকৃতির রূপ মিশে আছে, তা অনুভব করা যায় তাঁর কবিতার রূপকল্পের বিশ্লেষণে, কিম্বা তাঁর বর্ষার কবিতার কথা ও সুরে, শরৎ-বর্ণনায় শুভ্র আলোক-অঞ্জলিতে। বাঙালী কবি ভিন্ন কার কল্পনায় সম্ভব হত সোনার তরী? সে কবিতার সমস্ত পরিবেশটিই বাঙালার, বিষণ্ণ বঞ্চিত বাঙালী কৃষক-জীবনই সেই রূপকের আধার। এ কথা কি মিথ্যা যে, কৃষ্ণকলি তাকেই কবি বলেছেন —ময়নাপাড়ার মাঠে দেখেছিলেন যার কালো হরিণ চোখ—সেই শ্যামলা বাঙালা দেশ? এরূপই বলা যায়, বাঙালী চিত্তের গীতিপ্রবণতার ঐতিহ্য মিশে আছে রবীন্দ্র-নাথের কাব্যে, গানে, এমন-কি, ছোটগল্পে। যে ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা

গীতি-কবিতার অপেক্ষা কম নয়, তা যেন বাঙালার মাটি-জল-আকাশে-ঘেরা জীবন-রঙ্গের শ্রেষ্ঠ কাব্য, প্রকৃতির ও মানুষের সমন্বিত পরিচয়। এই কারণেই কি বিদেশীয়দের নিকট রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সরস মাধুর্য সহজগ্রাহ্য হয় না?

চিত্তসম্পদের বিচারে, বাঙালার বৈষ্ণব লীলারসের নতুন পরিবেশন যে রবীন্দ্র-কাব্যে ও গানে ঘটেছে, এ কথা বহু প্রচলিত। কথাটা সত্যই উল্লেখযোগ্য। কারণ, বৈষ্ণব রস-সম্পদে রামমোহন ও বঙ্কিম প্রভৃতি বাঙালার রেনেসাঁসের পুরোধারা বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। সম্ভবত মহর্ষিও তাতে স্বস্তিবোধ করতেন না। তাই রবীন্দ্রচেতনায় রাগানুগা ভক্তি ও লীলাকীর্তনের পদাবলীর এই আকর্ষণ নিশ্চয়ই স্মরণীয় জিনিস। এক অর্থে তিনি বঙ্কিমের অপেক্ষাও বেশি বাঙালী। কিন্তু সেই সঙ্গে লক্ষণীয়—রবীন্দ্রনাথ 'উজ্জ্বলনীলমণির' নির্দেশিত পথে পদরচনা করেন নি। রস-আস্বাদনও করেন নি। সেই প্রেমোন্মত্ততা ও রসবিহ্বলতা 'চতুরঙ্গে'র কবির কাম্য ছিল না। কাব্যরসিক, জীবনরসিক হিসাবেই তিনি প্রধানতঃ বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তেমনি কি শিব-উমা ও নটরাজ শিবের কল্পনাও তাঁর কবিচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে নি? আসলে তত্ত্বের দিক থেকে সম্ভবত শ্রীচৈতন্য অপেক্ষা কবীরই ছিলেন তাঁর নিকটতর। আসলে বাঙালার বৈষ্ণব প্রেরণা অপেক্ষা বাঙালার বাউলের প্রেরণাতেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করতেন। এই কথা এ-প্রসঙ্গেই উপলব্ধি করা উচিত যে, নব্যন্যায়, তন্ত্রসাধনা, বৈষ্ণব-সাধনা অপেক্ষাও লোকচিত্তের গভীরেই খাঁটি বাঙালার ঐতিহ্য নিহিত আছে। এই লোকচিত্তের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় আত্মীয়তা ছিল। বাঙালার ছড়া, গান, রূপকথা, এ-সবের উদ্ধার ও প্রথম সংগ্রহে রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী হন। তেমনি শিল্পসম্মত পদ্ধতিতে আপন সৃষ্টির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সেই ছড়া, গান, সুর এবং লোক-সংস্কৃতির ভাবলোক ও রূপলোককে আত্মসাৎ করতে ছাড়েন নি। একটু অন্তর্দৃষ্টি থাকলে, রবীন্দ্রচেতনায় বাঙালার লোক-সংস্কৃতির রেশ যে বহুভাবে মিশে আছে তা অনুভব করা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অপেক্ষা তা কম গভীর নয়।

অবশ্য শুধু বাঙালার মাটি, বাঙালার জল ও বাঙালার স্বকীয় উদ্ভাবনা নিয়েই বাঙলার মানুষের চিত্তদেশ গড়ে ওঠে নি। বাঙালীর স্মৃতিলোক ভারতীয় উত্তরাধি-কারেও পরিপুষ্ট—প্রাচীন ও মধ্যযুগের সকল ভারতীয় উত্তরাধিকারই তার আপনার। আর, রবীন্দ্রনাথ এই কথাই সুস্পষ্ট করে তুলেছেন—এই ভারতীয় চিত্তসম্পদের শ্রেষ্ঠ প্রকাশও বাঙালী ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ও ভারতমানস

ভারতীয় সাধনার যেরূপ সর্বাঙ্গীণ পরিচয় আমরা রবীন্দ্রসাধনায় লাভ করেছি তা মহাভারত ছাড়া আর কোথাও পাই না। বৈদিক কাল থেকে পৌরাণিক কালের সূচনা পর্যন্ত সুদীর্ঘ ও বিচিত্র ভারতজীবন মহাভারত বিধৃত করে আছে। পৃথিবীতে এমন মহৎ গ্রন্থ আর নেই। কিন্তু ভারতজীবন ও ভারতসাধনা সে যুগের পরে স্তব্ধ হয়ে থাকে নি। বহু বিচিত্র বৌদ্ধসাধনায় ও সুদীর্ঘকালীন জৈনসাধনায়ও ভারতসাধনা পরিপুষ্ট হয়েছে। গুপ্তযুগের হিন্দু পুনরুজ্জীবনে কালিদাস প্রভৃতির কাব্যে ও তৎকালীন শিল্পে তার নূতন অভ্যুদয় ঘটেছে। তারও পরে ইস্‌লামীয় ঘাত-প্রতিঘাতে নানা সাধুসন্তের সাধনায় তা বিকশিত হয়ে উঠছে। ভারতীয় সাধনার এই বৈচিত্র্যময় ঐক্যের অনুধাবন যদি কোনো একটি প্রতিভার দানে করতে হয় তবে একমাত্র রবীন্দ্র-প্রতিভাতেই তা সম্ভব। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্র-সাহিত্য শুধু উপনিষদেরই বাণীতে প্রবুদ্ধ, তাঁরা বিস্মৃত হন—মহাভারতের সত্যই কি তিনি কম সঞ্জীবিত করেছেন, শিব মহেশ্বর বা নটরাজের ধারণাকেই কি তিনি কম স্বীকৃতি দিয়েছেন? তার পর রবীন্দ্র-প্রতিভা বৌদ্ধ-সাধনার গভীর সত্যকেও আমাদের সাহিত্যে পুনরুজ্জীবিত করেছে। কালিদাসের শিল্প সুষমা ও জীবনাদর্শও তা আপন সৃষ্টিতে সঞ্চারিত করেছে। মধ্যযুগের সাধক সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধনাকেও তা অপূর্ব রস-নিঃশেষে জীবন্ত করে তুলেছে। মহাভারতের পরে ভারতীয় চিত্তের কাব্য-সুষমাময় ও সর্বাঙ্গীণ প্রকাশ এই রবীন্দ্র সাহিত্যেই সম্ভব হয়েছে। আমরা গৌরব করতে পারি—বাঙালা ভাষার আধারেই ভারতের এই যুগে-যুগে-প্রকাশমান বাণী প্রথম সার্থক রূপলাভ করেছে।

ভারতমানসের এই প্রকাশ যে বাঙালী ঐতিহ্যের প্রকাশ, এ কথা আমরা পূর্বেই অনুধাবন করেছি। এই প্রসঙ্গে এখন শুধু বোঝা প্রয়োজন—এ শুধু প্রকাশ নয়, বিকাশও। রামমোহন থেকেই আমাদের দেশে এই ভারতসাধনার পুনরাবিষ্কার আরম্ভ হয়—অবশ্য তাতে আমাদের পথপ্রদর্শন করেন এশিয়াটিক সোসাইটির মানববিদ্যার পণ্ডিতগণ। মধ্যযুগের গতানুগতিক অভ্যাসের মধ্যে, ন্যায়-স্মৃতি-জ্যোতিষের বিচার-বিতর্কের মধ্যে ভারতের সেই চিত্তসম্পদের কতটুকু ছিল জীবিত? মধ্যযুগের বাঙালী ঐতিহ্যে কতটুকু সন্ধান পেতাম আমরা বেদ ও উপনিষদের, সংস্কৃত-ভাষার বিচিত্র ঐশ্বর্যের, বৌদ্ধ সাধনার বা জৈন সাধনার? আধুনিক যুগে প্রবেশের ফলেই আমরা জানলাম এই মহান্ ভারতবর্ষকে, তার মহৎ সভ্যতাকে, আমাদের বিস্মৃতপ্রায় এই উত্তরাধিকারকে। বেদ ও উপনিষদের সঙ্গে নূতন করে পরিচয় হল, বুদ্ধ ও অশোক পুনরাবিষ্কৃত হলেন, এমন কি, সংস্কৃতেরও মহান্ সম্পদের পুনরুদ্ধার তখন থেকে সম্ভব হল। অবশ্য এ

শুধু পুনরুদ্ধার নয়, রেনেসাঁসের এই দানে তখন বাঙালার ঐতিহ্য নবায়িত হতে আরম্ভ করে। ভারত-সংস্কৃতির এই আবিষ্কারের অর্থ এই উত্তরাধিকারের নবমূল্যায়ন,—আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক চক্ষে, মানবতার নূতন আলোকে। সেই আলোকেই বাঙালার ঐতিহ্যের তখন থেকে রূপায়ণ আরম্ভ হয়,—রামমোহনের মুক্ত-বুদ্ধিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টিতে ও জাতীয় জীবনরচনার প্রয়াসে, এবং শেষে জাতীয় আন্দোলনে জাতীয় জীবনের বহুমুখী রূপায়ণের সাধনায়। এই তিন ধারারই যখন পরিণতি ঘটল রবীন্দ্র-কৃতিতে, তখন মধ্যযুগের বাঙালী ঐতিহ্য রূপায়িত হতে হতে লাভ করলে রূপান্তর। পূর্বেকার বাঙালা ঐতিহ্যের সঙ্গে বাঙালার এই নবায়িত ঐতিহ্যের যে যোগ নেই তা নয়। সেই লোক-সংস্কৃতির উপকরণ, সেই সর্বভারতীয় উত্তরাধিকার, এমন কি পার্শী-আরব্য সঞ্চয়, কিছুই অচল হয় নি। কিন্তু সবই রামমোহনের পর থেকে নবায়িত হয়ে স্বীকৃত হয়, আধুনিক যুগের যুক্তি ও শিল্পাদর্শ, জীবনবোধ ও মানবতাবোধের পরীক্ষায় যা উত্তীর্ণ তা'ই গ্রাহ্য। মধ্যযুগের বাঙালা ঐতিহ্যের সঙ্গে তাই এই বাঙালী ঐতিহ্যের পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয়, প্রকৃতিগত।

রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালা সাহিত্যের পরে বঙ্কিমের দানকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ এই পার্থক্যই অনুভব করেছিলেন—"কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য!" এরূপ বিস্ময়ই আমাদের আবার অভিভূত করে যখন শতবর্ষপূর্বেকার বাঙালা সাহিত্যের সূচনাকে আজকের বাঙালাসাহিত্যের সম্পদের সঙ্গে তুলনা করি। মধুসূদন-বঙ্কিমে যার সূচনা রবীন্দ্রনাথে তা লাভ করেছে পরিণত শ্রী ও শক্তি। বাঙালা সাহিত্যের আজও অভাব অনেক দিকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দানের পরিমাপ এই কথাতেই করা যায় যে—বাঙালা সাহিত্যে আজ সৃষ্টিসম্পদে ও ভাব-সম্পদে যথার্থ আধুনিক সাহিত্য, বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে তার স্থান এখন স্বীকৃত। সহস্রমনাঃ রবীন্দ্রনাথ মানবচিত্তের সমস্ত প্রকাশেই যেমন তাকে সামর্থ্য দান করেছেন, তেমনি একটি অখণ্ড-বোধেও তাকে দীক্ষিত করে গিয়েছেন। সেই বোধ মানবতাবোধ—বাঙালা সাহিত্যের এইটিই বিশিষ্ট রবীন্দ্র-ঐতিহ্য।

আমাদের জাতীয় জীবনের দিক থেকেও আবার এই কথাই বলা যায়। আমাদের জাতীয়তায় রবীন্দ্রনাথের দান কর্মে চিন্তায় ও রস-সম্পদে অসামান্য। যেমন, 'স্বদেশী সমাজে' 'আত্মশক্তি'র নীতিতে তা সুস্থির ভিত্তিভূমির সন্ধান দিয়েছে। বিচিত্রের মধ্যে

ঐক্যের প্রকাশ উদ্‌ঘাটন করে তা মহাজাতি-গঠনের পথ নির্দেশ করেছে। কিন্তু জাতীয়তার সাময়িক প্রয়োজন ছাড়িয়েও রবীন্দ্রনাথ জাতীয় জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে জানতেন বলেই তিনি আমাদের জাতীয়তাকে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত থাকবার শিক্ষাও দিয়ে গিয়েছেন। সমাজ-সংগঠনের বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁর অভিপ্রেত ছিল বিজ্ঞানের কল্যাণকর প্রয়োগের দ্বারা ধনসৃষ্টি, আর সামবায়িক নীতিতে সমাজ-বিন্যাসের দ্বারা সামূহিক কল্যাণ—সম্ভবত Co-operative Commonwealth রূপে জাতীয় জীবনের বিকাশ। কিন্তু এই সমস্ত সামাজিক রাষ্ট্রিক নীতি পদ্ধতি ও কৌশল মোটেই আসল কথা নয়, তা শুধু বিশেষ আদর্শ উপলব্ধির উপায়। সেই বিশেষ আদর্শ 'সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব'। "রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভূমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষবর্জিত হয়ে থাকে।" কিন্তু "স্বজাতির মধ্য দিয়াই সর্বজাতিকে ও সর্বজাতির মধ্য দিয়াই স্বজাতিকে সত্যরূপে পাওয়াতেই" জাতীয়তার সার্থকতা। "ন্যাশনালিজম"-এর বুর্জোয়া সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জাতীয় জীবনকে এই বিশ্বমানবতার আদর্শে উদ্‌বুদ্ধ হবার শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দান সেই 'ভারততীর্থে'র আদর্শ, এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে বিশ্বমানবের মিলন-ব্রত উদ্‌যাপনের দায়িত্ব।

এই মানবতার ঐতিহ্যই রবীন্দ্র-ঐতিহ্য। রবীন্দ্র-উত্তরাধিকার লাভ করেছি বলেই এই রবীন্দ্র-ঐতিহ্যও আমাদের বাঙালীর ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্য আমাদের বাঙালী চিত্তক্ষেত্রে শুধু আধুনিক কালের চিত্তসম্পদকে গ্রহণ করতেই প্রস্তুত হয় নি, আগামী কালের চিত্ত-সম্পদ-সৃষ্টিরও প্রেরণা লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালার ঐতিহ্যকে রূপায়িত করেন নি তাতে নতুন ঐতিহ্যও সৃষ্টি করে গিয়েছেন। তাঁর প্রতিভার দানে আমাদের অতীতকালীন ঐতিহ্য বর্তমানে পৌঁছে আগামী কালের দিকে উন্মোচিত হয়ে চলেছে। তাই আমাদের আজকের সংস্কৃতি এই বাঙালা দেশ, বাঙালী জীবন ও বাঙালার চিত্ত-ভূমিতে জন্মেও এই সত্য উপলব্ধি করবার দায়িত্বও লাভ করেছে—"মানুষ জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে, জন্মগ্রহণ করে নিখিল ইতিহাসে।···তার তৃতীয় বাসস্থান মানবচিত্তের মহাদেশ॥"

চির-অশান্ত

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সৃষ্টির মূলে শান্তি কার্যকরী কি অশান্তি—ঠিক করে বলা শক্ত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় এটা সৃষ্টির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কিন্তু একটু বিচার করে দেখলে দেখা যায় ঠিক তা নয়। কতকগুলি সৃষ্টি আছে যার উদ্ভব Revelation বা দিব্যানুভূতি থেকে। এগুলি নিতান্তই দুর্লভ, নিতান্তই সেইরকম উচ্চকোটি মনীষার আয়ত্ত, এবং আকস্মিক। এই দৈবতা আর আকস্মিকতার জন্য মনে হয়, এগুলির মূল শুদ্ধ শান্তি এবং আনন্দে। কিন্তু আবার একটু ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যায়, ব্যাপারটুকুকে যেমন আকস্মিক এবং unrelated বা বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয়েছে আসলে তা নয়। এর পেছনেও একটা প্রচেষ্টা আছে, তপস্যা আছে; অশান্তি আছে। কবেকার সেই অশান্তি মনের একেবারে মগ্নচৈতন্যে প্রবেশ করে গিয়ে তার কাজ করে গেছে, তারই ফলস্বরূপ এই আবির্ভূতি। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে সব Revelation দৈবও নয়।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, মগ্ন চৈতন্যের এই খেলা আমরা দৈনন্দিন জীবনে নিত্যই দেখতে পাই। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারা যাবে এর যথার্থতা। স্মৃতির ব্যাপারে আমরা দেখি কোন একটা কথা মনে করবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সফল হতে না পেরে ছেড়ে দিলাম। প্রচেষ্টার ব্যাপারটাও হয়তো ভুলে গেছি। তারপর এক ঘণ্টা হোক, দু'ঘণ্টা হোক; একদিন হোক, দু'দিন হোক; হঠাৎ দেখি নিতান্তই অতর্কিত-ভাবে কথাটা ধরা দিয়েছে। ছোট ছোট ব্যাপারে মগ্ন চৈতন্যের এইসব যেমন ছোট ছোট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তেমনি বড় বড় ব্যাপারে স্থায়ী প্রভাবও আছে, মনীষার ক্ষেত্রে যার দ্বারা যত বৃহৎ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

অশান্তির কথায় ফিরে আসা যাক। সৃষ্টিমাত্রই প্রচেষ্টা বা তপস্যা-প্রসূত। প্রচেষ্টা, তপস্যা, অনুসন্ধান—এ সব কিছুর মধ্যেই অশান্তির বীজ নিহিত রয়েছে, সুতরাং বোধহয় ধরে নেওয়া যায় যে, সৃষ্টিমাত্রেরই মূলে রয়েছে অশান্তি। অশান্তি থেকে শান্তির দিকে মনের যে অভিযাত্রা তাই হচ্ছে সৃষ্টি। সৃষ্টি যখন পূর্ণ, সে তখন প্রকাশ-বেদনার শীর্ষে প্রস্ফুট পুষ্পটি বা পুষ্প-স্তবকটি।

কথাগুলো নূতন নয়, তবু রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে যে-কারণে মনে রাখা প্রয়োজন তা হচ্ছে কবির অপরূপ দৈহিক শ্রী। উন্নত, সৌম্যললাট, ঋষিকল্প শ্মশ্রুল মুখমণ্ডল, সর্বোপরি দীর্ঘায়ত স্বপ্নালু নয়ন—মনে হয় না এ মানুষের মধ্যে অশান্তির

তিলার্ধ কোথাও কিছু আছে, বা কখনও ছিল। অথচ ছিল নিতান্ত বাল্য-কৈশোরের যুগ থেকেই, জীবনের শেষ পর্যন্ত।

এই অশান্তিকে আমরা দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে দেখতে পারি। এক শ্রেণীতে পড়ে যা অবস্থাগত (অদৃষ্টগতও বলা যায়), অন্য শ্রেণীতে পড়ে যা তাঁর প্রকৃতিগত। অবশ্য এ'কথা মেনে নিতেই হয় যে অবস্থা আর প্রকৃতির মধ্যে এত সূক্ষ্ম যোগাযোগ থেকে যায়—অবস্থার সংঘটন আর তার ওপর মনের প্রতিক্রিয়া, এবং মনের প্রতিক্রিয়ায় অবস্থার রূপান্তর—এর মধ্যে এমন নিবিড় এবং নিগূঢ় সম্পর্ক থাকে যে, প্রভেদের সীমাটা ঠিক লাইন কেটে নির্ধারিত করা যায় না। তবু, একটু বিশ্লেষণ করে দেখার সুবিধার জন্য আমরা এইরকম একটু বিচ্ছিন্ন করে বিচার করতে পারি।

অবস্থার কথা ধরলে বাল্য থেকেই রবীন্দ্রনাথকে একদিক দিয়ে যে দুর্ভোগের মধ্যে কাটাতে হয়েছে খুব কম বালককেই সে ধরণের দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। কবির বাল্যের এই অবস্থাটি বহু আলোচিত হলেও তাঁরই নিজের ভাষায় এখানে বর্ণিত করবার লোভ সংবরণ করা গেল না :

"আমাদের এক চাকর ছিল, তাহার নাম শ্যাম।······সে আমাকে ঘরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসাইয়া আমার চারিদিকে খড়ি দিয়া গণ্ডি কাটিয়া দিত। গম্ভীর মুখ করিয়া তর্জনী তুলিয়া বলিয়া যাইত, গণ্ডির বাহিরে গেলেই বিষম বিপদ। বিপদটা আধিভৌতিক কি আধিদৈবিক তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতাম না, কিন্তু মনে বড়ো একটা আশঙ্কা হইত।······

জানালার নীচেই একটি ঘাটবাঁধানো পুকুর ছিল। তাহার পূর্বধারের প্রাচীরের গায়ে প্রকাণ্ড একটা চীনা বট—দক্ষিণধারে নারিকেলশ্রেণী। গণ্ডিবন্ধনের বন্দী আমি জানালার খড়খড়ি খুলিয়া প্রায় সমস্তদিন সেই পুকুরটাকে একখানা ছবির বহির মতো দেখিয়া দেখিয়া কাটাইয়া দিতাম।" ইত্যাদি

একটা জ্যা-লগ্ন তীরকে যত বেশি পেছনে টানা যায় ততই বেড়ে যায় তার গতির বেগ এবং সীমা। এই গণ্ডিবদ্ধ জীবনের সঙ্গে বাইরের প্রকৃতিকে খণ্ডিত-দৃষ্টিতে অসম্পূর্ণ দেখার যে অশান্তি তা বাইরেটাকে পূর্ণভাবে দেখবার, নিজের সৃষ্টিতে তাকে পূর্ণভাবে ধরবার যে প্রেরণা যুগিয়েছিল তা তাঁর সমস্ত কর্ম এবং সাহিত্য-জীবনকে প্রভাবিত করেছে। তাঁর মত জগৎ ঘুরে দু'চোখ ভরে প্রকৃতিকে দেখেছেই বা কে, এমনভাবে নিজের সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিতই বা করতে পেরেছে ক'জন ?

ধর্ম-জীবনেও আছে। তাই এইদিক দিয়ে তাঁর অশান্ত মন সত্যের অম্লান রূপ দেখবার জন্যে ব্যাকুল—যে ব্যাকুলতা তাঁর শত-শত গীত, শত-শত কবিতায় এমন

রূপ নিয়ে ফুটে উঠেছে, এমন পূর্ণ বৈভবে তাঁর সাহিত্য-কৃতি অমৃতলোকে উত্তরিত করে দিয়েছে।

ধর্মগত তাঁর অশান্তির গোড়ার কথাটা তাঁরই অনবদ্য ভাষায় শুনি :

"তখনকার কালের য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম, মিল, কোঁতের আধিপত্য। য়ুরোপে এই মিলের যুগ ইতিহাসের একটি স্বাভাবিক পর্যায়।...কিন্তু...ইহাকে আমরা শুদ্ধমাত্র একটি মানসিক বিদ্রোহের উত্তেজনা রূপেই ব্যবহার করিয়াছি।...অল্পকালের জন্য আমাদের একজন মাষ্টার ছিলেন, তাঁহার এই আমোদ ছিল।...আমি প্রাণপণে তাঁহার সঙ্গে লড়াই করিতাম, কিন্তু আমি নিতান্ত অসমকক্ষ প্রতিপক্ষ ছিলাম বলিয়া আমাকে প্রায়ই বড় দুঃখ পাইতে হইত। এক এক দিন এত রাগ হইত যে কাঁদিতে ইচ্ছা করিত।"—ইত্যাদি

রাজনীতির ক্ষেত্রে কবিমনের অশান্তি আরও বিরাটতর পরিধি নিয়ে। এও সেই গণ্ডিবদ্ধ বাল্যজীবনেরই সত্য-তর রূপ তো। একটা বিরাট জাতির পরাধীনতার গ্লানি আমরণ তাঁর মর্মে মর্মে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তাঁর লেখনীকে দিয়েছে বীরের শৌর্য। সে শৌর্য কী মহিম-ময়, জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতার পর নাইট উপাধি বর্জন উপলক্ষ্যে রাজ-প্রতিনিধিকে লেখা তাঁর পত্রে তা নিজ সাক্ষ্য বহন করছে।

এই বিরাট পুরুষের দীর্ঘায়ু জীবনের কী যে বিরাট বিচিত্র অভিজ্ঞতা, সংখ্যা ধরে তার তালিকা দেওয়া এই ক্ষুদ্র নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয় ; তাঁর সংবেদনশীল মনের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত—সে-সব নিয়ে তাঁর যা সৃষ্টি তার হিসাব দেওয়াও সম্ভব নয় এখানে। আমি শুধু বাইরের অবস্থা বা পরিস্থিতি-সংঘাতে তাঁর অশান্ত চিত্ত, তথ্যের অন্বেষণে, সমাধানের অন্বেষণে, সত্যের অন্বেষণে এক কথায় শান্তির অন্বেষণে তাঁর কর্ম আর সাহিত্য-জীবনে কী বিচিত্র সৃষ্টি-সম্পদ রেখে গেছে তারই একটা দিগ্‌দর্শন দিলাম।

এরপর কবির অন্তঃপ্রকৃতির অশান্তির কথায় আসা যায়। পূর্বেই বলেছি একে একেবারে বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে না, কেননা বাহ্যিক পরিস্থিতি আর তার সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধের যে প্রতিক্রিয়া—এ দুটোকে সামগ্রিকভাবে নিয়েই মানুষের ব্যক্তিসত্তা। তবুও কী একটা নিগূঢ় অশান্তি যেন সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে কবিকে মাত্র কাব্য-সৃষ্টিতেই মন ভরতে দেয়নি, আরব-বেদুয়িন হওয়ার উন্মাদ স্বপ্ন দেখিয়েছে, মাঝে মাঝে নিজের জীবনের মিশনে অনীহা আর অনাস্থা এনে এক অলভ্য মরীচিকার পেছনে ছুটিয়েছে তাঁর মনকে।

আমরা দেখেছি এক বিরাট স্বয়ং-সম্পূর্ণ প্রতিভা। কিন্তু সত্যই সেই প্রতিভা কি শান্তি পেয়েছিল, যে শান্তি নিহিত ছিল তার সৃষ্টির পূর্ণতায় ?

রবীন্দ্রনাথের ছবি

বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়

অনেকেই একথা ভেবে বিস্মিত হন—ছবি আঁকা কখনো না শিখে রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্বে এত অসংখ্য ছবি আঁকলেন কী করে। তাঁর চিত্রাঙ্কনের ইতিবৃত্ত এদিক দিয়ে কিন্তু মোটেই রহস্যজনক নয়।

যত্নসহকারে বিচার করলেই বোঝা যাবে 'অক্ষরকে রূপ দেওয়া' আর ছবি আঁকার কৌশলে মিল আছে। ইংরিজি, বাংলা, হিন্দী, উর্দুতে এমন অনেক অক্ষর আছে রেখাবোধ ব্যতীত যা ভাল করে লেখা সম্ভব নয়।

অক্ষর লেখা আর ছবি আঁকার মধ্যে যে অনেক মিল রয়েছে প্রাচ্যবাসীদের কাছে তা বহুকাল আগেই ধরা পড়েছিল। তাই চীন ও জাপানে লেখনী-শিল্প চিত্রকলার সমান প্রাধান্য পেয়েছে। সেই কারণেই এ দুটি দেশে ক্যালিগ্রাফির আদর্শ ও উৎকর্ষ নিরূপিত হয় চিত্রকলা বিচারের মানদণ্ড দিয়ে। তার মানে, কলমের সাহায্যে যিনি নানা অক্ষরকে যথার্থ রূপ দিতে সক্ষম, কিছু চেষ্টা করলে পরই তিনি কোনো কোনো বস্তুর রূপও নকল করতে পারেন।

এখন প্রশ্ন হল, 'কবিরা কি প্রায়ই ছবি এঁকে থাকেন?' এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে অদ্বিতীয় বলা যাবে না। ইয়োরোপের অনেক সাহিত্যিকই সাহিত্য রচনার অবসরে ছবি এঁকেছেন। ভিক্তর উগো, টেনিসন, স্ট্রিণ্ডবার্গ, থ্যাকারে প্রভৃতি আরো অনেকে হলেন চিত্রাঙ্কণক্ষম সাহিত্যিকের নিদর্শন—অবশ্য ছবি আঁকায় তাঁদের উৎকর্ষ তাঁদের সাহিত্য প্রতিভার মতো অপূর্ব নয়। কিন্তু সাহিত্য ও চিত্রকলায় সমানকৃতী পুরুষেরও অভাব নেই। ইংরেজ কবি ব্লেক হলেন এই অনন্য সমন্বয়ের উদাহরণ। তাঁর অমর প্রতিভা সাহিত্য ও চিত্রকলার দুই রাজ্যেই সমান স্বীকৃতি পেয়েছে।

চীনাসভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য হল, সাহিত্য ও চিত্র শিল্পে তা এমন একটি অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ গড়ে তুলেছে যে এই দুই রাজ্যেই কৃতী প্রতিভার সংখ্যা সেখানে ইয়োরোপের তুলনায় বেশি। আমাদের দেশে অবনীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে চিত্রকর ও লেখক হিসেবে আমাদের হৃদয় জয় করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রকৃত বিস্ময়কর ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল কাব্যজগৎ থেকে চিত্রজগতে তাঁর যাত্রার ইতিহাস। চিত্রকলার রাজ্যে রবীন্দ্রনাথের যে যাত্রাপথ তার তুলনা আর কোথাও পাই নি।

রবীন্দ্রচিত্রকলার আলোচনায় যাঁরা উৎসুক তাঁদের পক্ষে কয়েকটি তথ্য বিশেষ-ভাবেই স্মরণীয়।

প্রথমত একথা স্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার বাসনা বা তাঁর চিত্রকলার মূলগত তাগিদ কোনো শিল্পানুভূতি প্রকাশের উদ্দীপনা থেকে উৎসারিত নয়। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তাঁর ছবিতে কোনো বস্তুর রূপের অনুকৃতি বা তার অনুসরণের চেষ্টা দেখা যায় নি। রবীন্দ্র-চিত্রকলায় প্রাথমিক রূপ গঠিত শুধুমাত্র কয়েকটি রেখার সমন্বয়ে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপি সংশোধন করতে গিয়ে রেখার অন্তর্নিহিত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। তিনি আবিষ্কার করেন, একটি রেখার পাশে আরেকটি রেখা আঁকা মাত্র সে দুটির মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। একটি রেখার সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথের মনে কী ছাপ ফেলেছিল তা বোঝা যায় তাঁর এই উক্তি থেকে, 'এই উদ্ধার কর্মের প্রক্রিয়ায় একটি জিনিস আবিষ্কার করি যে রূপের জগতে রেখার প্রাকৃতিক নির্বাচনের একটি নিরন্তর ক্রিয়া চলছে। এবং যার মধ্যে ছন্দসুষমার যোগ্যতা আছে একমাত্র সেই যোগ্যতমই টিঁকে থাকে।'[১]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি একটি নিদর্শন দিয়ে বোঝান যাক। ইংরিজী 'S' অক্ষরটি চোখে পড়লে পর আমরা অক্ষরটি সুন্দর কিনা তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। কারণ সবরকম রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন এই অক্ষরটি না সুন্দর, না অসুন্দর। কিন্তু তার পাশেই আরেকটি অক্ষর লেখা মাত্র সুরু হয়ে যায় প্রাকৃতিক নির্বাচন। তখনই দেখা দেয় এই প্রশ্ন, এ দুটি অক্ষরের মধ্যে কোন্‌টি সুষমা আনছে বা আনছে না।

ঐক্য বা সুষমার সমস্যা আছে ছন্দে—শব্দ, রেখা ও কথার সমন্বয়ে। তার মানে রবীন্দ্রনাথ যাকে 'নিরন্তর নির্বাচন' বলছেন, তা শব্দের জগতেও উপস্থিত।

তাই সবরকম ছন্দই যে 'নিরন্তর নির্বাচনের' ফলে রূপ নেয় এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সচেতন ছিলেন। লুপ্তি ও উদ্বর্তনের এই প্রক্রিয়াটি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, তার মানে, রেখাসমূহের প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং তাদের ছন্দ। তাঁর এই অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের নজীর রয়ে গেছে তার বহু পাণ্ডুলিপির পাতায়।

রেখার জগতে প্রাকৃতিক নির্বাচনের এই নিরন্তর প্রক্রিয়া আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এ জগতের আর একটি সত্যও দেখতে পান। তিনি দেখেন রেখার জগৎ শুধু নিজেতেই সম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি রেখা যেমন প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল, তেমনি তার

১. In the Process of this salvage work, I came to discover one fact that in the universe of form there is a perpetual activity of natural selection in line and only the fittest servives, which has in itself the fitness of cadence.

প্রতিটির একটি ভঙ্গীও আছে। অর্থাৎ রেখার জগতের সঙ্গে জৈব সম্পর্কে সম্পৃক্ত ভঙ্গীর ব্যঞ্জনা। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'ভঙ্গীর জগৎ'।

অতি অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ কথা নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে অর্থযুক্ত কথার সাহায্যে রূপ দেওয়ার কাজেই তিনি রত ছিলেন। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন, 'অসীমের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে শব্দের জগৎ হল একটা ছোট্ট বুদ্বুদ। বিশ্বের নিজস্ব একটি ভঙ্গির ভাষা আছে, তা কথা বলে ছবি ও নৃত্যের স্বরে'[২] তখন আমাদের মনে গভীর কৌতূহল জাগে।

যে ভঙ্গীর জগৎ রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেছিলেন তারই পথ ধরে তিনি এসে পড়েন আরেক জগতে। লেখার পাণ্ডুলিপি সংশোধনকালে রেখার ছন্দের নির্বস্তুক গুণটি তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। তারপর তিনি সে সব ছন্দকে স্বতন্ত্রভাবে সাজাবার চেষ্টা করেন ভঙ্গীর জগতের সঙ্গে তাল রেখে। রবীন্দ্র-চিত্রকলার এই দ্বিতীয় পর্বে এমন কয়েকটি রূপ পাওয়া যায়, যারা ভঙ্গীর ব্যঞ্জনায় তাদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। কিন্তু মানবিক আবেগ তাদের মধ্যে প্রকাশ পায় না। রূপের বৈচিত্র্য তাতে আছে; কিন্তু আমাদের চেনা কোন রূপের সঙ্গে তাদের মিল খুবই সুদূর। পদার্থের উপাদান নির্ধারিত হয় তাদের গুণাবলীর দ্বারা। রবীন্দ্রনাথ এই পর্বে যে সব রূপ গড়েছেন তাদের মূল্যায়ণ সম্ভব তাদের গুণাবলীর দ্বারা, আবেগের দ্বারা নয়।

আগে দেখেছি রবীন্দ্রনাথ কী ভাবে রেখার বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করেছিলেন—কী ভাবে তিনি রেখার জগৎ ছাড়িয়ে ক্রমে ভঙ্গীর জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ঔৎসুক্য এখানেই থামে নি। ক্রমশ তিনি এক অদ্ভুত রূপের জগতে প্রবেশ করলেন। কৌতূহলে ভরা তাঁর মন বিস্ময়ে বলে উঠল—'স্পষ্টই দেখছি এ জগৎ হল রূপের বিরাট শোভাযাত্রা। রূপের মেলাই আমার কলমের ডগায় দেখা দিতে চায়—কোন আবেগ নয়, কোন চিন্তা নয়, কেবল রূপের সমাবেশ।'[৩]

এই রূপের জগতে এসে 'রবীন্দ্রনাথ' এমন অনেক রূপ গড়লেন যারা কুৎসিত। কুৎসিত রূপের রাজ্য আমাদের সামনে ধরা দিল নানা ভাবে—নানা ভঙ্গীতে। আমরা এলাম রূপের এক উদ্ভট কিম্ভূত জগতে যা রচিত ভীষণ ও অদ্ভুতকে নিয়ে। এ জগতের

২. 'The world of sound is a tiny bubble in the silence of the infinite. The universe has its own language of gesture, and it talks in the voice of picture and dance.'

৩. 'I clearly see that the world is a great procession of forms. It is the play of forms that wants to appear on my pen—no sentiment, no thought, but an assemblage of forms,

কিছুটা আমরা চিনি কিন্তু তার অনেকটাই অচেনা।

এই বিকাশের ঠিক আগেই রেখা ও ভঙ্গীর সঙ্গে মিলেছিল নির্বস্তুক উপাদান। রেখামণ্ডিত সেই ভঙ্গীগুলি আংশিক সাদৃশ্যগুণ পেয়ে চেনা ও অচেনার মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল।

এই হল ১৯৩০ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্র-চিত্রকলার বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এর পর রবীন্দ্রনাথ বহু নিসর্গচিত্র, পোর্ট্রেট আর ফুল পাখি এঁকেছেন। তাদের রঙ উজ্জ্বল। এদের বিষয়ে বলার আগে রবীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রেরণার মূলে যা রয়েছে তার বিষয়ে কয়েকটি কথা বলব। আগে রবীন্দ্রনাথের যে তিনটি উক্তি উদ্ধৃত করেছি তা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে ছবি আঁকতে আঁকতে রবীন্দ্রনাথ এমন এক সত্যে পৌঁছেছিলেন যা তাঁর চেতন জ্ঞানের সীমায় আগে কখনো দেখা দেয় নি। বৈজ্ঞানিকদের মতো তিনি আবিষ্কার করলেন শিল্পের বিজ্ঞান বা শিল্পের ভাষার প্রাথমিক উপাদানগুলি। রেখা ও ভঙ্গীর অর্থ ও সাদৃশ্যরহিত রূপে ছন্দের প্যাটার্ন, আর ভঙ্গীর সঙ্গে আন্তরিক সম্বন্ধে যুক্ত রূপের বিরাট বৈচিত্র্য—রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষীমনকে আকৃষ্ট করেছিল। চিত্রকলা তাঁকে আবেগ প্রকাশের উপায় হিসেবে আকৃষ্ট করে নি।

আবিষ্কারের অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ রেখায় রচিত নির্বস্তুক ভঙ্গী আর এই সব রূপের জগতের নানা গোপন রহস্য বের করতে চেয়েছিলেন বৈজ্ঞানিকের কৌতূহল ও ঋষির দৃষ্টি নিয়ে। এই সন্ধানের ফলে এমন সব রূপ ও ভঙ্গী এবং রেখার সম্বন্ধ তিনি দেখতে পান যার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না বাস্তব রূপের জগতে। অথচ তারা বাস্তব বস্তুর অস্তিত্বের মতোই সত্য। রবীন্দ্রনাথের আঁকা রেখামণ্ডিত ভঙ্গীতে সজীব এই রূপের জগৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ।

নির্বস্তুক জগতে রবীন্দ্রনাথের আবিষ্কারশক্তি যতদিন পূর্ণ সতেজ ছিল, যতদিন তিনি এবিষয়ে আত্মসচেতন ছিলেন ততদিন তাঁর ঔৎসুক্য ফুরয় নি, রেখা রচনায় তিনি ক্লান্তি অনুভব করেন নি। কিন্তু যে মুহূর্তে বাস্তব বস্তুর রূপের সামনে তাঁর আবিষ্কার-শক্তি বিহ্বল হল তখনই দেখি তিনি অভিযোগ করে বলছেন 'আমি ছবি আঁকতে শিখি নি।'

রবীন্দ্র-চিত্রকলার বিবর্তন-ইতিহাসে একটি অদ্ভুত জিনিস আমরা লক্ষ্য করি। ছবি আঁকার তাগিদের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ রেখার যে সম্বন্ধ, রূপ ও ভঙ্গীর যে সুষমা গড়ে তুলেছিলেন—তাঁর পরবর্তী রচনায় যার পূর্ণপ্রয়োগ ঘটেছে—সেটির কথা বলছি। অর্থাৎ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের আঁকা পশু ও মানুষের মুখের অভিব্যক্তি তাঁর আবিষ্কৃত প্রাথমিক রূপের বৈচিত্র্য ঘটিয়েছে কিন্তু তাঁর চিত্রকলায় নতুন রূপ, নতুন রেখা বা নতুন ছন্দ সৃষ্টির কোন প্রচেষ্টাই তখন আর দেখি না।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের ছবি নির্বস্তুক রেখার সমন্বয়ে রচিত। তাঁর শেষ জীবনের চিত্রাবলী বাস্তবানুগ। এদের মাঝখানে পাই অনেক পশু আর স্থাপত্যসুলভ রূপের ছবি।

রবীন্দ্রনাথের আঁকা এই সব অদ্ভুত পশু দেখে এক জার্মান সমালোচক বলেছেন যে এই সব পশুকে কোন চিড়িয়াখানায় পাওয়া যাবে না, তারা দেখা দেয় দুঃস্বপ্নে। উৎপত্তির কারণ যাই হোক না কেন এই সব অদ্ভুত পশুর মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথের মৌলিক প্রেরণা, আবিষ্কারশক্তি এবং দৃষ্টি নির্বস্তুক জগৎ ছেড়ে বাস্তব রূপের পরিচিত জগতে এসে পৌঁছয়।

এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবি ক্রমেই বাস্তবানুগ হয়ে ওঠে। এই সব বাস্তবানুগ ছবি অনেক ক্ষেত্রেই, আগেকার কাজের পুনরাবৃত্তি। কিন্তু তবু তারা রঙের নতুনত্বের ফলে নতুন রূপ পেয়েছে।

শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ পোর্ট্রেট জাতের অনেক ছবি এঁকেছেন। তাদের আকর্ষণ শক্তি অত্যন্ত তীব্র। এই ছবিগুলি দেখে বুঝতে পারি রবীন্দ্রনাথের কাছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের আকর্ষণ কী দুর্বার ছিল। জীবনের শেষ দিকে যে সব ছবি রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন অনেকেই সেগুলোকে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে করেন।

রবীন্দ্রনাথের বাস্তবানুগ ছবিগুলিকে আমি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার পর্যায়ে ফেলি না। কেন, তা বলছি।

সাহিত্যের ভাষার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। ভাষার বিজ্ঞানে ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। কিন্তু চিত্রকলার গঠন এবং আঙ্গিকের ক্ষেত্রে সে রকম গভীর জ্ঞান তাঁর ছিল না। এবং তিনি তা অর্জন করার চেষ্টাও করে নি। চিত্রকলার ব্যাকরণে অজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি ছবির ভাষার আত্যন্তিক গুণগুলি ধরতে পেরেছিলেন। বস্তুজগৎ আমাদের চোখে প্রকাশ পায় আলো আর ছায়ার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায়। ছবির জগৎ তেমনি প্রকাশ পায় সাদা আর কালোর দ্বন্দ্বে।

রেখা আবিষ্কার করেই মানুষ সাদা কালোর রঙ-পরা আলোছায়ার জগৎকে ধরতে পেরেছে. নির্দিষ্ট ছন্দে রেখার বন্ধন পরেছে বলেই, চিত্রের জগৎ বস্তু জগৎ থেকে আলাদা হয়েও সত্য। ছবিতে রেখার বন্ধন না থাকলে বস্তুজগৎ আর চিত্রের জগতের পার্থক্য ধরা পড়ত না—ছবিকে ছবি বলে চেনা যেত না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবি প্রতিভার আলোকে বস্তু জগতের রূপ ও আবেগ ধরতে পেরেছিলেন। তাঁর উপলব্ধির আলোর সাহায্যে চিনতে পেরেছিলেন রেখার ভাষার সারবস্তুটি। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের ছবি সাদা-কালোর জগতে অত্যন্ত সুস্পষ্ট—রেখার বন্ধনে সুনির্দিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথের ছবি আঁকার আঙ্গিকে কোন দেশের নতুন পুরনো কোন আঙ্গিকের অনুসরণ বা অনুকরণের স্বল্পতম চেষ্টাও দেখতে পাই না। তাঁর আঙ্গিক গড়ে উঠেছে প্রয়োজনের তাগিদে। রবীন্দ্রনাথ সর্বদাই কলমের আঁচড় বা রঙে চোবান কাপড়ের পোঁচ আর আঙুল দিয়ে ঘষে ছবিতে প্রাণ আনতে চেয়েছেন।

তাঁর শিল্প-উদ্দীপনার তুলনারহিত চরিত্র তাঁর আঁকা বিচিত্র রূপের নতুনত্ব আর তাঁর রঙের সমন্বয়ের মোহনীয়তার বৈপরীত্যে। রবীন্দ্রনাথের আঁকার আঙ্গিকে কোনই নতুনত্ব নেই। তাঁর ছবির ভাষা খুবই সরল। লোকসাহিত্যের ভাষা যেমন অলংকার-বর্জিত এবং তার একটা সহজ প্রবাহ ও শক্তি আছে, রবীন্দ্রনাথের ছবির ভাষাও তেমনি সহজ সরল আর জোরাল।

লোকসাহিত্যের ভাষা যতক্ষণ একটি আবেগকে বয়ে নিয়ে যায় ততক্ষণই তা সজীব। সেই উদ্দেশ্যটি হারিয়ে ফেললেই তাতে দেখা দেয় নানা ত্রুটি। তেমনি রবীন্দ্রনাথের ছবির ভাষা যতক্ষণ নির্বস্তুক জগতে মগ্ন ছিল ততক্ষণ তার দৃঢ় গতি ছিল অবাধ, কিন্তু যে মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ নির্বস্তুক জগৎ থেকে তাঁর দৃষ্টি বাস্তব জগতের দিকে ফেরালেন তখনি তাঁর ছবির ভাষায় দেখা দিল বহু ত্রুটি।

সঙ্গীতে রবীন্দ্রপ্রতিভার দান

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

১। রবীন্দ্রপ্রতিভা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের মুলকথা ও পরিবেশ:

প্রতিভা সহজাত, প্রতিভাকে ঠিক সৃষ্টি করা যায় না। তবে প্রতিভার বিকাশ হয় অর্থে পরিবেশ-সমাবেশের সঙ্গে, প্রতিভাশক্তির জাগরণ বা অভিব্যক্তি হয়। বিশেষ কোরে উনবিংশ শতকে বাংলাদেশে বহু প্রতিভাবান মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন—কি সাহিত্যজগতে, কি নাট্যজগতে, কি শিল্প ও সঙ্গীতের জগতে এবং কি ধর্ম ও অধ্যাত্ম জগতে। এ কথাও সত্য যে তাঁদের পুণ্যস্পর্শে বাংলাদেশ শিক্ষা, সভ্যতা, শিল্প ও সংস্কৃতির মহিমময় আসনে আজ প্রতিষ্ঠিত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের পলিমাটি ও জলবায়ু যেমন একদিকে বাংলাদেশকে উর্বর ও শস্যশ্যামলা করেছে—অন্যদিকে তেমনি চিন্তাশীল ও প্রতিভাবান মনীষীদের আবির্ভাবের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। বাংলার সাহিত্য, শিল্প, কাব্য, নাটক, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, ও ধর্ম এজন্য এতো সরল, সাবলীল ও অন্তরস্পর্শী।

রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বিশ্বে আজ বরণীয় হলেও বাংলার মাটিতেই তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং বাঙালী সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার ও ধর্মসংস্কারকে ভিত্তি কোরেই তিনি তাঁর প্রাথমিক কবিজীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন রবীন্দ্রপূর্ব বাংলার—সমাজ, রাষ্ট্রজীবন, সাহিত্য, নাটক, কাব্য, দর্শন, সঙ্গীত, শিল্প, ধর্ম ও এমনকি অধ্যাত্মজীবন রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল, যদিও তাদের তিনি নূতন রূপে, রসে, ভাবে ও ছন্দে সুগঠিত করেছিলেন অভিনব ও স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে, তারি জন্য তাঁর সকল-কিছু অবদান আজ বিশ্ববাসীর শ্রদ্ধাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন যেন এক সীমাহীন সমুদ্র, আর মিলিত হয়েছিল তাতে অসংখ্য বিচিত্রমুখী স্রোতস্বিনীতুল্য গুণরাশি, এবং সেই গুণরাশির সমুজ্জ্বল প্রতিফলন ও নব-রূপায়ণই তাঁর শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত প্রভৃতি অবদান। তাঁর মধ্যে ছিল নূতনতর চেতনা ও স্বাধীন চিন্তার উজ্জীবন, তাই পুরাতনের বুকে নূতনতার করেছিলেন তিনি প্রাণসঞ্চার, এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ফলমানতাকে করেছিলেন অধিকতরভাবে সচল ও সতেজ। তাই শুধু বাংলার নয় বা ভারতের নয়, বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে সঞ্চারিত হয়েছে আজ নূতন চেতনা ও শক্তি, এমন কি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনছন্দেও সৃষ্টি হয়েছে এক নূতনতর আলোড়ন ও দৃষ্টির প্রসারণ।

এবার রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্যতম দান হিসাবে আমি রবীন্দ্রসঙ্গীতের করব সামান্য আলোচনা। একথা আমাদের অবিদিত নয় যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ুতেই বিশেষভাবে লালিতপালিত ও বর্ধিত, এবং বাংলার সমাজ, ধর্ম, চিন্তা ও চেতনাই অধিকতরভাবে করেছে তাকে প্রভাবিত ও প্রদীপ্ত। কিন্তু একথাও আবার সত্য যে, সীমার মাঝেই তাঁর সঙ্গীত অসীমের আহ্বানকে বরণ করেছে এবং সীমার সকল বন্ধন অতিক্রম করেছে তার সার্বজনীন আবেদনকে নিয়ে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূলকথা বা মূলধারা হল তার কথা ও সুরের বেণীবন্ধন তথা অর্ধনারীশ্বর রূপ। প্রাচীনকালে সঙ্গীতের কথা ছেড়ে দিলে মধ্যযুগীয় ও বিশেষ করে মুসলমান যুগের ক্ল্যাসিক্যাল তথা অভিজাত সঙ্গীতে সুরেরই ছিল প্রাধান্য, কথা ছিল সুরের দাসী বা সহচারিনী, সুতরাং প্রভুত্ব ও দাসত্ব এই দুয়ের মিলনে মৈত্রীর পরিবর্তে দ্বন্দ্বের ভাবই প্রকাশ পায় বেশী। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই অসচ্ছল ভাব ও সম্পর্কের বিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে কথা ও সুর কেউ করবে না কারুর দাসত্ব, দুয়েরই থাকবে ভাব সম্প্রসারণ শক্তি সমান, দুয়ের মধ্যে থাকবে পারস্পরিক প্রীতি, সঙ্গতি ও মিলনের আকুতি, তবেই গানের মধ্যে পাওয়া যাবে সত্যকারের আনন্দ ও প্রাণের প্রাচুর্য। শিব ও শক্তির মিলন মাধুর্যেই থাকে সৃষ্টির সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের দিব্যচক্ষে ঐ রহস্যই হয়েছিল উদ্ঘাটিত। নইলে বঙ্কিমোত্তর যুগে বাংলাসাহিত্যের রসঘন ভাষা ও ধ্বনিসুন্দর রূপ রবীন্দ্রনাথের হাতে কখনই এত লীলায়িত ও ছন্দায়িত হয়ে আত্মপ্রকাশ করত না। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূলকথাই তাই যে, কথা ও সুরের মধ্যে থাকবে সামঞ্জস্য ও মৈত্রী এবং অর্ধনারীশ্বররূপের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে তাঁর গানে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের উপযুক্ত পরিবেশ পেয়েছিলেন কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে গোড়ার দিকে। নিত্য-নূতন কত হিন্দু-মুসলমান উস্তাদদের বসতো উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর, ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমেও তদানীন্তন খ্যাতনামা গায়ক বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন সঙ্গীতের শিক্ষা ও সংস্কার, সঙ্গীতসেবী জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের সাহচর্যে পেয়েছিলেন গীতরচনায় ও সুরযোজনায় অফুরন্ত উৎসাহ ও প্রেরণা এবং তখনকার সমাজে প্রচলিত বাংলা টপ্পা, টপখেয়াল, পদাবলী ও চপকীর্তন, রাম-প্রসাদী, বাউল, ভাটিয়ালি প্রভৃতি গান ও গীতরীতিও জুগিয়েছিল তাঁকে যথেষ্ট উপাদান এবং সৃষ্টি করেছিল তাঁর অন্তরে গানের ও গীতিরচনার উদ্দীপনা। দেশে বিদেশে ভ্রমণ-কালেও তিনি গান শুনেছিলেন অনেক এবং নৃত্যও দেখেছিলেন বিচিত্রভঙ্গির। এই সকল-কিছু দেখা ও শোনার অভিজ্ঞতা ও সংস্কার তাঁর গান রচনা ও সুরযোজনার পথকে করেছিলেন প্রসারিত ও সমৃদ্ধ। সকল সংকীর্ণতার উর্ধে ছিল তাঁর মন। তিনি সকল

দেশ ও সকল জাতির কাছ থেকেই ভাল যা-কিছু সুন্দর ও সুসঙ্গত যা-কিছু সবই গ্রহণ করেছিলেন তাঁর গানের ও সুরের ভাণ্ডারকে। পরিপূর্ণ ও সুষমান্বিত করার জন্য। তাঁর গানের সুরে, তালে এবং নৃত্যের ছন্দে তাই একদিক থেকে পাই যেমন উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অন্যদিকে তেমনি বৃহত্তর-ভারত ও পাশ্চাত্যের ভিন্ন ভিন্ন দেশের সুর, তাল ও নৃত্যছন্দের আঙ্গিক ও সুষমা।

মোটকথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতি, নাট্য ও নৃত্য-সৃষ্টির পরিবেশ পেয়েছিলেন দু' রকম ভাবে: এক—প্রাকৃতিক ও পূর্বসৃষ্ট এবং দুই—নিজস্ব সৃষ্ট ও নিজ নির্বাচিত। এই দুই পরিবেশের মধ্যে তিনি প্রথমটির প্রভাব ও সহায়তা পেয়েছিলেন গোড়ার দিকে জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে—তা পূর্বেই বলেছি। তারপর গানরচনার এলো প্রেরণা, জ্যোতি দাদার পিয়ানোর সুরের সঙ্গে সঙ্গে চললো গানের মহড়া ও রচনা এবং রচনা করলেন কাব্যসৌন্দর্য ও ভাবমাধুর্য দিয়ে কত চৌতাল, ধামার সুর ফাঁকতাল, ঝাঁপতাল, তেওরা প্রভৃতি বাংলা গান। সৃষ্টির উন্মাদনা তখন স্বতঃ উচ্ছ্বসিত। দিগন্তবিস্তারী আশা ও আনন্দ নিয়ে সৃষ্টি করে চলেছেন তিনি আপন মনে। কখনো পুরাতনের বুকে নূতন, আবার কখনো পুরাতন সংস্কারনির্মুক্ত সম্পূর্ণ নূতন।

২। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকাশ, রূপরেখা ও ক্রমবিবর্তন ঃ

সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এলো রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিকাশের পালা। একটি একটি গান রচনা ও তাতে সুর যোজনা করে রবীন্দ্রনাথ ক্রমে গানের শতদল ও সহস্রদল কমল সৃষ্টি করলেন। তাদের সৌরভ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়লো সারা বাংলাদেশে ও ভারতের এখানে সেখানে —যেখানে প্রবাসী বাঙালীরা ছিলেন ছোটখাট সমাজ গঠন করে। তারপর ধীরে ধীরে বিস্তৃত হল সকল জাতির ভিতর ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে পশ্চিমের দেশগুলিতে।

প্রতিটি গীতশ্রেণীর থাকে যেমন একটি স্বকীয় রূপ ও শৈলী, রবীন্দ্রনাথের গানেরও তাই। মূলানুগ ও ছায়ানুগ রাগগুলি ছাড়া তিনি অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন নিজস্ব ভঙ্গীতে বিচিত্র বিষয়, রস ও ভাবকে আশ্রয় করে। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য-সম্পর্কিত গানের সংখ্যাও কম নয়। চার থেকে আঠারো মাত্রার ছন্দসমন্বিত তাল এবং বিচিত্র শাস্ত্রীয় রাগকে নিয়ে তাঁর গান লীলায়িত,—যদিও রাগের গঠন ও মেজাজের একটু বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতির তুলনায়। আঙ্গিক, বর্ণ, অলংকার, গমক, ছোটখাট সরল তান, মীড়, প্রকৃতিকে নিয়েই লীলায়িত তাঁর গান। তবে অলংকরণ-রীতিতে সংযম-রক্ষণেই তাঁর গান বা গীতরীতির বৈশিষ্ট্য। ছোটখাট তানের ব্যবহার তিনি নিজেই করেছেন। তবে হিন্দুস্থানী উস্তাদেরা সচরাচর যে তানের বাহুল্য ও

পুনরুক্তিধারার অনুসরণ করে গানের কলেবরকে ভারাক্রান্ত করেন, রবীন্দ্রনাথ তা ঠিক পছন্দ করতেন না। সীমার মাঝে অসীমকে পাবার আকুতিই বরং পাওয়া যায় তাঁর গানে। মোটকথা তান অর্থে তুলোধোনাপদ্ধতির অনুসরণকে তিনি অপছন্দ করতেন এবং এ সংস্কার তিনি গুরুশিষ্য-উত্তরাধিকারসূত্রে সম্ভবত পেয়েছিলেন তাঁর প্রথম সঙ্গীতগুরু বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছ থেকে। কেননা রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন বিষ্ণু ছিলেন সহজ সরল তানের পক্ষপাতী। তাঁর কণ্ঠে গান নিরাভরণ হয়েও রস ও ভাবের আন্তর অলংকরণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো।

মোটকথা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল সঙ্গীত কলা হলেও তার মধ্যে একটি সীমাবদ্ধতার ভাব অবশ্যই থাকবে এবং সেই সীমিত ও সংযত রূপরেখায় ও রূপায়ণে সঙ্গীতের পূর্ণরূপ হবে অভিব্যক্ত। দিগন্তবিস্তৃত আকাশের সকল অংশ কোনদিনই দৃষ্টিগোচর হয় না, কিন্তু তাই বলে আকাশকে মানুষ কখনো সসীম বলে না, বরং অংশের মধ্য দিয়েই সে অসীমের পূর্ণরূপকে কল্পনা করে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়। তেমনি কথা ও সুরের মিশ্রণে যে সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় সে সঙ্গীতই যথেষ্ট সেই অসীমের অনন্তভাব ও অফুরন্ত আনন্দসত্তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। তাকে আলাপ, তান, গিটকিরি প্রভৃতি অলংকার বাহুল্যে স্ফীত ও বিস্তৃত করার কোন প্রয়োজন হয় না। উপমাটি এখানে সদৃশ না হলেও অর্থসঙ্গতির পক্ষে যথেষ্ট বলা যায়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের রূপরেখা তাই সহজ সরল অলংকরণ নিয়ে সুর। তাল ও ছন্দের রূপায়ণ বলা যায়, এবং সেই রূপায়ণে আন্তরিকতা ও প্রাণের আবেদনই সবটুকু, অকারণ ঐশ্বর্য বাহুল্য অর্থহীন। তারি জন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত মানুষের মনের কাছেই শুধু পৌঁছে দেয় না তার আবেদন, প্রাণের তথা মর্মের অন্তস্থলেও সৃষ্টি করে আনন্দ মুখরিত স্পন্দন!

রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্যেও আছে একটি ক্রমবিবর্তনের ধারা। সমালোচক-সাহিত্যিক ধূর্জটিপ্রসাদের কথায়ই বলি রবীন্দ্রসঙ্গীতে আছে তিনটি চারটি স্তর। অনেকের মতে স্তর বা বিকাশ পর্যায়ের ভাগ চার পাঁচটি। প্রথম স্তরে পাই ভাল ভাল খানদানী 'ঘরোয়ানা চীজের' গান। দ্বিতীয় যুগে খানদানী কাঠামোর ভিতরেই একটু সুরের ও তালের নূতনত্ব। কাঠামোটি পুরাতন, কিন্তু কিসের একটা প্রয়োজন, কিসের একটা তাগিদ রবীন্দ্রনাথ পূরণ করতে পারছেন না তাই কাঠামোর ওপর রংটি বদলাতে হচ্ছে, তার ওপর অলংকারগুলিকে একটু নূতন রকমে সাজাতে হচ্ছে! তৃতীয় স্তরে এলো ভাটিয়ালি, বাউল, কীর্তন গান। এ যুগে দরবারী সুরের সঙ্গে দেশীর হলো মিশ্রণ। চতুর্থ যুগ বা স্তরের কীর্তি অসীম, কেননা এ'যুগের গানগুলির মধ্যে পাই সংযম ও হৃদয় গ্রাহিতার ভাব। রবীন্দ্রনাথ নিজেও বলেছেন তার শেষের গানগুলি সম্পূর্ণ ইস্‌থেটিক।

'রবীন্দ্রস্মৃতি'র লেখিকা শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরাদেবী তাঁর সংগীতস্মৃতি প্রসঙ্গে লিখেছেন : "অনেকে তাঁর প্রথম বয়সের গান বেশি পছন্দ করেন, তাঁর ভাষা ও ভাব সরল ও মর্মস্পর্শী বলে। তিনি নিজে আমাকে বলেছেন 'আমার আগেকার গানগুলি ইমোশনাল, এখনকারগুলি ইস্‌থেটিক' "।

রবীন্দ্রনাথের গান রচনায় ক্রমবিকাশের ধারা কল্পিত অথবা কল্পনা বাস্তবে মিশানো বলা যায়। বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ও বোধির ক্রমস্ফুরণ যেমন স্বাভাবিক, তেমনি গানের জন্য গান এবং নাটক ও নৃত্যের জন্য গান যত তিনি রচনা করেছেন, তাদের প্রকৃতি, ভাব ও ভাষার মধ্যে একটা তর-তমতার ভাব লক্ষ্য করা কিছু অস্বাভাবিক নয় এবং সেই ভাব ও রচনা সামর্থ্যের তারতম্যকে আমরা কল্পনা করি স্তর রূপে। তবে সকল ক্রমাভিব্যক্তির মধ্যেই পাই রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভার অনন্ত পরিচয় এবং সে পরিচয়কেই বলতে পারি কবির অখণ্ড আত্মপরিচয়। উনবিংশ শতকের প্রায় অর্ধভাগ থেকে আজ পর্যন্ত সেই প্রদীপ্ত প্রতিভার নিদর্শন বর্তমান এবং সুদূর ভবিষ্যতের বুকেও তার লীলায়ন থাকবে অক্ষুণ্ণ।

৩। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপ্তি, আত্মবোধ ও বৈশিষ্ট্য :

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপ্তি, আত্মবোধ ও বৈশিষ্ট্য তার সত্যকারের পরিচয়। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রাথমিক সূচনা অনুসরণ ও অনুকরণ-নীতি দুটির পথচারী হলেও তাদের মধ্যে ছিল স্বাতন্ত্র্য ও আত্মবোধের ভাব। পরবর্তীকালে রচিত গান ও সুরের বৈশিষ্ট্য স্বয়ং-সম্পূর্ণ ও স্বাধীন। তখন ব্যাপ্তি তার রসে, ভাবে ও গভীর অনুভূতিতে। ব্যাপ্তি তার শুধু মনে নয়, বুদ্ধিতে নয়—বোধিতে। তাও একটি মাত্র মানুষের নয়, একটি মাত্র জাতিতে নয়, সর্ব মানুষ, সর্ব জাতি ও সর্ব দেশের বোধিতে। এই বহিঃ ও অন্তর্ব্যাপ্তিতেই সঙ্গীতের পূর্ণ পরিণতি। মানবধর্মতা, কবিধর্মতা ও সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার ত্রিবেণী সঙ্গমে রবীন্দ্রনাথের সকল গান, সুর, নাটক ও নৃত্য যেন রসের ও ভাবের প্রাণময় প্রতিমা। সুতরাং রবীন্দ্রসঙ্গীত মানুষের আত্মদমন ও আত্মবোধ-জাগরণের একটি সুষ্ঠু ও সহজ উপায় বললেও অত্যুক্তি হয় না।

৪। আলোচনার শেষ কথা :

রবীন্দ্র সঙ্গীতের আলোচনার শেষ কথার অবতারণা করে আমার বক্তব্য আমি শেষ করব। পূর্বেই বলেছি অন্যান্য গীতরীতির মতো রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রতিফলনেরও একটি নিজস্ব ধারা বা শৈলী আছে। "কবির সংস্পর্শে" নিবন্ধে শ্রীসাহানা দেবী সত্যই

বলেছেন : "যার গান তোলা হয় সেই সঙ্গীত স্রষ্টার নিজস্ব ধারা, রীতিনীতি, ভাবভঙ্গী সবের সঙ্গেই তার থাকা দরকার পূর্ণ-পরিচয়"। এরই নাম প্রকাশের সঙ্গে গানের স্রষ্টার আত্মভাব ও প্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে আত্মস্থ করা। রচনা ও রচনার ভাবের সঙ্গে মনের একতানতা না এলে ঠিক শৈলীর উদ্ভব হয় না। গ্রন্থ পাঠ তথাপি সার্থক হয় যখন গ্রন্থের আক্ষরিক আকারে নিবদ্ধ গ্রন্থকারের চিন্তাধারা ও ধারণার সঙ্গে পাঠকের মনের একাত্মতা ঘটে। সঙ্গীতের শৈলীকে সাধারণভাবে তাই বলা হয় 'ঘরোয়াণা' শব্দটির মাধ্যমে শৈলী বা ইংরাজী 'ষ্টাইল' শব্দের ঠিক পূর্ণপ্রকাশ সম্ভব হয় না ; শৈলী বা ষ্টাইল ঘরোয়াণা ছাড়া আরো কিছু জিনিস এবং সে জিনিস হল ভাবের সঙ্গে মনের এবং মনের সঙ্গে প্রাণের একাত্মতা। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রকৃতি, রস, ধারাকে অনুসরণ করে যখনই রবীন্দ্রসঙ্গীতের করি তাই প্রতিফলন, তখনি সার্থক হয় রবীন্দ্রনাথের গীতশৈলী।

এই গীতরীতির বৈপরীত্যও দেখা যায় অনেক সময় রবীন্দ্রসঙ্গীতে। এ প্রসঙ্গে শ্রীসাহানা দেবীর উদাহরণের কথাই বলি আত্মলোভ সংবরণ করে। "কবির সংস্পর্শে" তিনি বলেছেন : "এখন যাঁরা রবীন্দ্র সংগীত করেন তাঁরা সকলেই বেশ সুকণ্ঠ, সুকণ্ঠী। তাঁদের গলা আমাদের দিনের চেয়ে অনেক বেশি তৈরী, আর ক্ষমতাও যথেষ্ট। তবু তাঁদের অনেকের মুখে সব সময় রবীন্দ্রসংগীত তেমন ফোটে না, আসল রূপটি পাওয়া যায় না। যাঁরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বা দীনেন্দ্রনাথের কাছে শিখেছেন তাঁদের কথা আমি বলছি না। যাঁদের কথা বলছি তাঁরা হয়তো সাধারণতঃ স্বরলিপি দেখে, বা কারও কাছে শুনে শেখেন, অথবা এমন কারও কাছে শেখেন রবীন্দ্র সংগীতের আসল জিনিসটির পরিচয় যাঁর ঠিক জানা নেই। অথচ সুর হয়তো ঠিকই থাকে। সেজন্যে ঠিক সুরে গাইলেই যে তা সব সময় রবীন্দ্রসংগীত হয়, তা নয়। এও দেখা গেছে কারও কণ্ঠে মূল সুর থেকে সুরের হয়তো এক আধটুকু ব্যতিক্রম হয়েছে, কিন্তু তবু তা রবীন্দ্র সংগীত ঠিকই হয়েছে। * * সুরের যে এত তারতম্য আজকাল ঘটেছে তার জন্যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও বোধ করি ছিলেন কতকটা দায়ী। কেন না তিনি অনেক সময়, সুর ভুলেই হোক বা সুর বদলাবার জন্যেই হোক দেখা গেছে একই গান সব সময়েই ঠিক একই সুরে সকলকে শেখান নি। অনেক সময় তারতম্য ঘটেছে, যদিও তা খুবই সামান্য হত। এত গান তিনি রচনা করেছেন যে, সব হুবহু মনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সেইজন্যে তাঁর গানের কোন্ সুরটা ঠিক এ নিয়ে তর্ক চিরকালই থেকে যাবে"।

তুমুল আলোচনার সমরাঙ্গণ সৃষ্টি না করে শ্রীসাহানা দেবীর ঐ কথাগুলি বললেই বোধ হয় বৈপরীত্যের কথা ঠিক বলা হয় মনে করি। এখন আমাদের কথা হল এ তর্ক চিরকালই থাকৃতে না দিয়ে একটা সমাধান এর হওয়া উচিত। কবিগুরু নিজেই

বলেছেন,

"শুধায়ো না, কবে কোন গান
কাহারে করিয়াছিনু দান।
পথের ধূলার পরে,
পড়ে আছে তারি তরে,
যে তাহারে দিতে পারে মান।"

তাঁর ধ্যানের ধন সকল গানকে যথাযোগ্য মান দিতে গেলে সঠিক প্রতিফলন তাদের হওয়া উচিত। তাই অন্তত রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে যে মুষ্টিমেয় কজন এসেছিলেন, তাঁদের যুক্তিসম্মত বিচারেই বোধ হয় এর একটা সমাধান হোতে পারে। বিশ্বভারতীই কবিগুরুর অভিপ্রেত ও নির্বাচিত শিক্ষাতীর্থ এবং তাঁর জীবন্ত ভাব, শক্তি ও প্রেরণার প্রাণকেন্দ্র। আমি মনে করি রবীন্দ্রসঙ্গীতের সত্যকার নিরীক্ষা-পরীক্ষা ও শিক্ষার অভিপ্রেত স্থানই বিশ্বভারতী। কালের চলমানতায় সকল-কিছুর মধ্যে স্খলন ও দৈন্য আসা কিছু বিচিত্র নয়। বিস্মৃতিও বৈপরীত্য সৃষ্টির পথে একটি কারণ। তাই বর্তমানে যাঁরা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পুণ্যস্পর্শে এসে ধন্য হয়েছেন তাঁদেরই আমি বলি এই বিকৃতি সংস্করণের দায়িত্বকে গ্রহণ করার জন্য এবং রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব বিদ্যাপীঠ এই বিশ্বভারতীই করবে তার সুবিহিত ব্যবস্থা।

পরিশেষে বলি কালজয়ী রবীন্দ্র প্রতিভার অবদান অমর কীর্তি তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত। বাংলা দেশের পরম সৌভাগ্য যে সেই দুর্লভ মানুষকে সে বক্ষে ধারণ করেছিল। বাংলার মাটি শুধু নয়, বিশ্বের মাটি ও বিশ্বের জল সত্যই ধন্য হয়েছে এবং চিরকালই ধন্য হবে। বিশ্বের সর্বত্র আজ শিক্ষা ও সংস্কৃতসেবী মানুষ যে রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রতি আত্মনিবেদন করে তাঁদের শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করছে তাতে বাংলাদেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের মানই রাখতে হচ্ছে বলে মনে করি। আমরা ও আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাবনতি জানাই সেই দেদীপ্যমান কবিপ্রতিভার উদ্দেশ্যে!

বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্র-সঙ্গীত

শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র

বাংলা গানের একটি বৃহৎ সঙ্কলন গ্রন্থের সম্পাদক বাংলা গানের অনেকগুলি যুগের উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে বৈষ্ণব পদকর্তাদের পর একটি নতুন যুগের প্রবর্তন করলেন রামপ্রসাদ। তারপরে কবিগীতির প্রাধান্য। তারপরে এল টপ্পার যুগ। এর পরে প্রসিদ্ধ হল ঢপকীর্তন, পাঁচালী—এই সব। অপর এক যুগের সূত্রপাত করলেন রামমোহন তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায়।

রবীন্দ্রনাথ যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন ব্রহ্মসঙ্গীতের গৌরবময় যুগ চলেছে এবং অন্যান্য গানের স্মৃতিও বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। পাঁচালী, কবিগীতির অনেক ধরণ ধারণ সাধারণ গানে আশ্রয় নিয়েছে। টপ্পার অনেকরকম নতুন ধরণ বেরিয়েছে। এছাড়া উত্তর ভারতের নানান ঢঙও বাংলা গানে বেশ খানিকটা এসে গেছে। এই বিভিন্ন ধরণের গানের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল আর বিশেষ পরিচয় ছিল পুরাতন টপ্পার সঙ্গে। এই অভিজ্ঞতার ফলে তিনি যে সব গান রচনা করেছিলেন তা বিশেষ জনপ্রিয় হতে পেরেছিল এবং ক্রমে বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীত অচ্ছেদ্যভাবেই জড়িয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের রচনা খুব অল্পকালের মধ্যেই বাঙালী সমাজে অভিনন্দিত হয়েছিল তার কারণ তিনি প্রচলিত রীতি বা ট্র্যাডিসনকে সযত্নে রক্ষা করেছিলেন এবং মেলডি বা সুর-রঞ্জনে স্বকীয় চিন্তার বৈশিষ্ট্য স্থাপন করেছিলেন। একদিক দিয়ে তিনি ছিলেন কনজার্ভেটিভ অপর দিক দিয়ে রোমান্টিক। তৎকালীন বাঙালী যে ধরণের গান শুনে আসছিলেন তার কাঠামোটা রবীন্দ্ররচনায় পেলেন সুতরাং তাঁদের বিশ্বাসে আঘাত লাগলনা অথচ কাব্য, সাহিত্য এবং সুরের দিক থেকে এমন একটা নূতনত্বের স্বাদ পেলেন যা তাঁদের মর্মে প্রবেশ করেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, একথা শুনে আসছি যে সেকালকার গাইয়ে মহল রবীন্দ্রনাথের গানের সাঙ্গীতিক গুণকে স্বীকার করেননি এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমান গোপন করেছিলেন এমন নয় কিন্তু বহু গুণী এবং অভিজ্ঞ শিল্পী যে রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন একথাও তো খুবই সত্যি। এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানকে ওস্তাদি ঢঙে গেয়ে আনন্দ পেতেন। উদাহরণ স্বরূপ "মন্দিরে মম কে আসিলে হে" গানটির উল্লেখ করা যায়। সুরের মূলকাঠামোকে অবলম্বন করে কত তান বিস্তার করেই না একদা ওস্তাদ পন্থীরা এ গান গাইতেন। গীতাঞ্জলির কত গান আমাদের ছেলেবেলাতে বেশ ওস্তাদি ঢঙে গাইতে শুনেছি। তার আগের কালের

কত গান,—যেমন 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না', "যামিনী না যেতে জাগালে না কেন বেলা হলে মরি লাজে' ইত্যাদি বেশ তান বিস্তার করেই গাওয়া হত। ওস্তাদদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের গানকে বেছে নেবার প্রধান কারণ হল এই যে রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁরা ভারতীয় সঙ্গীতের মূল বস্তু গঠন পারিপাট্যের আশ্চর্য নৈপুণ্য লক্ষ্য করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের আগেকার গান সরল এবং সহজ অথচ তার সুর মর্মস্পর্শী। "হেলাফেলা সারাবেলা একি খেলা আপন মনে", "বনে এমন ফুল ফুটেছে মনে করে থাকা আর কি সাজে" প্রভৃতি গান সেকালের প্রচলিত ঢঙেই রচিত কিন্তু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আবেদনে। এক্ষেত্রে কথা আর সুর এক হয়ে চিত্তকে আকর্ষণ করছে। এই একীকরণ রবীন্দ্রনাথের মত পারদর্শিতার সঙ্গে আর কেউ করতে সমর্থ হননি। সে যুগে এই প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মায়ার খেলা। লিরিক এবং সুরে গানগুলি এত সার্থক হয়ে উঠেছিল যে বহুদিন ধরে মায়ার খেলার গানগুলি লোকের মুখে মুখে ফিরত। চিরকুমার সভার গানগুলিতেও মেলডির অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে এবং এ গানগুলিও এই কারণেই বাঙালীর জীবনে স্মরণীয় হয়ে আছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেশি আলঙ্কারিক হয়ে পড়েছেন; তাঁর শেষ জীবনের গানগুলিতে যে মেলডির প্রকাশ হয়েছে তার ভঙ্গী স্বতন্ত্র। এ যুগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশিষ্ট সঙ্গীতচিন্তাকে উদ্‌ঘাটিত করছেন আর পূর্বযুগে তিনি যা করেছিলেন তা রিফাইনমেণ্ট বা কারুদক্ষতা। নিজের প্রিয় বস্তুকে প্রিয়তর করে তুলে ধরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুরাতন গানে এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন।

এ গেল সাধারণ গানের কথা সঙ্গীতের বিশেষ কয়েকটি বিভাগে বাঙালীর ওপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও সামান্য নয়। অধ্যাত্মগীতে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর হৃদয় অধিকার করে আছেন। অধ্যাত্ম বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যে গান রচনা করেছেন তা সুললিত কাব্য-সঙ্গীত থেকে পৃথক নয়। কাব্য মাধুর্য্য এবং ভক্তির আকুতি—এই দুই-এর সমন্বয়ে তিনি যে গান আমাদের উপহার দিয়েছেন তা আমাদের আবেগপ্রবণ হৃদয়ের আকাঙ্খিত বস্তু এবং বাঙালীর জীবনে রবীন্দ্রনাথের ধর্মসঙ্গীত চিরগৌরবে রক্ষিত হয়েছে। বাঙালী ধর্মসঙ্গীত বলতে চিরকাল সাধনসঙ্গীত বুঝে এসেছে। কোনো দেবদেবীকে অবলম্বন করে রচিত বন্দনা গানই ছিল বাঙালীর ধর্মসঙ্গীত। অবশ্য এ সব গান যে সবক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িক ছিল এমন নয় সর্বজনীন আবেদনও মাঝে মাঝে পাওয়া যেত কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে গান রচনা করলেন তাতে বিশ্বপ্রকৃতিকে পরিব্যাপ্ত করে বিশ্বনিয়ন্তার যে প্রভাব শাশ্বত মানবহৃদয়ে নানা অনুভূতির প্রকাশ ঘটিয়েছে তারই পরিচয় বর্তমান। মহাকালের যে লীলা এই বিশ্বে অনন্ত বৈচিত্র্যে অব্যাহত রবীন্দ্রনাথ তাকেই পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং

তাঁর গান সেই ইঙ্গিতই বহন করে। রবীন্দ্রনাথের গানের একটা বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে এমন এক বস্তু যা প্রত্যেকের অনুভূতিতে রয়েছে অথচ সে অনুভূতি যে কী তা বলে বোঝাবার নয়। এই অস্পষ্টতার রোমাঞ্চ তাঁর অধ্যাত্ম সঙ্গীতকে বিপুল জনপ্রিয় করে তুলেছে।

শ্রাবণ ঘন গহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মত নীরব ওহে সবার দিঠি এড়ায়ে এলে

এ গান যখন শুনি তখন নিভৃত পদসঞ্চরণে এক রোমাঞ্চকর আবির্ভাব অনুভূত হয় সেই মধুর অস্পষ্ট অনুভূতি আমরা অন্তর দিয়ে উপভোগ করি। এ অনুভূতি আমাদের মোহাবিষ্ট করে। এই কারণেই গীতাঞ্জলির গানগুলি বাঙালীর এত প্রিয়।

ধর্মসঙ্গীতেও রবীন্দ্রনাথ সরল পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এ গানগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই ভারতীয় সঙ্গীতের আদর্শে চারটি কলিতে সম্পূর্ণ এবং সুর রাগসঙ্গীতের আদর্শে প্রযুক্ত। তথাপি প্রকৃতিতে এরা কেউ গতানুগতিক নয়; প্রত্যেকটির মধ্যে রাবীন্দ্রিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান। উদাহরণস্বরূপ সঞ্চারীগুলির উল্লেখ করা যায়। বাংলা গানে সঞ্চারী রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব সৃষ্টি। ভারতীয় সঙ্গীতের চারটি কলি—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ। স্থায়ী অংশে সঙ্গীত তার বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে; অন্তরায় গানের মধ্যবর্তী অংশে তার রূপ এবং রস ঘন হয়ে ওঠে; সঞ্চারীতে এই নির্দিষ্টরূপের বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়; আভোগে আবার সেই গান পূর্ণতার গহনে প্রবেশ ক'রে সঙ্গীতকে প্রশান্ত পরিসমাপ্তিতে নিয়ে আসে। প্রাক্ রবীন্দ্রযুগের বাংলাগানে এই সঞ্চারীর প্রয়োগ কমই দেখা যায়; অধিকাংশ গান স্থায়ী এবং অন্তরায় সমাপ্ত হত অথবা স্থায়ীর পর অন্তরার পুনরাবৃত্তি ঘটত। এর প্রধান কারণ একদিকে গানের গতানুগতিক বা ট্র্যাডিসনাল প্রকৃতি অপরদিকে রচয়িতার উপযুক্ত প্রতিভার অভাব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সঞ্চারীকে অবশ্য-অঙ্গ হিসাবে যোজনা করলেন এবং মাধুর্য্যে, বৈচিত্র্যে সঙ্গীতকে গতানুগতিক রীতি থেকে স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে সংগঠিত করলেন। এই বৈচিত্র্য বাঙালীকে বিপুলভাবে আকৃষ্ট করেছে। রবীন্দ্রনাথের গানের মধ্যে বাঙালী পেয়েছে সঙ্গীতের একটা অখণ্ডরূপ যা নানা বৈচিত্র্য এবং অলঙ্করণ সত্ত্বেও সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুনির্দিষ্ট। যাঁরা কাব্যসঙ্গীত পছন্দ করেন তাঁরা রবীন্দ্রনাথের গানে তাঁদের অভীষ্ট বস্তুকে সম্পূর্ণভাবে পেলেন, আর যাঁরা রাগসঙ্গীত পছন্দ করেন তাঁরাও রাগসঙ্গীতের আবশ্যক উপাদানগুলি লাভ করলেন। যুগপৎ দিক থেকে এই জনপ্রিয়তায় একদা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাংলার সঙ্গীত জগতে একটা বিপুল আলোড়ন আনতে সমর্থ হয়েছিল। উভয় দিক থেকে এই উচ্ছাসের ফলে রবীন্দ্রনাথের গানে গায়কসমাজ কিছু অসমর্থিত বাহুল্য অর্পণ করেছিলেন এটা ঠিক কিন্তু বাংলার

সঙ্গীতজগতে রবীন্দ্রপ্রভাবের সার্থকতাও এর থেকে প্রমাণিত হয়।

বাঙালী জীবনে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতের প্রভাবও অসামান্য। এই প্রভাবের মূল কারণ এনয় যে রবীন্দ্রনাথের গানে উত্তেজক উপাদান অধিক পরিমাণে বিদ্যমান—এর মূল কারণ মানবতা। মনুষ্যত্বের আবেদন হচ্ছে সব চেয়ে বড় আবেদন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী গানগুলিতে প্রধানত এই আবেদনই জানিয়েছেন। চিত্ত এবং চরিত্রের দৃঢ়তা, আন্তরিক পবিত্রতা এবং নিষ্ঠা আত্মিক শক্তিতে নির্ভরতা, ধৈর্য ও স্থৈর্য সহকারে ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা-এই সবই ছিল রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীতের মূল মন্ত্র। এই আদর্শগুলিকে তিনি শান্ত অথচ ওজস্বী ভঙ্গীতে স্থাপন করেছেন। রাগসঙ্গীত থেকে লোকসঙ্গীত পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর অবাধ পরিভ্রমণ ছিল এবং গানের প্রকৃতি অনুসারে তিনি এই সব সুর প্রয়োগ করে তাদের চিত্তাকর্ষক করে তুলেছেন। স্বদেশী সঙ্গীতে তিনি উচ্ছাসের প্রশ্রয় দেননি অথচ বাঙালীর স্বভাবগত সেন্টিমেণ্ট তাতে যথেষ্ট রয়েছে। সুরের দিক থেকেও তাঁর স্বদেশী গানকে লাউড বা উচ্ছাসপ্রবণ বলা চলে না অথচ তাতে প্রাণশক্তির প্রাচুর্য এবং যথোপযুক্ত ওজস্বিতা বর্তমান। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানগুলি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে মনোভাব নিয়ে গাওয়া হয়েছে আজও সেই মনোভাব নিয়েই গাওয়া চলে। যেখানে মনুষ্যত্বের অবমাননা ঘটে, দুর্বল উৎপীড়িত হয় সেখানেই রবীন্দ্রনাথের গানগুলির কথা আমাদের স্মরণ হয়। স্বদেশী সঙ্গীত রচনাকল্পে মহামানব রবীন্দ্রনাথ যে সঙ্গীত রচনা করেছেন তাতে মানবতার চিরন্তন মূল্য স্থাপিত হয়েছে এবং বাঙালীর মন থেকে সে সঙ্গীত অবলুপ্ত হবার নয়।

বাঙালী রবীন্দ্রনাথের গানকে আদর এবং নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছে তার কারণ রবীন্দ্রনাথ বাংলার সঙ্গীতশিল্পকে শ্রদ্ধা এবং নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। প্রচলিত সঙ্গীতকে আয়ত্ত করে স্তরে স্তরে তার বিভিন্ন শাখাকে সুসংস্কৃত করে তিনি পরিশীলিত কাব্যসঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন যা রুচিসম্মত বাঙালীর মনকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছে এবং যেখানে রুচির অভাব ছিল সেখানে রুচিবোধ এনে দিয়েছে। এটা একটা অসামান্য সংস্কারগত প্রচেষ্টা। সঙ্গীত জাতীয় জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ; জাতীয় চরিত্রের সম্ভ্রম এবং স্নিগ্ধতার পরিচায়কতার সঙ্গীতসংস্কৃতি। এমন একটা মনোরম দিকে সে যুগের সুধীব্যক্তিরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ফলে ভদ্র বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন থেকে সঙ্গীত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল বললে অত্যুক্তি হয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যসঙ্গীতের মাধ্যমে এই দিকে একটা চেতনা জাগ্রত করলেন। সেকালকার টপ্পা আড়খেমটার রীতি নিয়েই তিনি গঠন করলেন এ যুগের প্রেম সঙ্গীত যা পরিমার্জিত

সমাজে অনায়াসে গাওয়া যেতে পারে। তথাপি প্রথম প্রথম এসব গান গাইতে দিতেও আপত্তি যে হয়নি এমন নয় কিন্তু সে আপত্তি টিকল না। রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত কাব্যসঙ্গীত আমাদের সমাজে সগৌরবে অধিষ্ঠিত হল;—মেয়েরাও অর্গ্যান বাজিয়ে সুললিত কণ্ঠে গাইলেন,—"তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা, তুমি আমার নিভৃত সাধনা মম বিজন গগনবিহারী।" পূর্বযুগের টপ্পা বা পাঁচালীর গান সামাজিক সমাবেশে গাওয়া সম্ভব ছিল না অথচ কাব্যসঙ্গীতের উপাদান এসব গানে যে ছিল না তা নয়—বিশেষ করে টপ্পায় তো বহুলভাবেই ছিল। এই সব উপাদান সংগ্রহ করে যে সঙ্গীত সাহিত্য নতুনভাবে গঠন করা যায় সে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কেউ গভীরভাবে চিন্তা করেন নি। সৃষ্টি যখন একবার হল তখন তা চলল স্বাভাবিক গতিতে। রবীন্দ্রনাথের সহযোগিরাও এই কাজে যোগ দিলেন। উনবিংশ শতকের শেষ পর্যায় থেকে এ শতাব্দীর প্রথম যুগ পর্যন্ত কাব্যসঙ্গীতের উৎকর্ষ একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ভদ্রসমাজে সঙ্গীতের ব্যাপক প্রচলন হওয়াতে সাধারণ রঙ্গালয়গুলির কর্তৃপক্ষও তাঁদের নিয়মে বিভিন্ন ধরণের সঙ্গীত সৃষ্টিতে অগ্রণী হয়েছিলেন এবং ভদ্রসমাজকে রঙ্গালয়ে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নাট্যসাহিত্য এবং নাটকের গানের উন্নতির জন্যও বাঙালী রবীন্দ্রনাথের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। গীতিনাট্য, প্রহসন, রূপক, এবং নৃত্যনাট্য প্রভৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতের কত বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেছেন এবং কত নতুন পথ নির্ণয় করেছেন যা অবলম্বন করে আমরা এখনও অগ্রসর হচ্ছি। কথিকার সঙ্গে নৃত্য এবং গীত যা রবীন্দ্রনাথ শাপমোচনে অনুষ্ঠান করে দেখিয়ে দিলেন তা আজ আমাদের একটি প্রধান রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বেতারের সঙ্গীতালেখ্যগুলি তো এই নিয়মেই রচিত হয়ে চলেছে। নৃত্যনাট্যের আদর্শে আজ বহুগোষ্ঠী বহুভাবে সার্থকতার সঙ্গে নতুন অভিনয়াদি পরিকল্পনা করে প্রশংসা অর্জন করছেন।

সেকালে সঙ্গীত ছিল বহির্বাটিকার বস্তু। বহিরঙ্গের সঙ্গেই চলত সঙ্গীতানুষ্ঠান। পরিবারের অন্তরঙ্গের সঙ্গে রস আস্বাদনের মত সঙ্গীত কমই ছিল—এমন কি ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। অথচ বাঙালী সমাজ সঙ্গীতে অনভিজ্ঞ ছিল না। ধ্রুপদ খেয়ালে তাদের দখলও ছিল যথেষ্ট; কিন্তু ব্যাপারটা ছিল এই যে একদিকে ছিল এইসব বড় বড় হিন্দীগান অপর দিকে ছিল লোকসঙ্গীত—মাঝামাঝি টপ্পা, পাঁচালী, কবি, যাত্রার যেসব গান ছিল তাকে উপভোগ করা গেলেও ঘরে আনা যেত না। অর্থাৎ ভদ্রসমাজের উপযোগী কাব্যসঙ্গীতের একান্ত অভাব ছিল—এইটা আসল কথা। রবীন্দ্রনাথের পরিবার অন্যান্য ব্যাপারের মত সঙ্গীতেও ছিলেন ব্যতিক্রম। কবি বাল্যকাল থেকে নানারকম গানের আবহাওয়াতেই মানুষ হয়েছিলেন এবং সে গানে

সদর অন্দর উভয়দিক থেকেই প্রেরণা পেয়েছিলেন। স্বাভাবিক জীবনে সঙ্গীত যে কতখানি প্রয়োজনীয় বস্তু তা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি অল্পবয়স থেকে যে গান রচনায় হাত দিলেন তা আমাদের সমাজের দৈনন্দিন জীবনের গান। তাঁর গানে আমাদের-প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র অনুভূতি, প্রকৃতির অপরূপ লীলা, উৎসব, অনুষ্ঠানাদির আনন্দ, প্রবহমান জীবনের চিরন্তন সুখ দুঃখ—সবই একান্ত অন্তরঙ্গভাবে দেখা দিল। তাঁর সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনের একটা পরম প্রকাশ ঘটল। এর অপরিসীম মূল্য।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকে শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় প্রবহমান ব্যাপক জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত করে গেছেন। এক সময় যখন ছেলে মেয়েদের গান শেখা একেবারে বারণ ছিল, তখন তিনি নিত্যকার শিক্ষা-পাঠের মধ্যে সঙ্গীতের ব্যবস্থা করলেন। ষড়ঋতুর প্রত্যেকটির পদক্ষেপে তিনি যে আনন্দ অনুভব করতেন তার অনুভূতি জাগিয়ে দিতেন কিশোর সমাজে তাঁর গানের মধ্য দিয়ে। এই যে আজকাল নানা অনুষ্ঠানে সম্মেলক গান দিয়ে আরম্ভ এবং পরিসমাপ্তি ঘটে—এরও মূলে আছেন রবীন্দ্রনাথ। সম্মেলক গানের যে একটি গভীর আনন্দ এবং মাধুর্য আছে এর পরিচয় আমরা নিবিড়ভাবে পাই রবীন্দ্রপ্রবর্তিত সমবেতকণ্ঠের গীতানুষ্ঠানে। দিনেন্দ্রনাথ যখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে সম্মেলক গীতানুষ্ঠান করতেন তখন যে কী অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি হত তার পরিচয় বহু অনুষ্ঠানে কলকাতার অধিবাসীরাও পেয়েছেন।

সামাজিক জীবনে রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে যে পরিস্থিতি ছিল তার নাটকীয় পরিবর্তন ঘটেছে। এক সময় গানকে শিক্ষিত ভদ্রসমাজ দেখতেন সন্দেহ অথবা ভয়ের চোখে আর আজ সঙ্গীতকে দেখা হয় আগ্রহের চোখে। ছেলে মেয়েরা গান শিখবে না বা অনুষ্ঠানাদিতে সঙ্গীত হবে না—এটা ভাবতেও আমাদের এখন কষ্ট হয়। সঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের শ্রদ্ধা জেগেছে। এখন আমরা কাব্যসঙ্গীতকে যেভাবে সমাদর করি লোকসঙ্গীতকেও তদপেক্ষা কম করি না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে লোকসঙ্গীতকে বিপুলভাবে গ্রহণ করে এদিকেও আমাদের চেতনা জাগ্রত করে দিয়ে গেছেন। আজকে যে একটা সঙ্গীত সাহিত্য গড়ে উঠেছে এর প্রেরণাও এসেছে রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। মিলিতভাবে আমাদের সঙ্গীতের মূল্যায়ণে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁর পুর্বে সেভাবে কেহই অগ্রসর হবার পরিকল্পনা করেন নি। কিছু কিঞ্চিৎ যে লেখা হয়েছিল সেটা অস্বীকার করি না কিন্তু কবির মানবিক সামীপ্যের সঙ্গে তার তুলনা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ যে উদাহরণ স্থাপন করে গেছেন বাঙালীর জীবনে তা যতটুকু

স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাতে আমরা বুঝতে পারছি অবস্থা নির্বিশেষে সঙ্গীত আমাদের মনকে কতখানি শান্তিতে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দিতে সক্ষম। এই বিশ্বসংসারের বিচিত্র আকর্ষণে মানুষকে নানাদিকে যেতে হবেই। এই পরিভ্রমণে সুখ, দুঃখ, আনন্দ, বেদনার বিভিন্ন অনুভূতি আমাদের স্থৈর্য্যে নিরন্তর আঘাত করছে। এই আঘাতের বিশৃঙ্খলাকে প্রকৃতি তার নিপুণ হাতে নিয়মিত করে চলেছে আমাদের চিত্তের সমতাকে রক্ষা করছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ঠিক এই ভাবেই আমাদের নিত্যকার জীবনধারায় অমৃতপ্রবাহকে যোগ করে চিত্তকে সরস করে তুলছে—আমাদের জীবনকে রসহীন বিচ্যুতি থেকে শান্ত, স্নিগ্ধ, আনন্দময় পরিবেশে উত্তীর্ণ করে দিচ্ছে।

রবীন্দ্রসাধনায় সংগীত ও নৃত্য

শান্তিদেব ঘোষ

গুরুদেবের জীবন জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের একটি সামঞ্জস্যময় পরিপূর্ণ জীবন। বিচিত্র ধারায় এই জীবন প্রকাশিত। গান, নাচ ও অভিনয় হল তাঁর সেই প্রকাশের কয়টি অঙ্গ মাত্র। তিনি যেমন গীতকার, নবনৃত্য আন্দোলনের প্রবর্তক, নাট্যকার, তেমনি তিনি কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্, আধ্যাত্মসাধনের সাধক, দেশপ্রেমিক বা মানবপ্রেমিক কর্মী ও চিত্রকর। প্রত্যেক দিকেই তিনি নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করে গেছেন যে, বহু যুগ পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বাঙলা দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিরাজ করবে। ভারত-বর্ষের ইতিহাসে আর একজনেরও সন্ধান পাওয়া যায় না যিনি গুরুদেবের মত একাধারে এত দিক থেকে জীবনকে সার্থকতার সঙ্গে প্রকাশ করে যেতে পেরেছেন।

যুগে যুগে আমাদের দেশে নানা স্তরের সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের উৎপত্তি ও বিস্তার লাভ করেছে একটি বিশেষ-সামাজিক প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে। সেটি হল মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ঝগড়া বিবাদ, ঈর্ষা বিদ্বেষ, কৃপণতা, স্বার্থপরতা, লোভ ও ভোগের লালসা থেকে মানুষের চিত্তকে মুক্ত হতে উদ্বোধিত করা। চিত্তে এমন একটি ঔদার্যের সৃষ্টি করা, যাতে করে আসবে অন্তঃকরণে শান্তি, আসবে আত্মসংযম এবং মনে মৈত্রীভাবের সঞ্চার হয়ে প্রত্যেক অবস্থাকেই করবে কল্যাণময়। তার থেকেই প্রকাশিত হবে সভ্যতার যথার্থ স্বরূপ। যাঁরা একথা একদিন চিন্তা করেছিলেন, যাঁরা এ পথে— কাজের দ্বারা আদর্শ স্থাপন করেছিলেন তাঁদের অনেকেরই নাম ও পরিচয় আমরা জানি না, জানবার কোন উপায়ও নেই। কিন্তু ফল আজও ভোগ করছে ভারতের বিভিন্ন স্তরের সমাজ। পল্লী অঞ্চলের নানা স্তরের দলবদ্ধ সংগীত ও নৃত্যের মধ্যে কি আজও আমরা তার পরিচয় পাচ্ছি না? এর প্রচলন কবে হয়েছিল, কার দ্বারা হয়েছিল তার কি কেউ খবর জানে বা রাখে। কিন্তু আজও আমরা দেখছি এই সব সমবেত সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে মানুষ চাইছে জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে; মানুষের সমষ্টি যে সমাজ সেও চাইছে নিজেকে সুন্দর করে প্রকাশ করতে। সমাজের সুন্দর হওয়ার অর্থ— বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা, নানা বিপরীত গামী মনোবৃত্তিকে একটি ছন্দোময় শৃঙ্খলার আনন্দে গ্রথিত করা। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, সংগীত ও নৃত্যাদি কলা ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানব সমাজে অতি আবশ্যক বিষয় বলে গণ্য হলেও জ্ঞান কর্মের জীবনের প্রতি ভারতীয়দের দৃষ্টি যে ছিল না তা নয়।

সে পথে প্রাচীন ভারতের সামগ্রিক অগ্রগতির কথা আমরা সকলেই জানি, তাই তার পুনরুক্তির প্রয়োজন বোধ করি না। ধীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, প্রাচীনেরা জ্ঞান, কর্ম ও আনন্দের সুষ্ঠু সামঞ্জস্যের দ্বারাই সমাজের উন্নতির কথা ভেবেছিলেন এবং সেই আদর্শ সামনে রেখে মানুষ পরিপূর্ণ জীবনের পথে অগ্রসর হোক, তাই চেয়েছিলেন। এ যুগে গুরুদেবের জীবন ছিল সেইরূপ পরিপূর্ণতার একটি আদর্শ প্রতীক এবং তিনি ছিলেন এ যুগে এইরূপ একটি সাধনার আদর্শ সাধক। গুরুদেবের এই সাধনার পিছনে একটি ইতিহাস আছে। সেটিও আমাদের জানা দরকার।

অবশ্যই গুরুদেব জন্মেছিলেন ঈশ্বরদত্ত বিশেষ একটি ক্ষমতার অধিকার নিয়ে। কিন্তু তাঁর সেই শক্তিকে ঠিক পথে চালিত করেছিল বাড়ির একটি প্রাণবান অনুকূল আবহাওয়া। যাকে গুরুদেব বলতেন পরিপূর্ণ জীবনের আবহাওয়া। মনে হবে যেন গুরুদেবকে এই আদর্শে গড়ে তোলবার জন্যই তার জন্মকালে ঐ আবহাওয়াটিকে কেউ ইচ্ছে করেই রচনা করে রেখেছিলেন। এর কথা বলতে গিয়ে এক প্রবন্ধে গুরুদেব লিখছেন :

"আমাদের পরিবারে পরীক্ষা পাসের সাধনা সেদিন গৌরব পায় নি। তার ফল হয়েছিল এই যে ডিগ্রিলাঞ্ছিত শিক্ষা ছাড়া শিক্ষার আর কোনো পরিচয় গ্রাহ্য নয়, এই অন্ধ সংস্কারটা আমাদের ঘরে থাকতেই পারেনি। আমার ভাইরা দিনরাত নিজের ভাষায় তত্ত্বালোচনা করেছেন, কাব্যরস আস্বাদনে ও উদ্ভাবনে তাঁরা ছিলেন নিবিষ্ট, চিত্রকলাও ইতস্তত অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে, তার উপরে নাট্যাভিনয়ে কারো কোনো সংকোচ মাত্র ছিল না। আর সমস্ত ছাড়িয়ে উঠেছিল সংগীত। বাঙালীর স্বাভাবিক গীতমুগ্ধতাও কোনো বাধা না পেয়ে আমাদের ঘরে যেন উৎসের মত উৎসারিত হয়েছিল। বিষ্ণু ছিলেন ধ্রুপদী গানের বিখ্যাত গায়ক। শুনেছি সকালে সন্ধ্যায় উৎসবে আনন্দে, উপাসনা মন্দিরে তাঁর গান, ঘরে ঘরে আমার আত্মীয়েরা তম্বুরা কাঁধে নিয়ে তাঁর কাছে গান চর্চা করেছেন, আমার দাদারা তানসেন প্রভৃতি গুণীর রচিত গানগুলি আমন্ত্রণ করেছেন—বাংলা ভাষায়। এর মধ্যে বিস্ময়ের ব্যাপার এই চিরাভ্যস্ত সেই সব প্রাচীন গানের নিবিড় আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও তাঁরা আপন মনে যে সব গান রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন তার রূপ, তার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গান বাজনা নাট্যকলাকে অক্ষুণ্ণ সম্মান দেবার যে দীক্ষা পেয়েছিলাম তার একটা বিশেষ পরিচয় দিই। আমার ভাইঝিরা শিশুকাল থেকে উচ্চ-অঙ্গের গান বিশেষ যত্নে শিখেছিলেন। সেটা তখনকার দিনে নিন্দা না হলেও বিস্ময়ের বিষয় ছিল। আমাদের বাড়ির প্রাঙ্গণে প্রকাশ্য নাট্যমঞ্চে তাঁরা যেদিন গান গেয়েছিলেন সেদিন সামাজিক হাওয়া ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিল। এই জাতীয় অত্যাচার আরো ঘটেছিল। এর চেয়ে উচ্চ সপ্তকে নিন্দা পেয়েও

সঙ্কোচ বোধ করিনি। তার কারণ কেবল মাত্র কলেজি বিদ্যাকে নয়, সকল বিদ্যাকেই শ্রদ্ধা করবার অভ্যাস আমাদের পরিবারে প্রচলিত ছিল।" এইরূপ একটি পরিপূর্ণ জীবনের আবহাওয়ার প্রভাবে তিনি যে মানুষ হয়েছিলেন সে কথা পরিষ্কার ভাষায় বলে গেলেন এবং এও বললেন, "এটি আমার জীবনের খুব বড় কথা।"

পিতৃদেবের আধ্যাত্মিক জীবন ও বাড়ির এই আবহাওয়ায় গুরুদেব যেভাবে বড় হয়ে উঠেছিলেন, দেশের বালক-বালিকারা সেই ভাবেই আনন্দের চর্চায় পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের পথে এগিয়ে যাক, এইরূপ একটি ভাবনা থেকেই তিনি শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় স্থাপন করলেন যা পরে বিশ্বভারতীতে পরিণত হয়েছে। শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যালয়ে কলা-বিদ্যার চর্চার চিন্তাকে সমাজ কিভাবে দেখেছে তার বিবরণ দিতে গিয়ে গুরুদেব বলেছেন—

"আমাদের দেশে বিদ্যাদানের ব্যবস্থায়—কলা-বিদ্যার কোন স্থান নেই। স্থান থাকার যে গুরুতর প্রয়োজন আছে সে বোধ পর্যন্ত আমাদের শিক্ষিত লোকের মন হতে চলে গেছে। বাল্যকাল হতেই আমাদের ভদ্র সম্প্রদায়ের লোকেরা কলা বিদ্যার সংস্রব হতে দূরে থাকেন। এতে দেশের যে কত বড় ক্ষতি হচ্ছে তা অনুভব করবার শক্তি পর্যন্ত তাঁরা হারিয়ে ফেলেন।" গুরুদেবের মতে "আনন্দ প্রকাশ—জীবনী শক্তির প্রবলতারই প্রকাশ"। এই বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়েই তিনি বিশ্বভারতীর স্কুল ও কলেজের নানা প্রকার শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের চর্চার ব্যবস্থা করলেন। বিশ্বভারতীতে ছাত্র ছাত্রীর আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা বা সন্ন্যাসের সাধনার পথ তিনি খুলতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন বালক-বালিকাদের চিত্তকে পূর্ণ বিকাশের পথে চালিত করতে। যে জন্যে সকল রকমের শিল্প-কলা, নৃত্য, গীত-বাদ্য, নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে মানব হিত সাধনের শিক্ষা এবং চর্চারও বিশেষ আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষার এই আদর্শের প্রতি গভীর বিশ্বাসবশত বিশ্বভারতীতে কর্মের ও শিক্ষকতার জটিলতায় বাস করেও নানা ভাবের গান, নানা প্রকারের নাটক ও নৃত্যনাট্য রচনা করলেন জীবনের শেষ পর্যন্ত। নিজের অন্তরের তাগিদেই এগুলি রচিত হয়েছিল। কারণটি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন—

"আমি বিচিত্রের দূত। নাচি নাচাই, হাসি হাসাই, গান করি ছবি আঁকি, সে আবিঃ বিশ্বপ্রকাশের অহৈতুক আনন্দে অধীর আমরা তারই দূত। বিচিত্রের লীলাকে অন্তরে গ্রহণ করে তাকে বাইরে লীলায়িত করা—এই আমার কাজ। যে বিচিত্র বহু হয়ে খেলে বেড়ান দিকে দিকে সুরে গানে নৃত্যে চিত্রে, বর্ণে বর্ণে রূপে রূপে সুখ দুঃখের আঘাতে সংঘাতে, ভালোমন্দের দ্বন্দ্বে—তাঁর বিচিত্র রথের বাহনের কাজ আমি গ্রহণ

করেছি। এই আশ্রমের নীলাকাশ উদয়াস্তের প্রাঙ্গনে এই সুকুমার বালক বালিকাদের লীলা সহচর হতে চেয়েছিলাম। লীলাময়ের লীলার ছন্দ মিলিয়ে এই শিশুদের নাচিয়ে গাইয়ে, এদের চিত্তকে আনন্দে উদ্বোধিত করার চেষ্টাতেই আমার আনন্দ, আমার সার্থকতা।"

গুরুদেবের বাড়িতে বাল্যকালে নাচের কোন চর্চা ছিল বলে জানা যায় না। পেশাদারী বাইজীদের নাচ তিনি দেখেছেন কিন্তু মনে তার ছাপ যা পড়েছিল তা তার অনুকূল নয়। ১৭ বৎসর বয়সে প্রথম যখন তিনি বিলেতে পড়তে গেলেন তখন সে দেশের সামাজিক বল্ নাচ, তিনি শিখেছিলেন ও সেদেশের মহিলাদের সঙ্গে ভালোভাবেই নেচেছেন এ খবর আমরা গুরুদেবের লিখিত বর্ণনা থেকেই জানতে পাই। দেশে ফিরে সে নাচের চর্চা আর কাজে লাগেনি। কিন্তু মনের গভীরে সেদিনকার নাচের আনন্দটি সযত্নে লালিত হয়েছিল বলেই বোধ হয় পরবর্তী জীবনে নাচের প্রতি বাংলার শিক্ষিত সমাজের মনকে সাহসের সঙ্গে নৃত্যচর্চায় উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন। পূর্বে বাইনাচ বাঙালী সমাজে বিলাসের অঙ্গরূপে গৃহীত হয়েছিল বলে গুরুদেবের মনে তা কোনো দিনই সাড়া জাগায়নি। যৌবনে তিনি এ নাচের বিষয়ে মত প্রকাশ করে লিখছেন, এ হল "অলস নড়ে চড়ে বেড়ানোর" নাচ। বৃদ্ধ বয়সে বাইজীদের নাচের প্রতি তাঁর এই মতটিকে আরো পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করে বললেন—"আমাদের নর্তকী বাইজীদের আঁটা পায়জামার উপর অত্যন্ত জবড়জঙ্গ কাপড়ের অসৌষ্ঠব চিরদিন আমার ভারি কুশ্রী লেগেছে। তাদের প্রচুর গয়না ঘাগরা ওড়না ও অত্যন্ত ভারি দেহ মিলিয়ে প্রথমেই মনে হয় সাজানো একটা মস্ত বোঝা। তার পরে মাঝে মাঝে বাটা থেকে পান খাওয়া, অনুবর্তীদের সঙ্গে কথা কওয়া; ভুরু ও চোখের নানা প্রকার ভঙ্গিমা ধিক্কারজনক বলে বোধ হয়, নীতির দিক থেকে নয়, রীতির দিক থেকে।"

গুরুদেবের দৃষ্টিতে নাচ কিভাবে প্রতিভাত হয়েছিল সেটি বুঝতে পারলেই বাইজী নাচের প্রতি তাঁর এই বিরূপতা ও শান্তিনিকেতনের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে নাচকে অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয় হিসেবে গ্রহণের প্রকৃত কারণ প্রকাশিত হবে। তাঁর মতে :—

"নৃত্যকলার প্রথম ভূমিকা দেহ চাঞ্চল্যের অর্থহীন সুষমায়। তাতে কেবল ছন্দের আনন্দ।"

"আমাদের দেহ বহন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ভার, আর তাকে চালন করে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গতিবেগ, এই দুই বিপরীত পদার্থ যখন পরস্পর মিলনে লীলায়িত হয় তখন জাগে নাচ। দেহের ভারটাকে দেহের গতি নানা ভঙ্গিতে বিচিত্র করে,—জীবিকার প্রয়োজনে নয়,—সৃষ্টির অভিপ্রায়ে, দেহটাকে দেয়—চলমান শিল্পরূপ। তাকে বলি নৃত্য।"

"নৃত্যের কোনো একটি ভঙ্গীও স্থির হয়ে থাকে না, কেবলই তা নানা-খানা হয়ে উঠছে। তবু যে দেখছে সে আনন্দিত হয়ে বলছে, আমি নাচ দেখছি। নাচের সমস্ত অনিত্য ভঙ্গীই তালে মানে বাঁধা একটি নিরবচ্ছিন্ন সত্যকে প্রকাশ করছে। আমরা নাচের নানা ভঙ্গীকেই মুখ্য করে দেখছিনে, আমরা দেখছি তার সেই সত্যটিকে, তাই খুশী হয়ে উঠছি।"

মেয়েরা অঙ্গভঙ্গিমার লতানে রেখা দিয়ে গানের সুরের উপর নক্‌শা কাটতে থাকে। মনে মনে ভাবি এর অর্থটা কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ ধরা, ছেঁড়া-খোঁড়া, কাটা কুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সঙ্গতি কোথায়। যারা লোকহিত ব্রত-পরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব সংসারে দুঃখ দৈন্য শ্রীহীনতার অন্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন? তারা জানে "দরিদ্র নারায়ণ" তো নাচ শেখেনি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলই ছটফট করে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভুলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্যটাই যদি একান্ত সত্য হতো তাহলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগতো না, এটাকে পাগলামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই সুসম্পূর্ণ রূপলীলাটি যখন দেখি তখন মন বলতে থাকে এই জিনিসটি অত্যন্ত সত্য—ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছিন্ন ভাবে চারিদিকে যা চোখে পড়তে থাকে তার চেয়ে অনেক গভীর ভাবে নিবিড়ভাবে।—অঙ্গে অঙ্গে যখন নাচ দেখা দিল তখন ঐ ময়লা ছেড়া পর্দাটার এক কোনা উঠে গেল—"দরিদ্র নারায়ণ"কে হঠাৎ দেখা গেল বৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠে, লক্ষ্মীর পাশে।"

গুরুদেবের কাছে নাচ মর্যাদা পেয়েছিল দেহের চলমান—একটি উচ্চতর শিল্পরূপে। তাঁর মনকে আমোদিত করেছে ছন্দের আনন্দে। এতে পেয়েছেন জীবিকার প্রয়োজন-হীন সৃষ্টির আনন্দ। এই কারণেই বিনা সঙ্কোচে শান্তিনিকেতনে গড়ে তুলতে পেরেছিলেন নাচের একটি প্রাণবান আন্দোলন। শান্তিনিকেতনের পরিপূর্ণ জীবনের শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তা যেভাবে সফল হয়েছিল—তার প্রতি লক্ষ্য করে গুরুদেব বলেছেন,

"আমি পূর্বদেশের নানা স্থানে বেড়াবার কালে নৃত্যকলা দেখবার সুযোগ পেয়েছি। জাভায়, বালীতে, শ্যামে, চীনে, জাপানে, আমাদের দেশে কোচিন-মালবার-মণিপুরে। য়ুরোপের ফোক্ ডান্স এবং অন্যান্য নাচের সঙ্গে আমি পরিচিত। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা আছে, বলবার অধিকার আছে। এই কথা আপনাদের বলতে দ্বিধা করব না যে, আমাদের আশ্রমে নৃত্যকলার ভিতরে সকল ধারা মিশেছে, তার পিছনে যে সাধনা যে শিল্পবোধ রয়েছে এবং সমগ্রের সৌন্দর্য-বিকাশ আছে তা যে-কোনোখানেই দুর্লভ।"

গুরুদেবের বৈচিত্র্যময়-জীবনের কেবলমাত্র গানের দিকটিকে নিয়ে পৃথকভাবে একটু আলোচনা করতে চাই। তাঁর এই জীবনটির কথা যখন ভাবি তখন প্রথমেই আমার যে কথা মনে পড়ে তা হল ভারতীয় সাধনার যে ধারা যুগে যুগে বড় বড় সঙ্গীত সাধকদের সৃষ্টি করে ভারতীয় সঙ্গীতকে বিচিত্র পথে ও বিচিত্র বাক বিস্তারিত ও রঞ্জিত করেছে গুরুদেব হলেন সেই ধারারই বর্তমান শতাব্দীর একমাত্র সফল সাধক। সেই সাধনার ধারা এ যুগে তাঁর মধ্য দিয়ে অভিনব বৈচিত্র্য বিকাশ লাভ করেছে। তাই তিনি এত সহজে বলে যেতে পেরেছিলেন,

"গান লিখতে যেমন আমার নিবিড় আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না, এমন নেশা ধরে যে, তখন গুরুতর কাজের গুরুত্ব একেবারে চলে যায়, বড়ো বড়ো দায়িত্বের ভারাকর্ষণটা হঠাৎ লোপ পায়, কর্তব্যের দাবিগুলোকে মন একধার থেকে নামঞ্জুর করে দেয়।"

সেই আনন্দের গভীরতা যে কতখানি সে কথা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, "গানের সুরের আলোয় এতক্ষণে সত্যকে দেখলুম। অন্তরে সর্বদা এই গানের দৃষ্টি থাকে না বলেই সত্য তুচ্ছ হয়ে সরে যায়। সুরের বাহন সেই পর্দার আড়ালে সত্যলোকে আমাদের নিয়ে যায়, সেখানে পায়ে হেঁটে যাওয়া যায় না, সেখানে যাবার পথ কেউ চোখে দেখিনি।"

সঙ্গীতের সাধনায় তিনি এই স্তরে উঠতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর মন পেয়েছিল গানের ক্ষেত্রে উচ্চনীচ ভেদ থেকে মুক্তি। গানের উচ্চনীচ সব ধারাই তাঁর কাছে সহজে স্থান পেল। যে কারণে উচ্চাঙ্গের ভারতীয় সংগীত তাঁর কাছে যে আদর পেয়েছে সেই একই আদরে তিনি গ্রহণ করেছেন বাংলার সহজ সরল লোক সংগীতকে। অধ্যাত্ম সাধনায় বাংলাদেশে সহজিয়া সাধনার প্রাধান্য যেমন দেখা গেছে, গুরুদেবের গান সেইরূপ সহজ সাধনারই একটি বশেষ রূপ। এইজন্য তাঁর গানে উচ্চ নীচ নেই, সব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়েছে।

আমাদের দেশের পূর্ববর্তী সংগীত সাধকদের জীবনের সঙ্গে তুলনা করে দেখতে গেলে হয়তো গুরুদেবকে একই শ্রেণীতে ফেলতে অনেকেই দ্বিধা করবেন। গুরুদেব ভগবানের উদ্দেশে পূজা, প্রেম ও ভক্তির গান লিখলেও তাঁর বিচিত্র জটিল বাস্তব কর্মজীবন ও গানের বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্যই হয়তো এই দ্বিধার কারণ। গুরুদেব পূর্ববর্তীদের মত এক পথে যে চলেননি, তা ঠিক। তাঁর সাধনার পথ ছিল ভিন্ন কিন্তু উদ্দেশ্য এক। তিনি অন্য ক্ষেত্রে তাঁর জীবনের মূল লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে কাব্যের ছন্দে বলেছিলেন, "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে লভিব মুক্তির স্বাদ।" এই

আদর্শের উপর ভিত্তি করেই তাঁর পরিপূর্ণ জীবনটি দাঁড়িয়ে আছে। তাই গানের জীবনে পূজার গান অপর্যাপ্ত রচনা করেও লৌকিক প্রেম, প্রকৃতি স্বদেশ ও বিচিত্র পর্যায়ে নানা ভাবের ও রসের গান লিখে গেলেন। মনে হবে মানুষের জীবনের সব অবস্থাকেই যে সংগীতময় করে তোলা যায়—তিনি যেন সেই কথাই প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। আকাশ-ভরা সূর্য তারা, বিশ্বভরা প্রাণের মধ্যে তাঁর নিজেরও একটি বিশেষ স্থান আছে সে কথা তিনি অনুভব করে যেমন বিস্মিত হচ্ছেন, আবার এই ধরণীর মাটি, তার ঘাস, শালের বন, রাঙা মাটির রাস্তা, হাটের পথিক, ধুলোয় বসে ছোট মেয়ের খেলা, ছোট ছেলেদের চোখের চাওয়া, গাঁয়ের আকাশ তাঁর কাছে এক অপূর্ব সুধায় পরিণত হয়েছে। সে সুধায় তিনি কুল কিনারা পাচ্ছেন না। যাকে আমরা তুচ্ছ করে দেখি, গানের দৃষ্টিতে তা তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে অনেক মূল্যবান। সর্বব্যাপী সংগীতের সাধনায় এইরূপ সার্থক পরিচয় এদেশে দুর্লভ। এই কারণে সুরকার ও সংগীতকার শব্দ দুটিকে আমরা যে অর্থে সচরাচর ব্যবহার করি, গুরুদেবের সংগীত জীবনকে ঠিক সেই অর্থে দেখলে তাঁর প্রতি যে ন্যায় বিচার করা হবে একথা আমি মনে করি না।

গুরুদেবের পরিপূর্ণ জীবনের এই আদর্শটিকে দেশবাসী এখনো সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারেনি। এখনো গান, নাচ ও নাটকের অভিনয় দেশের শিক্ষিত সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু হয়ে ওঠেনি।

শান্তিনিকেতনে অন্যান্য সাধারণ বিদ্যালয়ের মত লেখাপড়া শেখানো হয়েছে এবং আজও হচ্ছে রুটিন ও সিলেবাস্-এর সাহায্যে পরীক্ষা পাসের জন্য। এই পদ্ধতি তাঁকে মেনে নিতে হয়েছে এ যুগের মধ্যবিত্ত চাকুরিজীবী সমাজের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে। কিন্তু এইটিকেই শিক্ষাদানের একমাত্র পথ বলে তিনি কোন দিনই মনে করতেন না। রুটিন ও সিলেবাস ছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষার অনুকূল একটি আবহাওয়া তৈরী করে তার সহায়তায় শিক্ষাদান করার তিনি ছিলেন বিশেষ পক্ষপাতী, এই কথাটিকে তিনি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলেছেন—

"ছাত্রদের শিক্ষাকাল তাহাদের পক্ষে মানসিক ভ্রূণ-অবস্থা। এই সময়ে তাহারা জ্ঞানের একটি সজীব বেষ্টনের মধ্যে দিনরাত্রি মনের খোরাকের মধ্যেই বাস করিয়া বাহিরের সমস্ত বিভ্রান্তি হইতে দূরে গোপনে যাপন করিবে; ইহাই স্বাভাবিক বিধান। এই সময়ে চতুর্দিকে সমস্তই তাহাদের অনুকূল হওয়া চাই, যাহাতে তাহাদের মনের একমাত্র কাজ হয় জানিয়া এবং না জানিয়া খাদ্য শোষণ, শক্তি সঞ্চয় এবং নিজের পুষ্টি সাধন করা।"

এই উক্তিটি তাঁর কবিজনোচিত নয়। এই চিন্তা তাঁর মনে উদয় হওয়ার প্রকৃত

কারণ হল, বাল্য ও কৈশোর জীবনের বাড়ির আবহাওয়া। যার প্রভাবে বিদ্যালয়ে রুটিন ও সিলেবাস্-এর পাঠ না নিয়েও তিনি সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত, অভিনয় ইত্যাদি নানা দিক থেকে সহজেই নিজের শক্তিকে বিকশিত করতে পেরেছিলেন। প্রাচীন ভারতের তপোবনের শিক্ষার আদর্শের মধ্যেও তাঁর এই চিন্তার সমর্থন যে তিনি পেয়েছিলেন সে কথাও আমরা তাঁর বহু লেখার সাহায্যে জানতে পাই। উপযুক্ত উভয় কারণেই তিনি শান্তিনিকেতনে অনুকূল আবহাওয়া রচনার দ্বারা শিক্ষাকে প্রধান স্থান দিতে সাহসী হয়েছিলেন। এবং এই আদর্শে শিক্ষকতার কাজের অভিজ্ঞতা থেকে দৃঢ় ভাষায় বলেছিলেন—

"I must say a few more words about a most important item of my educational endeavour, children have their active sub-conscious mind which, like the tree, has the power to gather its food from the surrounding atmosphere. For them the atmosphere is a great deal more important that rules and methods, building appliances class teachings and test books. I tried to create an atmosphere in my institution, giving it the principal place in our programme of teaching."

শান্তিনিকেতনে বা বিশ্বভারতীতে গুরুদেব সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে হুবহু কাজ করতে না পারলেও নানা জ্ঞান, সাহিত্য, কাব্য ও বিভিন্ন কলাচর্চার ক্ষেত্রে তাকে যথেষ্ট পরিমাণে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন এবং তার দ্বারা কাজও পেয়েছিলেন কল্পনাতীত। এখানে সংগীত, নৃত্য ও অভিনয় কলার চর্চার প্রধান অবলম্বন হল অনুকূল আবহাওয়া। এখাকার সমাজ জীবনে বাস করে এর প্রভাব এড়ানো প্রায় অসম্ভব। যদিও এখানে সংগীত ও নৃত্যের ক্লাস হয় রুটিন ও সিলেবাস্ এর সাহায্যে কিন্তু আসল শিক্ষা দিচ্ছে এখানকার আবহাওয়া। ঐ আবহাওয়াটিকে গুরুদেব নিজে রচনা করে গিয়েছিলেন এখানকার সারা বৎসরের বিচিত্র উৎসব, উপাসনা, বৈতালিক ও নানাপ্রকার সভাসমিতির দ্বারা। এই সবের কার্য্যসূচীর একটি প্রধান অংশ হল—উপযোগী গান। বৎসরের কতকগুলি উৎসবের অবশ্য করণীয় বিষয় হল নাচ ও অভিনয়। গানের সঙ্গে এখানকার বিভিন্ন বিভাগের ছাত্র ছাত্রী কোন না কোন ভাবে এর সঙ্গে জড়িত থাকে। একদল যখন মহড়া দেয়, অন্যেরা উৎসুক হয়ে সে মহড়া দেখছে দিনের পর দিন। এই সব অনুষ্ঠানাদিতে নৃত্যগীত অভিনয়ে যারা অংশ নেয় সেই ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে সংখ্যায় অধিকাংশই হল যারা কেবলমাত্র নৃত্যগীতের শিক্ষার জন্য আসেনি। তারা এসেছে স্কুল কলেজের পরীক্ষায় পাস করার উদ্দেশ্যে। নৃত্য,

গীত ও অভিনয়ের বিকাশে—গুরুদেব শান্তিনিকেতনে যা কিছু করে গেছেন তার বেশীর ভাগ কৃতিত্ব এই দলের ছাত্র-ছাত্রীদের। এ যুগের নব নৃত্যান্দোলনে গুরুদেবের প্রধান সহায় এই সব ছাত্র-ছাত্রীর দল। এর জন্যে তাদের যতটুকু শেখাতে হয়েছে, তা রুটিন ও সিলেবাস্-এর সাহায্যে পরীক্ষা পাস করানোর মত নীরস শিক্ষা নয়। সে শিক্ষা তারা গ্রহণ করেছে আনন্দের সঙ্গে অতি সহজে। বড়দের গান, নাচ ও অভিনয়—দেখে ছোটরাও তার অনুকরণের চেষ্টা করছে প্রবলভাবে নিজেদের মধ্যে। পরে বড়দের অবর্তমানে তারাই সে স্থান পূর্ণ করেছে। ছাত্র হিসেবে বাস করে ও বড় হয়ে, কর্মিরূপে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গত তিরিশ বছরের উপর কাজ করে দেখেছি যে, এখানে ঐ সব কলা চর্চার মূল প্রেরণা হচ্ছে নিজেকে আনন্দিত করা। একই সঙ্গে সকলে মিলে আনন্দ উপভোগ করা। এখানকার ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক সমাজ নিজের চেষ্টায় নিজেদের প্রয়োজনে ঐসব কলার সাহায্যে আনন্দের আবেষ্টন তৈরি করছে। এই পথটি এখানকার শিক্ষায় গুরুদেবের সবচেয়ে বড় দান। আর কোনো বিদ্যালয়ে কলাচর্চার এইরূপ একটি প্রাণবান আনন্দের আবহাওয়া দেখা যায় না। সেখানে কলাচর্চার প্রয়োজনীয় তাও এতখানি গভীরভাবে অনুভূত হয়নি। সেখানে অল্প সংখ্যক বালক-বালিকা, যুবক-যুবতীরা নানা কলার চর্চা করে, কিন্তু তাদের সেই চর্চার শেষ পরিণতি হল সমাজের যে বৃহৎ অংশ কলাচর্চাকে সামাজিক প্রয়োজনে আবশ্যক বলে গ্রহণ করে নি,—তাদের চিত্তবিনোদন করা।

রবীন্দ্র প্রবর্তিত আদর্শে সংগীত, নৃত্য ও নাট্য চর্চায় আজ যাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন; তাদের ভাবতে হবে, গুরুদেব নৃত্য, গীত, অভিনয়কে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতেন, তাঁরা সেই পথে চলতে পারছেন কিনা এবং নানা জ্ঞান ও কর্মের চর্চার সঙ্গে আনন্দের চর্চার স্থান সমান হোক, তাঁর সেই ইচ্ছাকে তাঁরা সফল করে তুলতে কতটা সক্ষম হয়েছেন। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের সাধনায় যে আদর্শের উপর দাঁড়িয়ে গুরুদেব শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতীকে গড়ে তুলেছিলেন, তার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই দেশবাসীকে এগিয়ে যেতে হবে। দেশবাসীর কাছে তিনি যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা রেখে গিয়েছেন, তাঁর জন্ম শতবার্ষিকী পূর্তি উৎসবে সেইটি হোক আমাদের সঙ্কল্প বাক্য। তিনি বলেছেন—

"মানুষ কেবল বৈজ্ঞানিক সত্যকে আবিষ্কার করেনি, অনির্বচনীয়কে উপলব্ধি করেছে। আদিকাল থেকে মানুষের সেই প্রকাশের দান প্রভূত ও মহার্ঘ। পূর্ণতার আবির্ভাব মানুষ যেখানেই দেখেছে, কথায়, সুরে, রেখায়, বর্ণে, ছন্দে, মানবসম্বন্ধের মাধুর্যে, বীর্যে, সেইখানেই সে আপন আনন্দের সাক্ষ্যকে অমর বাণীতে স্বাক্ষরিত

করেছে, শিক্ষার্থী যারা, তারা সেই বাণী থেকে বঞ্চিত না হোক, এই কামনা করি; শুধু উপভোগ করবার উদ্দেশ্যে নয়, জগতে জন্মগ্রহণ করে, সুন্দরকে দেখেছি, মহৎকে পেয়েছি, ভালোবেসেছি ভালোবাসার ধনকে, এই কথাটি মানুষকে জানিয়ে যাবার অধিকার ও শক্তি দান করতে পারে, এমন শিক্ষার সুযোগ পেয়ে দেশ ধন্য হোক, দেশের সুখ দুঃখ, আশা আকাঙ্ক্ষা অমৃত অভিষিক্ত গীতলোকে অমরত্ব লাভ করুক।"

আধুনিক যুগ ও রবীন্দ্রনাথ

অন্নদাশঙ্কর রায়

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ প্রাচীনকালেও ছিল। সেই আলেকজাণ্ডারের সময় থেকেই কিংবা তারও আগে থেকে। মধ্যযুগে একটা ছেদ পড়ে যায়, কারণ স্থলপথ হয় বিপদসঙ্কুল। জলপথের সন্ধান একান্ত আবশ্যক হয়। এই কাজটি ভারতের দিক থেকে না হয়ে ইউরোপের দিক থেকে হয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ইউরোপ ভারতকে বহু শতকের পর আবার নতুন করে আবিষ্কার করে। ভারত আবিষ্কার করতে বেরিয়ে আমেরিকা আবিষ্কারও করে। তার ধারণা ছিল ওটাই ভারতবর্ষ। ওখানকার আদিবাসীরাই ভারতীয়।

এদিক থেকেও একটা পালটা আবিষ্কার বকেয়া ছিল। চার শতাব্দী পরে ভারতও করে জলপথে আবার নতুন করে ইউরোপ আবিষ্কার। রামমোহন রায় করেন ইংলণ্ডে পদার্পণ। সেই যে ইউরোপ আবিষ্কার সেটা শুধু ভৌগোলিক অর্থে নয়। তার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্যও ছিল। সেটা কেবল স্পেসের দিক থেকে নয়। টাইমের দিক থেকেও। ইউরোপ যখন জাহাজে করে ভারতে এলো তখন এলো আধুনিক যুগ থেকে মধ্যযুগে। আর ভারত যখন জাহাজে চড়ে ইউরোপে গেল তখন গেল মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে। রামমোহন রায় দেশে থাকতেই আধুনিক যুগের বার্তা পেয়েছিলেন। বিদেশে গিয়ে আধুনিক যুগের স্বরূপ দেখলেন। পশ্চিমকেও দেখতে পেলেন তার স্বস্থানে। কলকাতার ইংরেজকে দেখে ইউরোপের ইউরোপীয়কে চেনা সম্পূর্ণ হয় না। রামমোহনের জীবনে এই সম্পূর্ণতার প্রয়োজন ছিল।

একই কারণে মাইকেল মধুসূদনও যেতে ব্যাকুল হয়েছিলেন সে দেশে। এ ব্যাকুলতা ব্যাপকভাবে ছিল সেকালের শিক্ষিত ভারতীয়দের অন্তরে। কিন্তু অতি অল্পক্ষেত্রেই তৃপ্ত হয়েছিল। যাঁরা ইউরোপে যেতে পারেননি তাঁরাও আধা বিলিতী শহর কলকাতায় বসে বিলেতের সঙ্গে সংযোগ রেখেছিলেন। কিম্বা বম্বেতে বসে। কিম্বা মাদ্রাজে বসে। এগুলিও আধা বিলিতী শহর। বা সিকি বিলিতী শহর। এদের মধ্যে মাদ্রাজ যদিও জ্যেষ্ঠ তবু কলকাতাই শ্রেষ্ঠ। কারণ কলকাতা ছিল রাজধানী। কেবল বাংলার নয়, সারা ভারতের। ইংরেজ আমলের আগে হাজার বছর কেটেছে, পৌরাণিক মতে সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলিযুগের একাংশ। কিন্তু

ভারতের রাজধানী এর আগে কখনো ভারতের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্রের এত কাছে ছিল না। সমুদ্রের এক পারে লণ্ডন, আরেক পারে কলকাতা। মাঝখানে জাহাজ চলাচল। অবাধ যাতায়াত।

জাহাজ যখনি কলকাতায় ভিড়ত তখনি তার থেকে নামত আধুনিকতম বইপত্র, খবরের কাগজ, যন্ত্রপাতি, শিল্পদ্রব্য, সাজপোশাক, মনিহারি, অসংখ্য কৌতূহলপ্রদ সামগ্রী যা কস্মিনকালে ভারতে উৎপন্ন হয়নি বা হতো না। দেশ একটু একটু আধুনিক হয়ে উঠল। এবং কতক পরিমাণে পাশ্চাত্য। যেমন গথিক ধরণের গির্জায় বা কলোনিয়াল শৈলীর বাসভবনে। কলকাতার ধনী ও অভিজাতদের জীবনধারা ছুইখাতে প্রবাহিত হলো। একটি আধা হিন্দু আধা মোগলাই। অপরটি তৎকালীন অর্থে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। লাট বেলাটরা যে ধারার বাহক। মধ্যবিত্ত বলে আস্ত একটি শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। এঁরা হাফ শহুরে, হাফ গ্রাম্য। পরিবার পড়ে থাকে গ্রামে। এঁরা রোজগার করেন শহরে। মনটা মধ্যযুগে, চোখ দুটো আধুনিক যুগে। বুঝতে পারেন না ব্যাপারখানা কী। কারা সব এসেছে, কেন এসেছে, কী নিয়ে এসেছে, কী নিতে এসেছে। ওরা কি রাজা, না সওদাগর, না ধর্মপ্রচারক, না পণ্ডিত, না সৈনিক। সমুদ্রের ও-পারেও দেশ আছে? সে দেশও মাটির? গায়ের রং অমন কেন? ওরা কী ভাবে?

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন হলো। ইংরেজীর মাধ্যমে জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান হলো। নানা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে ছাপাখানার স্থচনা হয়েছিল। বাংলা হরফে ছেপে বই বেরোল, পত্রিকা বেরোল। যারা ইংরেজী ভালো জানে না তারা বাংলা পড়ে জগতের সঙ্গে যুক্ত হলো। ভারতও সে জগতের অন্তর্গত। তার আগে ভারত সম্বন্ধেই বা কে কতটুকু জানত! এমন কি বাংলাদেশ সম্বন্ধেও জানবার উপায় ছিল না তেমন। ঐ লোকমুখে শোনা বা স্বচক্ষে দেখা। সংস্কৃত বা আরবী শিখে সমসাময়িক বিষয়ে জ্ঞান লাভ হতো না। ফারসী শিখে যা হতো তাও হাতে লেখা ফারসী কেতাব পড়ে। সেও কতকালের পুরোনো। আধুনিক জগৎ তখনকার দিনের সংস্কৃত আরবী ফারসী ভাষার পরম বিদ্বানদেরও জ্ঞানগম্য ছিল না। অথচ একটি সাধারণ ইংরেজেরও ছিল। মানুষমাত্রেরই প্রাণে জ্ঞানের জন্যে আকুলতা আছে। গাছের প্রাণে যেমন আছে আলোর জন্যে আকুলতা। গাছকে যদি ঢেকে রাখা হয় তবে শুধু রস টেনে সে বাড়ে না। বেঁচে থাকতে পারে। এ দেশের মানুষ দীর্ঘকাল জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো পায়নি বলে বাড়েনি। পণ্ডিতরাও মাথায় খাটো বহরে বড়। তাঁদের মনটা পৌরাণিক। তাঁরা যে কোন্ যুগে বাস করছেন তাই তাঁরা জানতেন না। শুধু জানতেন যে সেটা

কলিযুগ। সুতরাং অবজ্ঞেয়। নেতৃত্ব অনায়াসেই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে চলে গেল। এরাই হলেন সমাজের ভ্যানগার্ড।

কলকাতা ভারতের রাজধানী না হলে কী হতো বলা যায় না, কিন্তু বারো মাস ত্রিশ দিন চব্বিশ ঘণ্টা ভারতশাসনের কেন্দ্রস্থলে বাস করে শিক্ষিত মানুষ হলো ভারত-মনস্ক। তার চেতনা যেমন একটা রেখা ধরে পুব থেকে পশ্চিমে যাতায়াত করতে থাকল তেমনি আর একটা রেখা ধরে ভারতবর্ষের বর্তমান থেকে সুদূর অতীতে। সে অতীত পুরাণ-পারাবারের ও-পারে উপনিষদ্ প্রান্তে অবস্থিত। যেমন সে পশ্চিম মহাসিন্ধুর ও পারে ব্রিটেন দ্বীপে আবর্তিত। মাঝখানে ইরান, আরব, তুরস্ক প্রভৃতি কত না দেশ। শিক্ষিত মানুষের সেসবে আগ্রহ নেই। মাঝখানে তেমনি কত না পুরাণ, কিংবদন্তী, মঙ্গলকাব্য। শিক্ষিত মানুষের তাতেও রুচি নেই। মাঝখানকার দেশকাল লঙ্ঘন করে তার চেতনা গিয়ে উপনীত হয় একদিকে উপনিষদ্ প্রান্তে, একদিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন প্রান্তে। রামমোহন রায় যেমন ইউরোপ পুনরাবিষ্কার করেন তেমনি উপনিষদ্ পুনরাবিষ্কার করেন। যেমন স্পেস অতিক্রম করেন তেমনি টাইম অতিক্রম করেন। সেই সময় থেকে শিক্ষিত মানুষমাত্রেই স্পেস টাইম সচেতন। দেশকাল সচেতন।

রামমোহন এর মধ্যে কোনো স্বতোবিরোধ দেখতে পাননি। নিজের জীবনে ও মননে তিনি একপ্রকার সামঞ্জস্য ঘটান। ভারতবর্ষের রেনেসাস ও রেফর্মেশন উভয়েরই তিনি সূত্রপাত করে যান। বাংলাদেশে ও তার বাইরে সারা ভারতে নবজাগরণের সাড়া পড়ে যায়। সমাজসংস্কারেরও ধুম পড়ে যায়। ধর্মেরও নবযুগ আসে। সাক্ষাৎভাবে না হোক পরোক্ষভাবে এটা তাঁর সেই সামঞ্জস্যের ক্রমবিকাশ। অর্থাৎ এর মধ্যে এমন কোনো কথা ছিল না যে ইউরোপকে ও আধুনিককে বর্জন করতে হবে আর কেবল ভারতের সনাতনকে সংরক্ষণ করতে হবে। কিন্তু শতাব্দী না ঘুরতেই বিরোধ দেখা দিল। অর্থনৈতিক বিরোধ থেকে রাজনৈতিক বিরোধ, রাজনৈতিক বিরোধ থেকে নৈতিক তথা সাংস্কৃতিক বিরোধ। মনে হলো পশ্চিমের সূর্য যে আলো দিচ্ছে সেটা আলো নয়, আলেয়া। আটলান্টিকের পার থেকে যে হাওয়া আসছে সেটা বসন্তের হাওয়া নয়, বসন্তরোগের হাওয়া। পশ্চিমদিকের দোর জানালা বন্ধ না করলে ভারতের সভ্যতা সংস্কৃতি সমাজ ধর্ম সুরুচি ও সুনীতি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। ভারতের আত্মা হারিয়ে যাবে।

সেই ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণীটারই এক ভাগ এই সময় হয়ে ওঠে রিয়ারগার্ড। অপর ভাগটার হাত থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নিতে চায়। ভ্যানগার্ডের ভাগ্য নির্ভর করে

ইংরেজের ঔদার্যের উপরে। সে যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শাসনের অংশ দেয়, শোষণ কমায়, তা হলে জোর গলায় বলতে পারা যাবে যে ন্যাশনালিজম, ডেমোক্রেসী, লিবারল মতবাদ, মানব প্রগতি ইত্যাদি কথার কথা নয়, কথা অনুসারে কাজও হচ্ছে, ইংলণ্ড এরই জন্যে ভারতে এসেছে। ভারত এরই জন্যে ইউরোপে গেছে। ইউরোপ একটা নতুন যুগের প্রতীক। ভারতের যুগান্তর ও রূপান্তর তাকেই আশ্রয় করে হবে।

কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার নিজের ঘরেই সঙ্কট ছায়া ফেলেছিল। অপরিমিত জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত শক্তি বৃদ্ধি হয়েছিল। অপরিমিত শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত ধনবৃদ্ধি হয়েছিল। অপরিমিত ধনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরিমিত জনবৃদ্ধি হয়েছিল। জ্ঞান আর শক্তি আর ধন এক শিবিরে। জন অন্য শিবিরে। ডিসরেলি বলেছিলেন ইংলণ্ড আসলে এক নেশন নয়, দুই নেশন; ধনীরা এক নেশন, দরিদ্ররা আরেক নেশন। শিল্পবিপ্লবের ফলে প্রত্যেকটি নেশন তলে তলে দুই নেশনে বিভক্ত হয়ে যায়। তেমনি এক নেশনের সঙ্গে অপর নেশনের শক্তি বৈষম্য ও ধনবৈষম্য বেড়ে যায় শিল্পবিপ্লবের আনুষঙ্গিক প্রতিযোগিতায়। ইংলণ্ড এগিয়ে গেলে জার্মানী রাগ করে, জার্মানী এগিয়ে গেলে ফ্রান্স ভয় পায়। রাশিয়া এগোতে চাইলে জার্মানী প্রমাদ গণে। ঘরে শূদ্র অতন্দ্র হয়ে উঠছে, বাইরে প্রতিবেশী রুদ্র হয়ে উঠছে। মহাযুদ্ধের প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবেরও জল্পনা কল্পনা চলছে। শতাব্দীর পূর্বাহ্ন যেমন আশান্বিত করেছিল শতাব্দীর সায়াহ্ন তেমনি আশঙ্কিত করে।

সুতরাং ইউরোপ নিজেই নিজেকে নিয়ে বিব্রত। ইউরোপীয় মনীষীরাই ইউরোপের কঠোরতম সমালোচক। রেনেসাঁসের সময় থেকেই ইউরোপে যেমন একটা মানবিক ধারা ছিল তেমনি ছিল একটা ধার্মিক ধারা। ধার্মিকরা রেনেসাঁসকে অন্তরের সঙ্গে-স্বীকার করেননি, কারণ বিজ্ঞান এসে তাঁদের চিরাচরিত জগৎ জিজ্ঞাসা ও জীবনদর্শন লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনচিন্তাকে তাঁরা দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। স্বাধীন বিশ্বাসের উপর তাঁরা খড়্গহস্ত। অপর পক্ষে মানবিকরা কোনো প্রকার ডগমা কিংবা অথরিটি মানবার পাত্র নন। তার চেয়ে আগুনে পুড়বেন। কারাগারে পচবেন। ইউরোপীয় সভ্যতা রেনেসাঁসের প্রসাদেই আধুনিক সভ্যতা হয়েছে। রেনেসাঁস উলটে দিলে তার আধুনিকতার স্রোত উজান বইবে। তাকে ফিরে যেতে হবে মধ্যযুগে। শিক্ষিত ইউরোপের যাঁরা ভ্যানগার্ড তাঁরা এ প্রস্তাবে রাজী হতে পারেন না। অথচ ফরাসী বিপ্লব দেখে তাঁদেরি কতক হলেন ক্রমে রিয়ারগার্ড। ফিরে চল রেনেসাঁসের পূর্বে! রাফেলের পূর্বে। ধনতন্ত্রের পূর্বে। ইউরোপ যখন ছিল সুন্দর। মানুষ যখন ছিল পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক।

ইউরোপের রেনেসাঁসের আদি পুরুষরাও মধ্যযুগকে লঙ্ঘন করে পাড়ি দিয়েছিলেন সুদূর গ্রীক যুগে। খ্রীষ্টানকে ডিঙিয়ে পেগান জীবনাদর্শে। গোড়ার দিকে তাঁরাও এর মধ্যে স্বতোবিরোধ লক্ষ করেননি। সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছেন। কিন্তু রেনেসাঁসের কিছু কাল পরে যে রেফর্মেশন এলো আর তার প্রতিক্রিয়ার যে কাউণ্টার রেফর্মেশন দেখা দিল সেটা ধর্ম ও সমাজঘটিত হলেও জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যদৃষ্টি নিয়ে ব্যাপারটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। সংস্কারকরা ছিলেন প্রতিমাপূজার শত্রু। যীশুর বা মেরীর মূর্তি তাঁরা সহ্য করবেন না। গির্জাকে মূর্তি দিয়ে তাঁরা সাজাবেন না। অথচ মূর্তিপূজাকে অবলম্বন করেই পরম সুন্দর হয়েছিল ইউরোপের মধ্যযুগের ভক্তিমার্গীয় আর্ট। এ ক্ষেত্রে কাউণ্টার রেফর্মেশন নিছক প্রতিক্রিয়া নয়। প্রোটেস্টাণ্টরা তেমন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেননি। পরে যাঁরা সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেন তাঁরা ধর্ম জিনিসটাকেই পরিহার করলেন। তাতে প্রোটেস্টাণ্টরা ক্যাথলিকদের উপর জয়ী হলেন না। জয়ী হলো সেকুলার মনোভাব।

আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভ্যানগার্ড থেকে যাঁরা বেরিয়ে গিয়ে রিয়ারগার্ড রচনা করলেন তাঁরা ইউরোপীয় সভ্যতার উপর দোষারোপ তো করলেনই, ভ্যানগার্ডকেও অব্যাহতি দিলেন না। ধর্ম আর সমাজ নিয়ে গভীর মতবিরোধ। তেমনি জীবনদর্শন ও সৌন্দর্যবোধ নিয়েও। সাকারবাদ থেকে যে সৌন্দর্য সারা ভারত জুড়ে সৃষ্টি হয়েছে নিরাকারবাদ থেকে তার তুলনায় কতটুকু হয়েছে? কেন আমাদের পিতৃ-পিতামহের মন্দিরে যাব না? কেন বঞ্চিত হব সৌন্দর্য থেকে? আমরা কি বাইরের লোক যে বাইরে থেকে দৃষ্টিপাত করেই তৃপ্ত হব? আরো গভীরে যেতে হবে। নইলে আর-একটা কোণার্ক আর-একটি নটরাজ গড়তে পারব না। তেমনি সংস্কৃত কাব্যে নিমগ্ন হতে হবে। নইলে আর-একখানি রামায়ণ বা মহাভারত হবে না। বর্জন যদি করতে হয় ইউরোপকে কর, রেনেসাঁসকে কর, রেফর্মেশনকে কর, কিন্তু পৌরাণিক হিন্দু ধর্মকে নয়, বর্ণাশ্রমী সমাজকে নয়, মধ্যযুগীয় জীবনযাত্রাকে নয়, কারু শিল্পকে নয়। ইংরেজ আমাদের অর্থনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে, গ্রামসংগঠন ধ্বংস করেছে, সভ্যতার গায়ে কুড়ুল মেরেছে। আমাদের ইংরেজী শিক্ষিত ভ্যানগার্ড তাতে সায় দিয়ে এবং পশ্চিমের অনুকরণে রেনেসাঁস ও রেফর্মেশন ঘটিয়ে এমন কী অর্জন করেছেন বা সৃষ্টি করেছেন যা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করতে পারে? কই, ইংরেজ তো যেয়ো দিচ্ছে না। স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে হলেও তো আত্মশক্তি চাই, তার উদ্বোধন চাই। সে কি শুধু কথায় হবে? তার জন্যে চাই বিপরীত মার্গ গ্রহণ। এ মার্গ বর্জন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের প্রেরণা ছিল পাশ্চাত্য তথা আধুনিক

সভ্যতাকে সহর্ষে গ্রহণ করার, সেই সঙ্গে ভারতের উপনিষদ্‌যুগের সভ্যতাকে সযত্নে ফিরিয়ে আনার। এবং উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধন করে উভয় তটে অবাধে গমনাগমন করার। সে সময় নব্য শিক্ষিতরা সকলেই একমত। দ্বিমত দেখা গেল শতাব্দীর শেষভাগে। পাশ্চাত্য তথা আধুনিককে গ্রহণ করতে দ্বিধা ভাব এলো। অনেকের আত্মসম্মানে বাধল। একেবারে ইংরেজী বাদ দিতে না পারলেও ইউরোপীয় সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি বিমুখ হলেন তাঁরা। ফরাসী ঔপন্যাসিক জোলার বই পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এমন উত্তেজিত হলেন যে ভাটপাড়ার পণ্ডিতের মতো পাঁতি দিলেন ইউরোপীয় সাহিত্য পড়ে কাজ নেই, তার বদলে সংস্কৃত সাহিত্য পড়। বিজ্ঞানশিক্ষার বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হলো না বটে, কিন্তু মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের যে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হলো তা অনেকে সত্যি সত্যি বিশ্বাস করলেন। যুক্তিবাদ পিছু হটল। সামনে এলো অবতারবাদ, গুরুবাদ, সাকারবাদ। "আনন্দমঠ।" সন্ন্যাসীনেতৃত্ব। ব্রাহ্ম হলেন ব্রাহ্মণ। প্রতিষ্ঠা করলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম।

শতাব্দীসায়াহ্নের প্রেরণা অবাধ গ্রহণের ও মিশ্রণের নয়। প্রধানত বর্জনের। সামান্য মিশ্রণের। চরমপন্থীরা তাতেও নারাজ। তাঁদের ভারত হবে ইউরোপের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই সঙ্গে আধুনিকের সম্পূর্ণ বিপরীত। অর্থাৎ মধ্যযুগের ভারত। তাঁরা বর্জন করবেন ইউরোপকে তথা আধুনিককে। তাঁদের বর্জনশীলতা সেইখানেই থামবে না। উপনিষদেও তাঁদের কাজ নেই। গীতা, চণ্ডী, পুরাণ ও ব্রতকথা হলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ। মেয়েদের যদি পড়াশুনা করতেই হয় তবে মহাকালী পাঠশালায়। বাড়ীতে যারা থাকবে তারা শিখবে ব্রতকথার মাধ্যমে। ভারতের স্বধর্ম বলতে তাঁরা বুঝবেন পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম। তার ঘাঁটি হচ্ছে গ্রামে ও মেয়েমহলে। এসব ঘাঁটিতে ইংরেজীকে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বাংলা ঢুকতে পারে, কিন্তু সে বাংলা হবে পুরাতন সংস্কৃতির বাহন, আধুনিক সংস্কৃতির নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহী, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভারবাহী নয়। স্বদেশ ও স্বধর্ম একাকার হয়ে স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। এর মধ্যে বর্জনের ভাবটাই প্রবলতর ছিল, গ্রহণের ভাবটা অতি ক্ষীণ। এবং চরমপন্থীরা যেমন আধুনিক ইউরোপকে বর্জন করলেন তেমনি উপনিষদের ভারতকেও। তাঁদের আন্তরিক আনুগত্য পৌরাণিক বর্ণাশ্রমী ভারতের প্রতি। বেদ তাঁদের নমস্য, কিন্তু স্মৃতি তাঁদের নিয়ামক। দর্শনে তাঁরা অদ্বৈতবাদী, কিন্তু কার্যত কালীপূজক। এটাও যে একপ্রকার বর্জন তা কেউ ভেবে দেখলেন না। সংস্করণ মানে শিকায় তুলে রাখা নয়। জীবনে প্রয়োগ করতে চালু রাখা।

সুবিধামতো ভুলে যাওয়া হলো যে মুসলমান বলে আর একটি সম্প্রদায় আছে।

তারও কিঞ্চিৎ বক্তব্য থাকতে পারে। মুসলমান সমাজে রামমোহনের মতো কেউ জন্মাননি, ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনও হয় এক পুরুষ বিলম্বে। রেনেসাঁস বা রেফর্মেশন কোনোটাই ঠিকমতো স্টার্ট পায়নি সে সমাজে। পেতো আর-কিছুদিন পরে। যদি না হিন্দু সমাজ বিপরীত মার্গ ধরত। মুসলমান সমাজের ইংরেজী শিক্ষিত ভ্যানগার্ড দেখল বিপরীত মার্গ নিলে মোগল ভারতে উপনীত হওয়া দুরাশা। পৌঁছবে হয়তো হিন্দু ভারতে। সে ভারত মুসলমানের জন্যে নয়। তার চেয়ে ইংরেজের সঙ্গে হাত মেলানো শ্রেয়। রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বাঁধা বখরা মেলার আশা আছে। একেবারে বঞ্চিত হবার ভয় নেই। মুসলমান সমাজেও দ্বিমত ছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ভ্যানগার্ড মোটামুটি একমত। মোল্লা মৌলানাদের কথা আলাদা। তাঁদের চোখে সব কিছুই বর্জনীয়। যেমন আধুনিক ইউরোপ তেমনি উপনিষদের ভারত তেমনি পৌরাণিক ভারত তেমনি আধুনিক ভারত। তাঁদের গ্রহণযোগ্য শুধু শরিয়তী রাষ্ট্র। তাঁদের আনুগত্য ভারতের প্রতি নয়, ইসলামের প্রতি। ইংরেজের হাত থেকে ভারত ফিরে পেলে তাঁরা দ্বিতীয় আওরংজেবকে দিল্লীর সিংহাসনে অভিষেক করতেন।

আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ইউরোপ আবিষ্কার তথা আধুনিক যুগ আবিষ্কার এই দুই আবিষ্কারের উল্লাসে মুখর। দেখতে দেখতে সাহিত্যে শিল্পে শিক্ষায় সমাজে ধর্মে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এলো। মনে হলো না যে একটা কিছু হারিয়ে যাচ্ছে যা আরো মূল্যবান। যার ক্ষতিপূরণ নেই। শতাব্দীর জমাখরচের হিসাবনিকাশের সময় যখন এলো তখন দেশের চিন্তাশীলদের মধ্যেই মতভেদ লক্ষিত হলো। যাঁদের মধ্যে যুগচেতনা প্রবলতর তাঁরা বাড়িয়ে দেখলেন সেতুবন্ধ দিয়ে গমনাগমনের ফলে যা লাভ করা গেল তাকেই। সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতাকেই। যাঁদের মধ্যে দেশচেতনা বা দেশাত্মবোধ প্রবলতর তাঁরা বাড়িয়ে দেখলেন যা হারিয়ে গেল বা ভেঙে গেল বা লুট হয়ে গেল তাকেই। সেই বিচ্ছিন্ন আত্মগত ঐতিহ্যবাদী জীবনধারাকে। মোগল রাজত্বও তাকে তেমন ছিন্নভিন্ন করেনি ইংরেজ রাজত্বের রেল স্টীমার কলকারখানা যেমন করেছে। এইসব কলকারখানা ইংলণ্ডে অবস্থিত ও এর লভ্যাংশ ইংরেজের ভোগে লাগে। ভারত শুধু কাঁচামাল যোগায় ও তৈরি মাল কিনতে বাধ্য হয়। তার চিরকালের কারুশিল্প বিনষ্ট হয়। দারিদ্র্য ব্যাপক ও গভীর হয়। বৃহত্তর স্বার্থ বিপন্ন হয়। মনের অন্ধকার দূর হলে হবে কী, বাহির অন্ধকার। যার অতীত এত গৌরবময় তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তমসাচ্ছন্ন। একটা পালোয়ানকে চিৎ করে তার বুকের উপর চেপে বসেছে আর একটা পালোয়ান। সে কি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবে? তাকে হটাতে হবে। তাকে হটানোর প্রথম ধাপই হলো আত্মসম্মানবোধ।

যুগদর্শী চিন্তানায়কর৷ স্বীকার করতেন না যে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ বা পশ্চিমের সঙ্গে তার আদান প্রদান অনাবশ্যক। তাঁরা বরং আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের অভাবটাকেই বড় করে দেখতেন ও তার জন্যে পশ্চিমের সঙ্গে সম্বন্ধটাকে একান্ত আবশ্যক বলে গণ্য করতেন। জ্ঞান বিজ্ঞান না হলে ভারতীয় সভ্যতা পূর্ণ হবে না, অপূর্ণ থেকে যাবে, বহু শতাব্দী পেছিয়ে থাকবে। আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞান যে পশ্চিমের সাহায্য বিনা ভারতের ভিতর থেকেই আপনি উঠে আসবে এটা তাঁরা মেনে নিতে পারতেন না। ভারতকে একলা ছেড়ে দিলে সে যে ইউরোপের মতো জ্ঞানে বিজ্ঞানে আধুনিক হবে এটা তাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ছিল না। পরের কাছে শিখতেই যখন হবে তখন সম্বন্ধ একটা পাতাতে হবেই। তবে সেটা যে প্রভু ভৃত্যের সম্বন্ধ হবে এমন কোনো কথা নেই। সেটা হবে সমানে সমানে সম্বন্ধ। তার লক্ষণ ইউরোপে দেখা যাচ্ছে। ভারতেও দেখা যাবে। ভারতও স্বাধীন হবে। স্বাধীনতা কিন্তু বিচ্ছিন্নতা নয়।

অপর পক্ষে দেশভক্ত মনীষীরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাবলম্বী না করলে তার স্বধর্ম রক্ষা করা যাবে না। পরধর্ম তার পক্ষে ভয়াবহ হবে। জ্ঞান বিজ্ঞান পরের কাছ থেকে পাওয়া গৌরবের কথা নয়। পার্থিব ভোগবিলাস যে চায় না তার ওসব নিয়ে হবে কী? ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে ভারতেরই দ্বারস্থ হবে বিশ্ব। ভারতের অধ্যাত্ম সম্পদ যদি হারিয়ে যায় তবে বিজ্ঞানলব্ধ ঐশ্বর্য তার কোন্ কাজে লাগবে? যা আছে তাকেই সমস্ত শক্তি দিয়ে সংরক্ষণ কর। যা নেই তার জন্যে উদ্বাহু হতে যেয়ো না। ভারতের যা আছে আর কারো তা নেই। দৃষ্টিকে দেশের উপর সন্নিবদ্ধ কর। বর্তমান থেকে যে রেখাটি ধরে দেশের অতীতে যাওয়া যায় সেই রেখাটি ধর। দেশ থেকে যে রেখাটা ধরে পশ্চিমে যাওয়া যায় সে রেখাটা ছাড়ো। আধুনিকতার মোহ কাটাও। আধুনিক তো চিরন্তন নয়। সেও পুরাতন হবে। দু'দিনের দম্ভ দু'দিন পরে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যাবে। "কত চতুরানন মরি মরি যাওত।" আধুনিক ইউরোপেরও আদি অবসান আছে। সনাতন হচ্ছে ভারত। তার নেই আদি অবসান। পরাধীনতা দূর করাই আপাতত একমাত্র কর্তব্য। স্বাধীন ভারত বিচ্ছিন্ন হবে কি না এখন থেকে ভাবতে হবে না। বাইরে থেকে বড় জোর বিজ্ঞানকে নিতে পারে। আর সব তার আছে।

সব মানুষের অগ্রগতির যদি একটাই পন্থা থাকে তবে মানতে হবে যে ইউরোপ এগিয়ে রয়েছে, ভারত পেছিয়ে রয়েছে, সঙ্গ রাখতে হলে পিছু নিতে হবে, ধরে ফেলতে হবে, ছাড়িয়ে যেতে হবে। জাপান যা করতে চেষ্টা করেছে। স্বাধীন হয়ে থাকলে

ভারতও বোধহয় তাই করত। তা করলে কিন্তু স্বীকার করা হতো যে সব মানুষের জন্যে একই রাস্তা। সব মানুষের একটাই সভ্যতা। একটাই বিজ্ঞান। একটাই বিজ্ঞানদৃষ্টি রিয়ালিটি। একটাই ন্যায় অন্যায়বোধ। সাহিত্যে ও আর্টে একটাই বিশ্বজনীন বাণী। এইখানে দেখা দিল মতবিরোধ। আবিষ্কারের ঘোর কেটে গেছে। ইউরোপকে বা আধুনিককে দেখে পরম বিস্ময় জাগছে না। প্রতিদিন তার বর্বরতার সংবাদ চোখে পড়ছে, তার স্বার্থপরতার আঁচ গায়ে লাগছে। যে সব কারণে গ্রীস রোম বিলীন হলো সেই সব আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাও অধঃপাতে যাবে। তা হলে ইউরোপের সঙ্গে পাল্লা দিতে যাওয়া কেন? পথ এক নয়, পথ একাধিক। ভারত সে পথে এগিয়ে রয়েছে, ইউরোপ রয়েছে পেছিয়ে। পাল্লা দিতে হয় ভারতের পিছু পিছু ইউরোপই দেবে।

পথ এক নয়, পথ দুই। ক্রমেই এ ধারণা দৃঢ়মূল হতে থাকে। পরাধীনতার বেদনায় এ ধারণা জাত হলো বললে সবটা বলা হয় না। জাপান তো পরাধীন হয়নি। সেখানেও এর অনুরূপ দেখা গেল ওকাকুরার রচনায় ও কার্যকলাপে। আধুনিক পাশ্চাত্য আর্টের সংক্রমণ থেকে তিনি তাঁর দেশজ শিল্পাদর্শ সংরক্ষণের উদ্যোগ করেন। জ্ঞানবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রপাতি ও টেকনোলজি এসে জাপানের সৌন্দর্য নাশ করছে দেখে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে তিনি বুদ্ধের দেশের শরণ নেন। সৌন্দর্যের ঐতিহ্যগত আদর্শে ভারত, চীন ও জাপান একপন্থী, কারণ সে আদর্শ প্রকৃতির অনুকৃতি নয়, চিত্তের গভীরতর স্তরে তার ভিত্তি। প্রাচ্যের সৌন্দর্য সাধনা অধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। ওকাকুরার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর ঘনিষ্ঠতা হয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ঘটে। এই কবি যে একদিন বিশ্ববিখ্যাত হবেন তা কবিও জানতেন না, ওকাকুরাও না। কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি কর্ণগোচর হবার অল্প দিন পরে ওকাকুরার দেহান্ত হয়। তাঁর দেশ তাঁর কথা শুনল না। ইউরোপের পথের পথিক হলো। সংসারের বিনিময়ে আত্মাকে হারালো। তাই তিনি ভগ্নহৃদয়ে অকালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন। জাপানে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ওকাকুরার মতোই জাপানকে সাবধান করে দেন। ন্যাশনালিজমের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে অপ্রিয় হন। ন্যাশনালিজম জাপানের বা ভারতের সধর্ম নয়। তবু উভয় দেশেই প্রবল। তাই এদেশেও তিনি অপ্রিয় হন।

এর মধ্যে একটু ভুল বোঝা ছিল। আধুনিক যুগে পড়বার আগে ইটালীও জাপানের ও ভারতের মতো অধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের আদর্শে বিশ্বাস করত। সাধারণভাবে ইউরোপও তাই। রেনেসাঁস না ঘটলে, পরে শিল্পবিপ্লব না ঘটলে সে বিশ্বাস

এখনো তেমনি থাকত। প্রভেদটা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞান সাধনার। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নয়। স্বধর্ম ও পরধর্ম এরূপ ক্ষেত্রে কেমন করে দেশানুসারী হবে?

শুধু ভারতে নয় বা জাপানে নয় সব দেশেই দুটো বোঝাপড়া একসঙ্গে চলেছিল। একটা মধ্যযুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের। আর একটা স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের, পূর্বের সঙ্গে পশ্চিমের। দৈনন্দিন জীবনে একটার থেকে আরেকটা পৃথক। রেলগাড়ী বিদেশ থেকে আমদানী, তার থেকে লোকে ধরে নিল ওটা বিদেশী বা পশ্চিমী। আসলে ওটা একেলে। দেড়শ' বছর আগে কোনো দেশেই ওর অস্তিত্ব ছিল না। বিলেতেও বাষ্পচালিত যন্ত্রপাতি প্রথমে বিরাগ জাগিয়েছে। লোকে যন্ত্র ভেঙে দিয়েছে। রেনেসাঁসের একাধিক কারণের একটা হলো মুদ্রযন্ত্র। সেটার উপরেও বহু লোক ক্ষিপ্ত হয়েছে। মনে করেছে ওটা নিছক মন্দ। "ভালো" "মন্দ" এই দুটি কথা নৈতিক বিচার থেকে ঐতিহাসিক বিচারে সম্প্রসারিত হলে কোনো আবিষ্কার বা উদ্‌ভাবন বা অভিনবত্বই তার নাগাল এড়ায় না। আস্ত একটা যুগকেই "মন্দ" বলে সন্দেহ হয় ও সন্দেহ হলেই বিনা বিচারে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। আদি কালের ইতিহাস আমরা জানিনে। জানলে হয়তো এটাও জানা যেতো যে সেকালের লোক গোরুর গাড়ীকেও "মন্দ" বলে অগ্রাহ্য করতে চেয়েছিল।

"ভালো" আর "মন্দ", "শাদা" আর "কালো", "স্বধর্ম" আর "পরধর্ম", "আধ্যাত্মিক" আর "জড়বাদী" এসব গণনা ইতিহাস ভূগোলের উপর বা দেশকালের উপর চাপালে তার পরিণাম হয় যা গ্রহণযোগ্য তার বহিষ্কার বা বর্জন। এবং যা পরিবর্তনযোগ্য বা পরিত্যজ্য তার সংস্করণ। যেসব দেশ অতি পুরাতন বা দীর্ঘকাল হতে বিচ্ছিন্ন সেসব দেশে বহিরাগত ও নূতনের প্রতি একটা মারমুখো ভাব মজ্জাগত। সে দেশের মানুষ সিদ্ধান্ত করে বসে আছে যে ঘরে যা আছে তাই ভালো, আর বাইরে থেকে যা আসে তাই মন্দ। আগে থেকে যা আছে তাই স্বধর্ম, পরে যা এলো তাই পরধর্ম। এখানে যুগের পিণ্ডি চাপানো হয় বিদেশের উপরে। অতীত সম্বন্ধে মানুষের সিদ্ধান্ত করে বসে আছে যে ঘরে যা আছে তাই ভালো, আর বাইরে থেকে যা আসে তাই মন্দ। আগে থেকে যা আছে তাই স্বধর্ম, পরে যা এলো তাই পরধর্ম। এখানে যুগের পিণ্ডি চাপানো হয় বিদেশের উপরে। অতীত সম্বন্ধে মানুষের একটা মোহ আছে। তার সবটাই সুন্দর। যেটা যত প্রাচীন সেটা তত সুন্দর। সে কখনো মন্দ হতে পারে না, অপূর্ণ হতে পারে না। তাকে পরিবর্তন করতে হাত ওঠে না। মানুষের এই আসক্তি প্রকৃতির মধ্যে নেই। সে নির্মম হস্তে ভালো মন্দ সব ভেঙে

ফেলে। সব আবার গড়ে তোলে। তার স্বধর্ম বলে যদি কিছু থাকে তবে তা নিত্য ভাঙা নিত্য গড়া। নিত্য মাজা নিত্য ঘষা। নিত্য ধরা নিত্য ছাড়া। তার মধ্যে একটা কন্‌টিনিউইটি আছে। কিন্তু সেটা তার নিজের প্রবহমানতা। সেটুকু বাদ দিলে আর-সব জিনিসের বেলা ডিস্‌কন্‌টিনিউইটি। পূর্ণচ্ছেদ। কত সভ্যতা গেল আর এলো। এলো আর গেল। আধ্যাত্মিক হলেও কি রক্ষা আছে, যদি না নিত্য ভাঙে নিত্য গড়ে? নিত্য মাজে নিত্য ঘষে। নিত্য ধরে নিত্য ছাড়ে। নিত্য ভাবে নিত্য বিচার করে। নিত্য শোধরায় নিত্য বদলায়। অনুসন্ধান করলে জানা যাবে ভারতও তাই করে এতকাল বেঁচে আছে। কিন্তু কোনো অবস্থায় আত্মাকে হারানো চলবে না। আত্মানং সততং রক্ষেৎ।

উনবিংশ শতকের স্বর্ণলঙ্কায় বাস করেও রাস্‌কিন এডওয়ার্ড কার্পেন্টার প্রভৃতি অনেক মনীষীর মনে সন্দেহ জেগেছে ইংলণ্ড ঠিক পথে চলেছে না ভুল পথে। তেমনি বিশাল ও বলবান রুশ সাম্রাজ্যের ধনসম্পদ ও আভিজাত্য ভোগ করেও টলস্টয়ের সন্দেহ জেগেছে ততঃ কিম্। এঁরা এক একজন একটা নির্ণয়ে উপনীত হয়ে এক একটা পথ নির্দেশ করেছেন। নির্দেশ শুধু স্বদেশের জন্যে নয়, স্বকালের সব দেশের জন্যে। এমনি একটা পথ নির্দেশ করেন কার্ল মার্কস। সে পথ তাঁর নিজের দেশ নেয় না। নেয় তাঁর সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে টলস্টয়ের রাশিয়া। টলস্টয়মার্গ ছেড়ে। এতদিনে আরো অনেক দেশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে আছে চীন। সেই যার ঐতিহ্যের ভিত্তি ছিল নৈতিক। দেখা যাচ্ছে নৈতিক বা জড়বাদী, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য, ভালো বা মন্দ কোনো বিশেষণই এক্ষেত্রে খাটে না। ঐতিহাসিক ভবিতব্য বলে একটা তত্ত্ব লক্ষ লক্ষ মানুষের মন অধিকার করেছে। স্বয়ং ইতিহাস নাকি একটা পথ নির্দেশ করেছে। সে পথ নাকি একটাই পথ। সব দেশের সব মানুষের জন্যে। কেউ যদি তা না মানে তবে তাকে গায়ের জোরে মানাতে হবে। সেটাও নাকি ইতিহাসের নির্দেশ। ভালো কি মন্দ সে প্রশ্ন ইতিহাসের প্রশ্নপত্রে নেই। আছে নীতিশাস্ত্রে। নীতিসম্মত পথ নির্দেশ করেছেন গান্ধী। সেই পথটাও শুধু একটি দেশের জন্যে নয়, সব দেশের জন্যে। কিন্তু কেউ যদি তা না মানে তাকে গায়ের জোরে মানাতে হবে না। দৃষ্টান্ত দেখাতে হবে। মহৎ দৃষ্টান্ত।

উপরে যে পথগুলোর ইঙ্গিত দেওয়া হলো সেগুলো এক একটি দেশে নিবদ্ধ নয়। এক দেশ থেকে অপর দেশে গৃহীত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং জাপানের শুধু একটিমাত্র পথ বা ভারতের কেবল একটিমাত্র পন্থা এ ধরনের সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই সেকেলে হয়ে গেছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রায়ই

শোনা যেতো। প্রায়ই অপর কোনো দেশের উপর নজর রেখে। দুটো দেশ যেন দুটো বিপরীত মেরু। আকাশ আর পাতাল যেমন বিপরীত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর মানুষের সম্বন্ধে মানুষের ধারণা বদলে যায়। দেশ অনুসারে বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু "ভালো" আর "মন্দ" বাঁটোয়ারা হয়নি। "শাদা" আর "কালো" গায়ের চামড়ায় থাকতে পারে, মনের বা চরিত্রের গঠনে নেই। "স্বধর্ম" আর "পরধর্ম" ব্যক্তির জীবনে সত্য হতে পারে, জাতির জীবনে অযথা। "আধ্যাত্মিক" ও "জড়বাদী" এখন কোনো দেশেরই গায়ে বসে না।

রবীন্দ্রনাথ আজন্ম রামমোহন প্রবর্তিত নতুন ঐতিহ্যে মানুষ। যুগপৎ যুগসচেতন তথা দেশসচেতন। এর মধ্যে স্বতোবিরুদ্ধতা অনুভব করেননি। অকুণ্ঠিতভাবে দক্ষিণ হস্তে দেশের কাছ থেকে বাম হস্তে যুগের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন। বর্জনের কথা উঠলে দেশের দেবদেবী ও সাকার আরাধনা ত্যাগ করেছেন, পক্ষান্তরে সাহেবিয়ানা পরিহার। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে জাতীয়তাবাদের তরঙ্গ ওঠে। সেটাও একটা বাইরের ঢেউ। নেপোলিয়নের পায়ের তলায় জাতীয়তার ঢেউ ওঠে যে দেশেই তিনি যান। ইটালীতে জার্মানীতে রাশিয়ায়। তেমনি ওঠে ব্রিটানিয়ার পদতলে। গর্বিত গৌরবময় দেশ ইটালী জার্মানী রাশিয়া। পরাজয়ের বা পরাধীনতার উত্তর দিল জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত হয়ে। ভেবে দেখল না যে সেটাও হলো নেপোলিয়ানেরই নৈতিক জয়। তেমনি ভারতবর্ষেও দেখা দেয় জাতীয়তাবাদ। ব্রিটিশ শাসনের উত্তরে গর্বিত গৌরবময় দেশের পৌরুষের অঙ্গীকার। ইংরেজী শিক্ষাই ছিল তার মূলে। যদিও তার মন্ত্র লেখা হলো সংস্কৃতে তথা বাংলায়।

বিরোধ পরিহার করা গেল না। গোড়ার দিকে মনে হয়েছিল চাইলেই মিলবে স্বাধিকার। এমন ইংরেজও ছিলেন যাঁরা ভারতের পক্ষে। কিন্তু বিশ্বামিত্রের হাতে কামধেনু পড়েছে। বশিষ্ঠকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে দেবেন, তা কি হয়। দেশের মনোভাব দিন দিন বিরূপ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথও অবিচলিত থাকতে পারেন না। একটু একটু করে দেশচেতনায় আচ্ছন্ন হলেন। দেশের অতীতের অভিমুখে যে রেখাটি গেছে সেই রেখা ধরে চললেন। পশ্চিমের অভিমুখী রেখাটি—আধুনিকের অভিমুখী রেখাটি—একেবারে পরিত্যক্ত না হলেও গৌণ হয়ে যায়। অতীত বলতে দেশের লোক বোঝে পৌরাণিক অতীত। ছবি আঁকতে বসলে পুরাণ থেকেই প্রেরণা পায় বেশী। তা ছাড়া অত বড় একটা মধ্যযুগকে ডিঙিয়ে যাবেই বা কী করে? বেদ উপনিষদ যতখানি সুদূর রামায়ণ মহাভারত ততখানি নয়। রামায়ণ মহাভারত যতটা সুদূর ভাগবত বা চণ্ডী ততটা নয়। মানুষ দেশকেও "দশপ্রহরণধারিণী" দেবমূর্তি বলে বন্দনা

করতে ভালবাসে। সে যে মাতৃমূর্তি। পৌত্তলিকতার প্রতিবাদ করে হিন্দুসমাজ থেকে যাঁরা বিদায় নিয়েছিলেন তাঁদের একজনকেই দেখা গেল বঙ্গমাতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে। স্বদেশী আন্দোলন সাকারবাদী আন্দোলন হয়ে উঠল। মধ্যযুগ ফিরে এলো। আধুনিক রাষ্ট্র যাঁদের উদ্দেশ্য তাঁদের উপায় হলো পৌরাণিক ও মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তির উদ্বোধন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ-পুনরাবিষ্কারকে উলটিয়ে দিল বিংশ শতাব্দীর ভারত-পুনরাবিষ্কার।

স্বদেশী যুগের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী হয়েছিলেন। স্বাদেশিক শিক্ষার জন্যে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বদেশ পৌরাণিক সাকারবাদী স্বদেশ নয়। তাঁর ধর্ম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির বাহন নয়। ধর্ম তাঁর কাছে সব কিছুর ঊর্ধ্বে। জাতীয়তা-বাদের খাতিরেও তিনি অধর্ম করবেন না। দেশের স্বাধীনতার জন্যেও খুন ডাকাতী সমর্থন করবেন না। অন্ধ কুসংস্কারকে মুক্তি আন্দোলনের মিত্র করতেও তাঁর আপত্তি। মিত্রই কপট শত্রু। অন্ধতা থেকেই পরাধীনতা এসেছে। অন্ধতার মধ্যে প্রবেশ করলে স্বাধীনতা আসবে কোন্ মায়াবলে। রবীন্দ্রনাথ যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তে অটল। তাঁর প্রোগ্রাম গঠনকর্মে সর্বশক্তি নিয়োগ করে স্বাধীনতার বুনিয়াদ মজবুত করা। আবেদন আর নিবেদন নয়, বয়কট আর বোমা নয়, নিরলস সংগঠন ও সেবা। সেই উপায়ে দেশকে আপনার করে নেওয়াই দেশজয়। অবশেষে অপসরণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। লোকে মনে করল পুলিশের ভয়ে শান্তিনিকেতনে গা ঢাকা দিলেন। ধীরে ধীরে যুগচেতনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিলেন। সে যুগ স্বদেশী যুগ নয়, আধুনিক যুগ। তার সঙ্গে আড়ি করে পূর্ণভাবে বাঁচা যায় না। ইংরেজের সঙ্গে আড়ি করেও অগ্রসর হওয়া যায় না। "এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রীস্টান।"

স্বদেশী যুগের অবসানে রবীন্দ্রনাথের মন যখন তৈরি হলো তখন তিনি হলেন আবার পশ্চিম অভিমুখে যাত্রী। বাইশ বছর বাদে। এবার ইউরোপকে—সেইসূত্রে বিশ্বকে—তাঁর কিছু দেবার ছিল। সে দেওয়া তাঁর দেশের হয়ে। তাতে ছিল প্রাচীন ও মধ্যযুগেরও অন্তঃসার। উপনিষদের তথা বাউল বৈষ্ণব কবীরপন্থের বাণী। পুরাণের নয়। এই বাইশ বছরে তাঁর নিজেরও উপলব্ধি জন্মেছিল। একজন আধুনিক কবি সাধকের। কিন্তু তিনি শুধু দিতে যাননি। নিতেও তাঁর আগ্রহ ছিল। জাতীয়তার অভিমান তাঁকে উদাসীন বা অগ্রহিষ্ণু করেনি। দিতে হলে নিতে হয়। নিতে না পারলে দিতে পারা যায় না। আদান প্রদানেই তাঁর বিশ্বাস। "দিবে আর নিবে মিলিবে মিলাবে।" এই তাঁর আদর্শ। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ হলো মেলা আর মেলানো। পরাধীনতার সাম্রাজ্যবাদ একে উলটিয়ে দিতে পারে না। তিনি

কিপলিং নন যে বলবেন, "পূর্ব হচ্ছে পূর্ব আর পশ্চিম হচ্ছে পশ্চিম। দুই কখনো মিলবে না।" তবে কিপলিং তার সঙ্গে এটুকুও জুড়ে দিয়েছেন যে, "পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকেও যদি আসে তবু তারা মিলবে, যখন দুই বলবান পুরুষ মুখোমুখি দাঁড়াবে।"

শান্তিনিকেতনের আশ্রম থেকে বিদায় নেবার সময় তিনি তাঁর "যাত্রার পূর্বপত্র" রচনা করেন। তাতে বলেন, "য়ুরোপ গিয়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে আমরা সত্যকে প্রত্যক্ষ করিব, এই শ্রদ্ধাটি লইয়া আমরা যদি সেখানে যাত্রা করি তবে ভারতবাসীর পক্ষে এমন তীর্থ পৃথিবীতে কোথায় মিলিবে?"

এর পরে বলেন, "য়ুরোপে দেখিতেছি, মানুষ নব নব পরীক্ষা ও নব নব পরিবর্তনের পথে চলিতেছে—আজ যাহাকে গ্রহণ করিতেছে কাল তাহাকে সে ত্যাগ করিতেছে। সে কোথাও চুপ করিয়া থাকিতেছে না। অনেকে বলিয়া থাকেন, ইহাতেই তাহার আধ্যাত্মিকতার অভাব প্রমাণ করে। বিশ্বজগতেও আমরা কেবলই পরিবর্তন ও মৃত্যু দেখিতেছি। তবু কি এই বিশ্ব সম্বন্ধেই ঋষিরা বলেন নাই যে, আনন্দ হইতেই এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হইতেছে? অমৃতই কি আপনাকে মৃত্যু-উৎসের ভিতর দিয়া নিরন্তর উৎসারিত করিতেছে না? বাহিরকেই চরম করিয়া দেখিলে ভিতরকে দেখা হয় না এবং বাহিরকেও সত্যরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব হয়। য়ুরোপেরও একটা ভিতর আছে, তাহারও একটা আত্মা আছে, এবং সে আত্মা দুর্বল নহে। য়ুরোপের সেই আধ্যাত্মিকতাকে যখন দেখিব তখনই তাহার সত্যকে দেখিতে পাইব—তখনই এমন একটি পদার্থকে জানিতে পারিব যাহাকে আত্মার মধ্যে গ্রহণ করা যায়, যাহা কেবল বস্তু নহে, যাহা কেবল বিদ্যা নহে, যাহা আনন্দ।"

এই রচনারই এক জায়গায় আছে, "আমার বলিবার কথা এই যে, আমাদের মধ্যেও তেমনি পূরণ করিবার মতো একটা অভাব আছে, এবং সেই অভাবই আমাদিগকে দুর্বলতার অবসাদের মধ্যে বহুদিন হইতে আকর্ষণ করিতেছে। এ কথা শুনিলেই আমাদের দেশাভিমানীরা বলিয়া উঠেন, হাঁ, অভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিকতার নহে, তাহা বস্তুজ্ঞানের, তাহা বিষয়বুদ্ধির—য়ুরোপ তাহারই জোরে পৃথিবীর অন্য সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, তাহা কোনোমতেই হইতে পারে না। কেবল বস্তুসঞ্চয়ের উপরেই কোনো জাতির উন্নতি দাঁড়াইতে পারে না এবং কেবল বিষয়বুদ্ধির জোরে কোনো জাতিই বললাভ করে না। প্রদীপে অজস্র তেল ঢালিতে পারিলেও দীপ জ্বলে না এবং সলিতা পাকাইবার নৈপুণ্য সুদক্ষ হইয়া উঠিলেও দীপ জ্বলে না—যেমন করিয়াই হউক, আগুন ধরাইতেই হইবে। আজ পৃথিবীকে য়ুরোপ শাসন

করিতেছে বস্তুর জোরে, ইহা অবিশ্বাসী নাস্তিকের কথা। তাহার শাসনের মূল শক্তি নিঃসন্দেহই ধর্মের জোর, তাহা ছাড়া আর কিছু হইতেই পারে না। বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তী যুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনো কালে হয় নাই। তাহার কারণ এই মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনি আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাই মানুষের সকল শক্তির কেন্দ্রগত, কেননা তাহা আত্মারই শক্তি। পরিপূর্ণতাই তাহার স্বভাব। তাহা অন্তর বাহির কোনো দিকেই মানুষকে খর্ব করিয়া আপনাকে আঘাত করিতে চাহে না।"

দেশে দেশে অমিল যেমন আছে মিলও তেমনি আছে। প্রথম পরিচয়ে অমিলটাই বেশী করে নজরে পড়ে, কিন্তু নিকট পরিচয়ে মিলটা আরো বেশী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে আর দেশে দেশে অমিলের কথা তত বেশী শোনা যায় না, যত বেশী শোনা যায় মতবাদে মতবাদে অমিলের কথা। আমেরিকাতেও কমিউনিস্ট আছে, রাশিয়াতেও ডেমোক্রাট আছে। যে যার সুযোগের অপেক্ষায় গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। ন্যাশনালিজম এখন আর উৎকট আত্মস্বার্থবাদ নয়। এক দেশ অপর দেশকে অনেক সময় বিনা শর্তে সাহায্য করছে। যেহেতু সে অবিকশিত। কিন্তু এই অবস্থায় পৌঁছতে অনেক দিন লেগে গেল, অনেক সংঘাতের ভিতর দিয়ে আসতে হলো। সংঘাত ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের বেলা নেশনে নেশনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেলা কতকটা নেশনে নেশনে, কতকটা মতবাদে মতবাদে। এক দিক থেকে ওটা জার্মানীর সঙ্গে তার উভয় পার্শ্বের প্রতিবেশীদের রণ। আরেক দিক থেকে ওটা নাৎসী ফাসিস্ট মতবাদের সঙ্গে তার বিরুদ্ধমতবাদী কমিউনিস্ট তথা ডেমোক্রাটদের ত্রৈরথ। বিশুদ্ধ জাতীয়তাবাদ ইতিমধ্যেই তার তীক্ষ্ণতা হারিয়েছে। আর মতবাদগুলোরও সে ধার নেই। এখন আর সেগুলোকে থীসিস অ্যান্টিথীসিসের মতো লাগে না। মনে হয় একটা আরেকটার বিপরীত নয়। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী। দুই ঘোড়া যেমন বাজী রেখে দৌড়য়। একটা আরেকটাকে ছাড়িয়ে গিয়েই হারিয়ে দেবে, গুঁড়িয়ে দিয়ে নয়। সেইজন্যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ যত গর্জাচ্ছে তত বর্ষাচ্ছে না। পরমাণবিক বোমার ভয়ে নিবৃত্ত রয়েছে এটা অর্ধসত্য। নিবৃত্তি আসছে ভিতর থেকে। গণতন্ত্রী দেশগুলিতেও পাবলিক সেকটর হয়েছে এবং বাড়তে লেগেছে। সাম্যবাদী দেশগুলিতেও গণতান্ত্রিক মনোভাব কাজ করছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতবর্ষে যে পিছুটান দেখা দিয়েছিল সেটা প্রথম

মহাযুদ্ধের পর মন্থর হয়। কেবল ধর্মমিশ্রিত রাজনীতিতেই একটা স্বপথে ফিরে চলার ধ্যান ছিল। চরকা খাদিকে যদি অর্থনীতি বলা হয় তবে অর্থনীতিক্ষেত্রেও। কিন্তু দর্শনে বিজ্ঞানে সাহিত্যে চিত্রকলায় ভাস্কর্যে স্থাপত্যে স্বদেশের চেয়ে স্বকালের দিকে টান বাড়ে। কখনো প্রকাশ্যভাবে, কখনো প্রচ্ছন্নভাবে। ক্লাসিকাল সঙ্গীতে ও নৃত্যেও আধুনিক রুচি ও রং লাগে। আধুনিক না বলে পাশ্চাত্য বললেও ভুল হয় না। পশ্চিমের উপর বিরাগটা রাজনীতিনিপুণদের মধ্যেই প্রকট। সাধারণ লোক তো বিদেশী ফিল্ম বলতে অজ্ঞান। তেমনি বিলিতী খেলা দেখতে পাগল। বিরোধটা একদা মনে হয়েছিল সভ্যতার সঙ্গে সভ্যতার। পরে মনে হলো নেশনের সঙ্গে নেশনের। পরিশেষে বোঝা গেল পলিসির সঙ্গে পলিসির। ওরা যুদ্ধ চায়। আমরা যুদ্ধ চাইনে, যদি না সিদ্ধান্তটা নিজের দায়িত্বে নিতে দেওয়া হয়। এতদিনে সেটা স্বীকৃত হয়েছে। এরই নাম স্বরাজের অন্তঃসার।

কিন্তু মানুষের জীবন থেকে ধর্মের অন্তঃসার বা নীতির অন্তঃসার যদি উবে যায় তা হলে অন্ধ জাতীয়তাদের মতো অন্ধ প্রগতিবাদও মানুষের দুর্গতির হেতু হবে। সে প্রগতি অধোগতি। তার থেকে উদ্ধার জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে হবে না। হবে কয়েকটি চিরন্তন সূত্রে বিশ্বাস ফিরে পাওয়ার ফলে। সত্য আর প্রেম আর সৌন্দর্য আর ন্যায় অনাধুনিক হয়ে যায় নি। প্রগতির সঙ্গেও এদের অনাত্মীয়তা নেই। রেনেসাঁস শুধু এই কথাই বলার অধিকার দাবী করেছে যে মানুষের জীবনধারা বহু বিচিত্র ও বড় জটিল। বাবাজীরা তাকে যেমন দোরঙা ও সরল ঠাওরান তেমন সে নয়। রেনেসাঁস সত্য আর প্রেম আর সৌন্দর্য আর ন্যায়কে মধ্যযুগীয় বলে খারিজ করেন নি। আধুনিক সভ্যতা যদি নীতির ও ধর্মের শাঁসকেও খোসার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে দেয় তা হলে তারও শাঁস বলতে বিশেষ কিছু থাকবে না। গণতন্ত্র বা শ্রেণীসাম্য অতি মূল্যবান, সন্দেহ নেই। কিন্তু এহো বাহ্য। আগে কহো আর। বিশ্বজনীন চিরন্তন স্থিতিকেন্দ্র আছে। গতিই সব নয়।

রবীন্দ্রনাথ শেষ বয়সে "সভ্যতার সঙ্কট" লিখেছিলেন। "পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্কট" লেখেননি। কারণ পূর্ব পশ্চিমের দ্বৈত ততদিনে তাঁর মন থেকে অন্তর্হিত হয়েছে। এক কালে যেমন আমাদের রেলস্টেশনগুলিতে হিন্দু জল ও মুসলমান জল ছিল, এখন নেই, তেমনি এক কালে কবিগুরুর মনেও পূর্ব পশ্চিমের ভেদবুদ্ধি ছিল, শেষে থাকে না। এর সূচনা খোঁজ করলে পাওয়া যাবে "গোরা"তেই। তাতে যে ভারতবর্ষের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার জাত নেই, 'বিচার' নেই, ঘৃণা নেই। সে শুধু কল্যাণের প্রতিমা। সে ভেদবুদ্ধিকে প্রেম দিয়ে অতিক্রম করেছে। যেমন আনন্দময়ী রূপে তেমনি সুচরিতা রূপে। আরো পরে আরো পরিণত হয় তাঁর অভেদবুদ্ধি।

"I have no hesitation in saying that those who are gifted with the moral power of love and vision of spiritual unity, who have the least feeling of enmity against aliens, and the sympathetic insight to place themselves in the position of others, will be the fittest to take their permanent place in the age that is lying before us, and those who are constantly developing their instinct of fight and intolerance of aliens will be eliminated. For this is the problem before us, and we have to prove our humanity by solving it through the help of our higher nature. The gigantic organizations for hurting others and warding off their blows, for making money by dragging others back, will not help us. On the countrary, by their crushing weight, their enormous cost and their deadening effect upon living humanity, they will seriously impede our freedom in the larger life of a higher civilization." (*Nationalism in India*, lecture delivered in America in 1916, published in the book *Nationalism.*)

"ঘরে বাইরে"র সমসাময়িক যে ইংরেজী বক্তৃতার থেকে উদ্ধার করা হলো তার শেষাংশের "উচ্চতর সভ্যতা" ভারতীয় বা পাশ্চাত্য নয়, মানবিক। "আমরা" সেখানে বক্তা ও শ্রোতা উভয় পক্ষ। বক্তা ভারতীয়, শ্রোতা মার্কিন। আর যেসব মূলনীতির উল্লেখ করা হলো সেগুলি যে-কোনো ধর্মশাস্ত্রের বা নীতিশাস্ত্রের নীর বাদ দিয়ে ক্ষীর। রবীন্দ্রনাথ আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে ১৯১৬ সালে যা বলেছেন তা ভারতের উদ্দেশেও বলা, আজকের উদ্দেশেও বলা। আজকের রাশিয়াকে আমেরিকাকে ইংলণ্ডকে ফ্রান্সকেও বলা। বেঁচে থাকলে কবিগুরু আবার সেইসব কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন।

বর্জন তাকেই করতে হবে যা মূলনীতিবিরুদ্ধ, যা অমানবিক, যা হৃদয়হীন ও অসাড় করে, যা বৃহত্তর জীবনের মুক্তি ব্যাহত করে। তা পাশ্চাত্য বলে নয় বা আধুনিক বলে নয়। পাশ্চাত্য বলেই বা আধুনিক বলেই কোনো জিনিস বর্জন করার কথা ওঠে না। পক্ষান্তরে কিছু গ্রহণ করব কি না সেটা নির্ভর করে তার গ্রহণযোগ্যতার উপরে। তার প্রাচীনত্বের উপরে নয়। তার ভারতীয়ত্বের উপরেও নয়। তবে ভারত তার আত্মাকে হারাবে না। আত্মাকে দুর্বল হতে দেবে না। আত্মস্থ হবে।

পরাধীনতা থাকলে তার গ্লানি থাকে। তার দরুন জ্বালা থাকে। পরাধীনতা মন্দ। মন্দের অন্ত চাই। তার জন্যে সংগ্রাম করাই জগতের নিয়ম। কিন্তু

পৃথিবীতে মন্দের সঙ্গে সঙ্গে ভালোও থাকে। এমন কিছুও থাকে যা ভালোমন্দের দ্বারা বিশেষিত বা নিঃশেষিত নয়। সেইজন্যে মন্দকে অগ্রাহ্য করতে গিয়ে সমগ্র রিয়ালিটিকে অস্বীকার করতে নেই। ভারত পরাধীন হলো, পতিত হলো, নিরস্ত্র হলো, নিঃস্ব হলো, ভগ্নমনোবল হলো, চারিত্র্যভ্রষ্ট হলো। কিন্তু এই সব নয়। ভারত এক রাষ্ট্র হলো, বহির্জগৎ হতে অবিচ্ছিন্ন হলো, আধুনিক যুগে পদার্পণ করল, আলোকিত হলো, অগ্রসর হলো, বিকশিত হলো, নবজাত হলো, পুনঃসংস্কৃত হলো। ভারতকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল, সে চ্যালেঞ্জের উত্তরে ভারত তার আত্মাকে না হারিয়ে নির্মোকমুক্ত হলো, নবকলেবর ধারণ করল। পরাজয় সত্ত্বেও সে অপরাজিত।

এত কিছু কি সম্ভব হতো যদি ইংরেজ শুধু শত্রুতা করত? রবীন্দ্রনাথ কোনো দিন তাকে শত্রুজ্ঞান করেন নি, যদিও তার দুষ্কৃতির সমর্থন করেন নি। তার কাছে আবেদন নিবেদনও করেন নি। তাঁর দৃষ্টি ইংরেজকে ছাড়িয়ে উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাসের উপর পড়েছিল। রোমান্টিসিজম ও লিবারল মতবাদের উপর পড়েছিল। তিনিও সেই মুক্ত স্রোতের মীন ছিলেন। বাংলার বদ্ধ জলার মাছ হলে স্বাধীনভাবে বাড়তে ও সাঁতার কাটতে পারতেন না। ভারতের পুণ্যসরোবরের মৎস্য হলেও তাঁর গতি রুদ্ধ হতো, বৃদ্ধি ব্যাহত হতো। এখন যে বহু শতাব্দীর পরে স্রোত ফিরে এসেছে এটা বহির্বিশ্বের সঙ্গে খাল কেটে সংযোগ ঘটানোর ফলে। স্বাধীনতা তাকে উদ্দাম করেছে।

‘পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার’

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

‘পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার’—রবীন্দ্রনাথেরই ভাষা। এর অর্থ দুটো করেছি আমরা—পশ্চিম তার দ্বার খুলে দিয়েছে, আমরা সেখানে প্রবেশাধিকার পেয়েছি ; আর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে—পশ্চিম প্রাচ্যের দ্বার খুলেছে ও ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে। দুটোই সত্য—‘দিবে আর নিবে, মেলাবে মিলিবে।’

পশ্চিমের দ্বার ভেঙে আসার ইতিহাস নূতন নয়—বহু শতাব্দী জুড়ে আছে। আর্যরা পূর্বদিকে বা সামনের দিকে আগিয়ে আসেন, পিছনে বা পশ্চাতে যা রইল তার নাম হল পশ্চিম বা পাশ্চাত্ত্য ; বাম দিকে যা উচ্চ থেকে উচ্চতর হয়ে গেছে তাকে নাম দিলেন উত্তর। আর যে হাত কাজে কর্মে দক্ষ সেই দিকটার নাম হল দক্ষিণ।

য়ুরোপীয়রা আধুনিক যুগে পশ্চিম এশিয়াদি দেশের নামকরণ করেছে ‘নিয়ার ইষ্ট’ ; আমরা বাংলায় করেছি ‘নিকট প্রাচ্য’ অথচ সেদিকটা হচ্ছে ভারতের পুরোপুরি পশ্চিমে। আবার চীন জাপান প্রভৃতি অঞ্চলকে ওরা বলে ফার ইষ্ট ; আমরাও তর্জমা করে নিলাম দূর প্রাচ্য। আসলে একটা হচ্ছে ভারতের ‘নিকট পশ্চিম বা পাশ্চাত্ত্য’, অপরটি ‘নিকট পূর্ব বা প্রাচ্য’।

এই পশ্চিম থেকে ভারতের উপর এসেছিল যুগে যুগে বিচিত্র জাতি, উপজাতির আক্রমণ।

> ‘কেহ নাহি জানে, কার আহ্বানে
> কত মানুষের ধারা
> দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে
> সমুদ্রে হল হারা।
> হেথায় আর্য, হেথা অনার্য
> হেথায় দ্রাবিড় চীন—
> শক-হুন-দল, পাঠান মোগল
> এক দেহে হল লীন।’

শক-হুন-দল, পাঠান মোগল আসবার পূর্বে এদেশে এসেছিল গ্রীক বা য়ুনানীরা, ইতিহাসে আয়োনীয় বলে যাদের পরিচিতি। তাদের দানের চিহ্ন রয়ে গেছে এদেশের স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, হোরাবিজ্ঞানে, জ্যোতিষ শাস্ত্রে, আয়ুর্বেদে।

'কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে (ভারত) ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরাণে'।

বাংলা দেশ চোখ মেলেই দেখেছে, তুর্কী পাঠান তার শিয়রের গোড়ায় দাঁড়িয়ে। তারা আনলো ইসলাম ধর্ম, আরবী ভাষা। রাষ্ট্রভাষারূপে এল পারসী, যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল মধ্যএশিয়ার অভিজাতদের ভাষা। তুর্কী, পাঠান, মোগল—কারও মাতৃভাষা পারসী ছিল না। এই ভাষাকে তারা গ্রহণ করে ও ভারতে রাষ্ট্রভাষারূপে চালু করে। উত্তর ভারতের প্রাকৃতভাঙা অপভ্রংশের সঙ্গে মিশে গড়ে উঠল সুললিত উর্দু ভাষা—ভারতীয় মুসলমানদের ও মুসলীমসংস্কৃতি-আকৃষ্ট হিন্দুদেরও জাতীয় ভাষা। কিন্তু বাংলা দেশে উর্দুর প্রচলন সীমিত থাকলো মুষ্টিমেয় শহরবাসী মুসলমানদের মধ্যে। কিন্তু দেহাতে বা মফঃস্বলে যে সব পাঠান ফৌজ মোতায়েন হলো—দশ বিশখানা হিন্দু গ্রামের মাঝে মাঝে 'কসবা' বসালো—যারা কালে নানাভাবে নারী সংগ্রহ করল চারিপাশ থেকে, তাদের সন্তানসন্ততিরা বংশ পরম্পরায় আর বিদেশী থাকলো না, হয়ে গেল বাঙালী; বাংলাই হলো জেতা ও জিতের ভাষা।

আজ বাংলা ভাষার মধ্যে থেকে পারসী, আরবী ও তুর্কী ভাষার শব্দ বাদ দিলে আমাদের বোবা হয়ে থাকতে হবে। বই, কলম, দোয়াত, সিহাই, কাগজ, দপ্তরখানা, দপ্তরীর সরঞ্জাম বাদ দিলে আমরা তো একেবারে বেয়াকুফ ও বেকার বনে যাবো। ফাজলামি, দোস্তি, ইয়ারকি বন্ধ হলে থাকবে কি! নহবত যদি জলসা থেকে বিদায় করি, গানের মধ্যে গজল পেশ বন্ধ যদি হয়, ওস্তাদরা বিনা যন্ত্রে কালোয়াতি করতে নারাজ হন তখন কী দশা হবে। জমিদারি, তেজারতি, হাকিমি, হুকুমজারী অচল হবে। মুন্সেফী আদালতে সেরেস্তাদার, পেশকারের মারফত আর্জি পেশ করা যাবে না। জমি বন্দোবস্ত খারিজ হয়ে যাবে। ইজারা পত্তনি উঠে গেলেও ভাষা থেকে নড়ানো অসম্ভব।

ইসলাম-ধর্ম, তার একেশ্বরবাদ প্রভৃতি আমরা কী ভাবে স্বীকরণ করেছি—তা বাংলাদেশের বৈষ্ণব ধর্মের দিকে তাকালেই জানা যায়। চৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর নয়া-ধর্মে কী গ্রহণ না করলেন ইসলাম থেকে—সহভোজন, সহভজন, সর্বদ্বারী বিবাহ, কণ্ঠি বদলেই সমাধান। ইসলামে মৃতের কবরদান প্রথা ও বৈষ্ণবদের সমাধি করার মধ্যে তফাত সামান্য। মুসলমানদের শুইয়ে কবর হয়, বৈষ্ণবদের বসিয়ে পোঁতা হয়। কোরানের ন্যায় ভাগবত পুরাণকে বৈষ্ণবরা করলেন ধর্মগ্রন্থ। কৃষ্ণ হলেন দেবতা আর কালে চৈতন্য হলেন তাঁর অবতার বা প্রেরিত পুরুষ। মোট কথা, ইসলামের অনেক কিছু গ্রহণ করে তাকে প্রাচ্য করে নেওয়া হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ ১৩০৯ সনে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন—'ভারতবর্ষের ইতিহাস কাহাদের

ইতিহাস ?' তার উত্তরে তিনি বলেন ভারতবর্ষের ইতিহাস কারো স্বতন্ত্র ইতিহাস নয়। যে আর্যগণ একদিন ভারতবর্ষকে তাঁদের বুদ্ধি ও শক্তি-প্রভাবে জয় করেছিলেন, যে আর্যগণ অনার্যগণের সহিত মিশে তাদিগকে সমাজ-অন্তর্গত করে নিয়েছিলেন, যে মুসলমান হিন্দুর আত্মঘাতী গৃহবিবাদের অবকাশে এদেশে বংশপরম্পরা ক্রমে জন্ম-মৃত্যু দ্বারা এদেশের মাটিকে আপনার করে নিয়েছে—ভারত ইতিহাস এঁদের একলার কারও নয়। আমাদের বলবার কথা পশ্চিম এসে পূর্বদেশে তাদের ঘরদোর বানিয়ে প্রাচ্য বলেই বাস করছে, 'দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে' তত্ত্বর অনেকখানি পূর্ণ হয়েছে।

তারপর সত্যিকার যাদের পশ্চিম বা প্রতীচ্য বলা হয় সেই য়ুরোপীয়রা একদিন ভারতের উপকূলে উপস্থিত হলেন। বাংলাদেশের নরম মাটিতে, গঙ্গার তীরে, বটগাছের তলায় বসে জব চার্ণক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ মহানগরী পত্তন করলো।

"সেদিন এ বঙ্গ প্রান্তে পণ্যবিপনির একধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজ-সিংহাসন।
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে।
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল—পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে॥"

কয়েক বৎসর পরে (১৩১৫) 'পূর্ব ও পশ্চিম' প্রবন্ধে কবি বললেন—"আজ যে পশ্চিম হইতে ইংরাজ আসিয়া ভারতেতিহাসের একটি প্রধান অংশ জুড়িয়া বসিয়াছে, ইহা কি সম্পূর্ণ আকস্মিক, অপ্রয়োজনীয় ?

.........নিখিল মানবের সঙ্গে জ্ঞান, প্রেম, কর্মের নানা আদান-প্রদানে আমাদের অনেক প্রয়োজন আছে, ইংরেজ বিধাতৃ-প্রণোদিত হইয়া তাহারই উত্তম আমাদের মধ্যে জাগাইতে আসিয়াছে—ফল না হওয়া পর্য্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইবে না। সে সফলতা পূর্ব-পশ্চিমের মিলনে, বিরোধে নহে।

............পশ্চিমের সহিত প্রাচ্যকে মিলিতেই হইবে।"

(র-জী ২, পৃঃ ১৮৯)

এই উক্তির নির্গলিত অর্থ—**to make the best of a bad burgain.** ইংরেজ আমাদের ইচ্ছায় আসেনি,—আমাদের ইচ্ছায় যায়নি। এসেছিল বাংলাদেশের গৃহ-বিবাদের ছিদ্র পথ দিয়ে—গিয়েছিল বিশ্ব-ইতিহাসের কূটনীতির প্রবাহের পথে—

রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিঘাতে। অবশ্য পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক মুখোশচ্যুত হয়ে, অন্যভাবে কোথাও অর্থনৈতিক হিতচিকীর্ষুরূপে, কোথাও সাংস্কৃতিক শিল্পকলার ছলনাময়ী রূপ পরিগ্রহ করে দেখা দিচ্ছে।

ইংরেজের সঙ্গে বাঙালীর প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল দুই শো বৎসরের। ১৭৬৫ সনে ইংরেজ-কোম্পানী বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে। কিন্তু তারও প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে বাংলাদেশের নদীপথে রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ ক'রে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের জাল বিস্তার করেছিল। যাই হোক, ধরা যেতে পারে পুরো পৌনে দুশো বৎসর (১৭৭২-এ ওয়ারেন হেস্টিংস্‌এর সময় থেকে ১৯৪৭ পর্য্যন্ত) ইংরেজ এদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে রাজত্ব করেছিল সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে। সাতশো বৎসর মুসলমান এদেশে বাস করে সমস্ত লোকের মন, মেজাজকে ইসলামী ঢঙে গড়তে পারেনি আর এই ইংরেজ তার সিকি সময়ে সেই মেজাজ ও পরিবেশ রচনা করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য পত্তন করে তারা রাজনৈতিক অধিকার হস্তগত করেছিল। ফলে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে অর্থাৎ বিনিময়ে দামের ভরসায় লোকে ইংরেজের অনুগত হলো। কাজের তাড়ায় ভাষা শিখলো। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর্ষণেও ইংরেজী ভাষা আমরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলাম। পেটের দায়ে কয়লার খাদের পাথর কাটতে কাটতে হঠাৎ হীরকের সন্ধান পেলে যেমন হয়, ইংরেজ বেনিয়াদের মুৎসুদ্দিও দালালগিরি করবার জন্য ইংরেজী ভাষা শিখেই থেমে গেলাম না; এই ভাষার মাধ্যমেই এলো সমস্ত জগৎ—বহু শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞান ভাণ্ডারের চাবিকাঠি পড়লো হাতে। সেই রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ করে মনে-মরা বুভুক্ষিত জীবনের নবজন্ম হলো। বাংলাদেশে জ্ঞানচর্চা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দুর পক্ষে ন্যায় ও পুরাণ পঠন-পাঠন, মুসলমানদের অবস্থাও তদনুরূপ। ভারতবর্ষের শাশ্বত সত্য যার মধ্যে নিহিত, সেই বেদ, বেদান্ত বা উপনিষদের চর্চা ছিল প্রায় অজ্ঞাত। বাঙালীর জাগ্রত যুব-মনকে আকৃষ্ট করতে পারে, এমন কিছু উৎকৃষ্ট ধর্মগ্রন্থ বা নীতি-আদর্শ সুলভ ছিল না। বিচার থেকে আচার, বুদ্ধিচর্চা থেকে বিশ্বাসের অন্ধ পথ বেয়ে চলা ছিল ধর্ম। বাংলার অশান্ত অনিশ্চিত জীবন-মরুর মধ্যে মরুদ্যানের মত গড়ে উঠলো কলকাতার বন্ধনহীন সমাজ। চারদিক থেকে ব্যবসায়, বাণিজ্য, চাকুরি, দালালি প্রভৃতি নানা কাজের আকর্ষণে লোক জমায়েত হলো; চিরদিন যেমন করে গড়ে উঠেছে নগর জীবন। পুরাতন গ্রাম্য পরিবেশের বাইরে এসে তারা নূতন আলোক পেলো ইংরেজ বণিকদের কাছ থেকে। চোখ ঝলসানো শহরে জলুসের সঙ্গে মলিন কালো ধোঁয়াও যে আসেনি তা বলতে পারিনে।

বাংলাদেশে এলো খৃষ্টান পাদরীরা নূতন ধর্মগ্রন্থ নিয়ে; বিলাত থেকে এলো

ছাপাখানা। য়ুরোপে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়ে বই ছাপা হচ্ছে প্রায় চারশো বৎসর। তার কোন খবর এদেশে পৌঁছায়নি এত কাল।

বাঙালীর বিস্ময়ের শেষ নেই। নিজেরা লেগে গেল বই ছাপাতে, পত্রিকা বের করতে।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধের মধ্যে যুগান্তর হয়ে গেল বাঙালীর সমাজে। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ২৫ বৎসর পূর্বে ইংরেজী ভাষা রাষ্ট্রভাষা বলে স্বীকৃত হয়েছিল (১৮৩৫)। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হয়েছিল। শহরে শহরে ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হলো। ১৮৫৭ সনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো।

এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষায়তন; প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় চতুষ্পাঠী, টোল, মক্তব্ প্রভৃতির সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই। তার ঘরদোর, শ্বেতকায় ইংরেজ অধ্যাপক—সবই বিস্ময়কর। ভারতের চিরন্তন আয়ুর্বেদ ও য়ুনানী চিকিৎসার বদলে এলো অ্যালোপ্যাথী শাস্ত্র; মেডিক্যাল কলেজ উঠলো বড় রাস্তার ধারে। ফোর্টে তোপ পড়ল যেদিন হিন্দুর ছেলে 'কলেজে' মড়া কাটলো। কলকাতার ধনী হিন্দুরা হিন্দুত্ব বজায় রাখবার জন্য আয়ুর্বেদী চিকিৎসক কবিরাজ মশায়ের ঘরে আর ধর্ণা দেন না। ঠাকুর পরিবারের এঁরা বেদান্তাদির চর্চা করেছেন বলে যে দেশী চিকিৎসা প্রণালীতে শ্রদ্ধাবান ছিলেন—তা তো নয়। পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসাই স্বীকৃত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী যাঁরা সামান্যতও জানেন—তাঁরা লক্ষ্য করে থাকবেন যে কবি একজন ভালো হোমিওপ্যাথ ছিলেন; শেষ জীবনে বায়োকেমিক চিকিৎসক হয়ে ওঠেন। তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থভাণ্ডারে পকেট হোমিওপ্যাথী বই থেকে অ্যালেন-এর দ্বাদশখণ্ড হোমিওপ্যাথিক বিশ্বকোষ ছিল। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও পরে বিশ্বভারতীতে অ্যালোপাথ চিকিৎসাপ্রণালী সরকারীভাবে চালু ছিল। ভারত সরকার অ্যালোপাথিকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা বলে সরকারী স্বীকৃতি দিয়েছেন।

১৮৩০ থেকে ১৮৬০—এই ত্রিশ (৩০) বৎসরের মধ্যে বাঙালীর দেহে, মনে, ঘরে বাইরে যেসব বিপ্লবকারী পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল, তার মধ্যে যুগান্তকারী ঘটনা হচ্ছে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব।

১৮৩০ সনের ২৩ জানুয়ারী বা ১১ই মাঘ কলকাতা চিৎপুর রোডে রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। রামমোহন তাঁর ধর্মের নাম দেন 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' অর্থাৎ উপনিষদ উক্ত ধর্ম ও দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। রামমোহনের মন্দির সম্বন্ধে ট্রাস্ট ডীড্‌টি ইংরেজীতে সম্পাদিত; কিন্তু তার বিষয় বস্তু বাঙালীর চিত্ত উদ্ভাবিত প্রথম অসাম্প্রদায়িক মনের ভাবনা। তাঁর পরিকল্পিত ব্রাহ্মসমাজগৃহ সর্বধর্মের লোকের

জন্য উন্মুক্ত হলো। ১৮৩৩ সনে ২৭ সেপ্টেম্বর রামমোহনের মৃত্যু হয় ইংলণ্ডে। তারপর তাঁর ব্রাহ্মসমাজ চালাবার মত যোগ্য লোক আর কেউ এগিয়ে আসেনি। মাসিক আর্থিক সাহায্য করতেন দ্বারকানাথ ঠাকুর —রবীন্দ্রনাথের পিতামহ।

১৮৪৩ সনে দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন যুবক—যাঁরা চার বৎসর পূর্বে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা ব্রাহ্মসমাজমন্দিরে সভার কাজ চালাবার জন্য আসেন ও ক্রমে সমাজের কাজ চালাবার ভার গ্রহণ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভার কাজ ছিল—পাশ্চত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ও ভারতীয় ধর্ম আলোচনা। ১৮৪৩ সনের ভাদ্র মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হলো। ১৮২৮ সনের ভাদ্র মাসের ছয় তারিখে রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন। বোধ হয় সেইজন্য ভাদ্রমাসেই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়ে থাকবে। পত্রিকা প্রকাশিত হবার চার মাস পরে পৌষ মাসের সাত তারিখে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ বিশজন যুবক ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

রামমোহন রায়ের সময় থেকে ধর্মে কর্মে বুদ্ধি ও বিচারের প্রয়োগ-পর্ব ও গঠন-মূলক কাজের সূত্রপাত হলো,—বলা যেতে পারে এজ অব রিজন-এর আরম্ভ। এই সময় য়ুরোপীয় বিপ্লবী, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের বই কলকাতায় আমদানী শুরু হয়। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ভলটেয়ার, রুশো, টমাস পেইন্, বেকন, হিউম, লক্, বেনথাম্ গীবন প্রভৃতি লেখকদের বই। পেইনএর চিন্তাধারা তখনকার শিক্ষিত বাঙালী সমাজে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী পাদরী ডাফ্ সাহেব যা লিখেছিলেন, তার তর্জমা উদ্ধৃত করছি—"কেবলমাত্র একটা জাহাজেই এক হাজার সংখ্যা 'এজ অব রিজন' কলকাতায় এসে পৌঁছাল। প্রথমদিকে প্রতিটি বই এক টাকা করে বিক্রী হচ্ছিল, কিন্তু এই বই-এর চাহিদা এতই বেশী ছিল যে, দেখতে দেখতে এর দাম বেড়ে গেল।

...কিছুদিনের মধ্যে পেইন্-এর সব লেখার একটা সস্তা সংস্করণ প্রকাশিত হল।" (প্রমোদ সেনগুপ্ত :—'ভারতীয় মহাবিদ্রোহ' পৃঃ ৪৭)

এই যুক্তিবাদের বৈজ্ঞানিক ধারা থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত লিখলেন,—"বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার।" বইখানি ইংরাজী বই-এর ভাবানুবাদ। ঠিক সেই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার সম্বন্ধ বিচারে প্রবৃত্ত। যুক্তি দিয়ে বিচার করে ঈশ্বরকে কোথাও পেলেন না অক্ষয়কুমার; ধ্যান দিয়ে, মনন দিয়ে ভক্তি দিয়ে—দেবেন্দ্রনাথ পেলেন পরমআত্মাকে। Reason ও Revelation দুই মানুষকে দুটি কোটিতে উপনীত করে দিল। যুক্তিবাদের আশ্রয়ী হয়ে বেন্থাম, হিউম, মিল

প্রভৃতি পড়েও দেবেন্দ্রনাথ নিরীশ্বরবাদী তো হলেনই না, বরং ভক্তচূড়ামণি হলেন। যুক্তি ও অনুভূতি-আশ্রয়ী দেবেন্দ্রনাথের ঈশ্বর সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞানের উৎপত্তিক্ষেত্র ছিল ভারতীয় ব্রহ্মবাদ। দেবেন্দ্রনাথ তার আত্মজীবনীতে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, কিভাবে তিনি রামমোহন প্রবর্তিত বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্মকে চরম বলে মানতে না পেরে 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন। 'ব্রাহ্মধর্ম' গ্রন্থ কোনো বিশেষ উপনিষদের বাণী-সংগ্রহ নয়। শাস্ত্রীয় মতবাদের অরণ্য থেকে বুদ্ধি, যুক্তি, অনুভূতি তথা জ্ঞান, ধ্যান নিদিধ্যাসনের আলোকে সমিধ আহরণ করে এই ধর্মগ্রন্থ সম্পাদনা করেন। বুদ্ধি ও বিচারের আলোকে প্রতিমাদি পূজা পরিত্যাগ করলেন। পুত্র-কন্যাদের বিবাহাদি অনুষ্ঠান অপৌত্তলিকভাবে সম্পন্ন করলেন। মত ও পথ সমসূত্রে গাঁথা পড়লো।

ঠাকুরপরিবার, বিশেষ করে জোড়াসাঁকো এবং পাথুরিয়াঘাটার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও য়ুরোপীয়তা বেশ ভালো করেই কায়েম হয়েছিল। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশের দ্বারকানাথ—রবীন্দ্রনাথের পিতামহের য়ুরোপীয়তা তো প্রবাদগত। উনবিংশ শতকের ইংরেজ বনিয়াদের অনুকরণে তিনি সামাজিকতা করতেন—ব্যবসায় ও বাণিজ্যেও মন দিয়েছিলেন তাদের সমকক্ষ হবার জন্য। য়ুরোপে তিনি দু'বার যান; সমস্ত মধ্য-য়ুরোপ ঘুরেছিলেন। ইংলণ্ডের শিল্পকেন্দ্র, খনিকেন্দ্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করেন; আয়ারল্যাণ্ডে যান—লর্ড রসের টেলিস্কোপ দেখবার জন্য। য়ুরোপকে ভালো করে জানবার, বুঝবার জন্য তিনি সে দেশে গিয়েছিলেন। দ্বারকানাথের বেলগাছিয়ার বাগান ভারতীয় উদ্যান-পরিকল্পনায় রচিত নয়। গৃহাদির স্থাপত্য পাশ্চাত্ত্য, গৃহসজ্জা য়ুরোপীয়—আহার পান পশ্চিমের অনুকরণেই চলতো। কোনো ক্ষেত্রে অতীত-সনাতনীর নিদর্শন পাওয়া যায় না। যদি কিছু পাওয়া যায়, তা' হচ্ছে মুঘল-মুসলিম যুগের অবক্ষয়ের চিহ্ন।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের গৃহসজ্জা, তথাকার বিরাট পাইপঅর্গান প্রভৃতির মধ্যে আমরা পাশ্চাত্ত্য প্রভাবই দেখতে পাই। বাংলার সাঁই, দরবেশ, আউল বাউলদের চাটাই পাতা আখড়া নয়। আচার্যের উপদেশ দান, উপাসনা পদ্ধতি ও ধর্মসঙ্গীত গাওয়া প্রভৃতি খৃষ্টীয় চার্চের আংশিক অনুকরণ। Sermon দান প্রথাই খৃষ্টানী তথা পাশ্চাত্ত্য। তর্কের জন্য পণ্ডিতরা বলবেন বুদ্ধদেব তো ধর্মদেশনা করতেন; কথাটা সত্য। কিন্তু উনবিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর কাছে ওসব তত্ত্ব অজ্ঞাতই ছিল। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজের খুব বড় পৃষ্ঠপোষক—এমন কি সভাপতিও হন। তিনি ইংরেজী ভাষা এবং সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইংরেজ একেশ্বরবাদী Voesey সাহেব ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মদের মতে ইংরেজ ব্রাহ্ম। রাজনারায়ণ এই ইংরেজ ভক্তের উপদেশ-

মালা নিয়মিত পড়তেন—যেমন (Longham Hall Pupil Vol III No. 34 Their in its Principles and Beliefs.) ভয়সী সাহেবের উপদেশ বা Sermonএর উদ্ধৃতি ও অনুবাদ তাঁর দিন-কড়চায় পাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সে সব ছাপা হতো। ফরাসী দার্শনিক V-Cousin, ইংরেজ খৃষ্টান পাদরী ও মনীষী Newman মার্কিন একেশ্বরবাদী Theodore Parker প্রভৃতি লেখকদের আলোচনা ও তাদের রচনার অনুবাদ দেখা যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পাতায় খুব গোড়ার দিকেই। (১৮৬১ সন)

য়ুরোপের স্পর্শে ভারতীয়দের জীবনে ও জীবিকায়, ধর্মে কর্মে সাহিত্যে, ভাবনায় যে পরিবর্তন হয়েছে তার সামুদায়িক আলোচনা খুবই চোখে পড়ে। গত দু' শত বৎসরের কালান্তরে ভারতীয়কে চেনা দায়।

১৮১৩ সনের পর খৃষ্টান পাদরীদের বাংলাদেশে প্রবেশ করবার বাধা হলো দূর; দেশীয়দের খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করবার নিষেধ গেল সরে। বাঙালী বহু অভিজাত পরিবারে খৃষ্টানী তথা পাশ্চাত্ত্যের রীতিনীতি কায়েম হয়েছিল অর্ধশতাব্দীর মধ্যে। ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্টীয় ভাব প্রবেশ করলো—কেশবচন্দ্র সেন হলেন তার পথিকৃৎ।

রবীন্দ্রনাথ যখন আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও অন্যতম অধ্যক্ষ দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, সেই সময়ে 'ব্রাহ্মসমাজ, অতীত ও বর্তমান' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ অ-নামে প্রকাশিত হয়—(১৮০৮ শক, ভাদ্র, ১২৯৩ সাল, ১৮৮৬ অগষ্ট)। লেখক বলেন যে রামমোহন রায় হিন্দুধর্মের ও সমাজের সংস্কারক; কিন্তু "তিনি যে বেদের ন্যায় কোরান, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থকে······ব্রাহ্মের শাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ইহারই মর্ম তাঁহাদের (নবীন ব্রাহ্মদের) অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিল।······তদবধি ধর্মশিক্ষার জন্য প্রধানত বাইবেল অনেক ব্রাহ্মের অবলম্বনীয় হইয়া উঠিল।" ইহার ফলে "ব্রাহ্মধর্মও খানিকটা রূপান্তর ধারণ করিল। ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে ঐ সময় (১৮৮০ ?) হইতে ব্রাহ্মসমাজে খৃষ্ট মহিমা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।······ধর্মের অঙ্গে যেমন এই পরিবর্তন, ব্যবহারেও আবার এইরূপ। বিধবা-বিবাহ, বৈজাত্য-বিবাহ, মনুষ্য-সাক্ষিক-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, স্ত্রী-পরিচ্ছদ, জীবনপ্রণালী এ সকলই য়ুরোপের অনুকরণে অল্পে অল্পে আসিতে লাগিল।" বলা বাহুল্য, এই মন্তব্য আদি ব্রাহ্মসমাজীয়রক্ষণশীলতা তথা জাতীয়তা বোধ থেকে লিখিত।

কেশবচন্দ্র সেনের ধর্মসাধনায় খৃষ্টীয়ভাবের প্রাধান্য হেতু তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান হয়ে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নাম গ্রহণ করেন। পরযুগেও নববিধান সমাজের কয়েকজন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন বলে আমাদের জানা আছে।

ব্রাহ্মসমাজের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে পশ্চিমের ছায়া পড়ে এবং রবীন্দ্রনাথ জন্মকাল থেকেই সেই আবহাওয়ার মধ্যেই বর্ধিত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন আরেকজন মহাপুরুষ স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যকে এমন ভাবে আত্মীয়করণ করলেন যে হিন্দুত্বের ভোল গেল পালটে। হিন্দুধর্মের অদ্বৈতবাদ থেকে শুরু করে কালীপূজা, শিবরাত্রি পালন,—এক কথায়, সমস্ত আচার বিচার মেনে নিয়ে নূতন গুরুবাদ বা গুরুপূজা প্রবর্তন করে বিবেকানন্দ মধ্যযুগের য়ুরোপীয় খৃষ্টানদের আদর্শে হিন্দুধর্মের সংস্কারে প্রবৃত্ত হলেন। খৃষ্টানী আদর্শে মঠ গড়লেন। নবীন সন্ন্যাসীদের আদর্শ হলো দারপরিগ্রহ না করে মানবসেবা—যার মূলে ছিল উগ্র স্বাদেশিকতা। মঠ স্থাপিত হলো আধা ক্যাথলিক খৃষ্টানী ঢঙে; বৈষ্ণবী আখড়া বা হিন্দু মোহন্তদের মঠ থেকে দূরে। বিবেকানন্দ যে পোষাক গ্রহণ করলেন তা খানিকটা স্যালভেসন আর্মি বা খৃষ্টান মুক্তি ফৌজদের মতো। সেই সময়েই মুক্তি ফৌজদল কলকাতায় কাজ আরম্ভ করে। খৃষ্টানী মতে যীশুর স্থানে রামকৃষ্ণকে গুরু ও শেষকালে অবতার খাড়া করা হলো। সংস্কৃতে ধর্মগ্রন্থের অভাব নেই। সব স্বীকার করে নিয়েও আসল ধর্মগ্রন্থ হয়ে দাঁড়িয়েছে 'রামকৃষ্ণকথামৃত', এটাই এখন বাইবেলের মতো লোকে পড়ে। রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যে সমাজ গড়া হলো, তার নাম হলো রামকৃষ্ণ মিশন—যেমন খৃষ্টানদের আছে পাঁচ রকমের মিশন। 'মিশন' শব্দটার বাংলা এখন পর্যন্ত সৃষ্ট হয়ে চালু হয়নি। মঠের আচার্য হলেন—'প্রেসিডেণ্ট'। মোট কথা পাশ্চাত্ত্য অনেক কিছু গ্রহণ করেও বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের রক্ষক বলে স্বীকৃতি লাভ করলেন। বিবেকানন্দকে প্রচ্ছন্ন য়ুরোপীয় বললে বোধ হয় ভুল হবে না। গুরুপূজা বা অবতারবাদ, পূজা, হোম, আরতি কীর্তন প্রভৃতি কিছুই বাদ গেল না। কিন্তু যুগপৎ খৃষ্টানদের সেবাদর্শ, য়ুরোপীয়দের দেশাত্মবোধ প্রভৃতি আবার তেমনই হিন্দুদের আকৃষ্ট করলো।

স্বামী বিবেকানন্দের অধিকাংশ রচনা ইংরেজীতে। রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রথম ইংরেজী জীবনী লিখলেন ম্যাক্সমুলার। অর্থাৎ পশ্চিমী পণ্ডিতদের প্রশস্তির দ্বারা তাঁর মহত্ত্ব প্রচারিত হলো। সে ধারা বহুকাল চলে। রোমা রোলাকে দিয়েও পরমহংস ও বিবেকানন্দের জীবনকথা লেখানো হয়েছে এবং তাঁকে যেসব উপকরণ সরবরাহ করা হয়, তাতে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতির বিশুদ্ধতা সর্বত্র রক্ষিত হয়নি বলেই জানি। মোট কথা পশ্চিমের স্বীকৃতির উপর যেন আমাদের যশের নির্ভর।

রবীন্দ্রনাথের আর একজন সমকালীন সাধক শ্রীঅরবিন্দের প্রায় সমস্ত লেখারই মূল ইংরেজী। তার কারণ তাঁর বাল্য ও যৌবন কাটে বিলাতে ও বাংলার বাইরে। ইংরেজী ছিল তাঁর মাতৃভাষার মতো। পণ্ডিচেরীতে তাঁর আশ্রমের শক্তিরূপিণী মাদার

তো ফরাসী মহিলা—ইংরেজীতেই তাঁর সমস্ত কাজকর্ম। শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজী লেখার বাংলা এখন হচ্ছে।

এইভাবে গত একশত বৎসরের intellectual history যদি বিশ্লেষণ করি, তবে দেখবো পশ্চিমের সংস্কৃতি,—তার ধর্ম-কর্ম, ভাষা, সাহিত্য, শিল্পকলা, আদব-কায়দা, বসন-ভূষণ, খাদ্যপানীয়—এমনভাবে গ্রহণ করেছি যে এখন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভেদ খুঁজে পাওয়া কঠিন।

প্রতীচ্যের প্রভাব এমনভাবে ভারতীয়দের মনের উপর বিচিত্র রঙের ও বিবিধ সুরের রস জুগিয়েছে যে তার পরিবর্তনকে গণনার চেয়ে গুণের দিক থেকে বিচার করলে, তাদের যথার্থ রূপ ফুটে উঠবে।

এই বিশ্লেষণীর মাধ্যমে আমরা বলতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথ is the product of European culture, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি, য়ুরোপীয় সাহিত্য ও আর্ট বর্জিত রবীন্দ্রনাথকে কল্পনা করা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীঅরবিন্দকেও এই পাশ্চাত্ত্য-সংস্কৃতিবর্জিত ভাবে পাওয়া যেতো না।

রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর এদেশেও ভারতের সর্বত্র তাঁকে জানবার জন্য ঔৎসুক্য দেখা দিল। স্বামী বিবেকানন্দও যদি পাশ্চাত্ত্য দেশে না যেতেন এবং মিস মার্গারেট নোবেল ও মার্কিন দেশীয় ধনী মহিলাভক্তদের আকর্ষণ করতে না পারতেন, তবে তাঁর এত খ্যাতি হতো না। শ্রীঅরবিন্দও যদি Mira Richard বা মাদার এর পূজো না পেতেন, তবে তাঁকে দাক্ষিণাত্যের রমণ ঋষি প্রভৃতির ন্যায় স্থানিক খ্যাতি অর্জন করেই পণ্ডিচেরীতে বাস করতে হতো। কেরল-রবি বাল্লোথলকে উঁচুদরের সাহিত্যিক বলে তখনই জানলাম যখন তার Mary নামে নাটক সাহেবে তর্জমা করলো ইংরেজীতে।

আধুনিক বাংলা কাব্য, নাটক, প্রবন্ধ সব কিছুরই শুরু হয় ইংরেজীর অনুকরণে। ব্রিটিশ লেখক জেড্রল (Jedrol)-এর নাটক The Disguise বাংলা তর্জমা করে অভিনয় করালেন রুশীয় সাহসেক ও শিল্পী লেবেদফ (Levedev) ১৭৯৫ সনে। বাংলা নাটক রচিত হলো ইংরেজী নাটকের অনুকরণে। 'ভদ্রার্জুন' ও 'কীর্তিবিলাস' নাটক যে ইংরেজীর অনুকরণে—তা' লেখকরা নিজে কবুল করেছেন। কীর্তিবিলাসের ভূমিকায় শেক্সপীয়রের উল্লেখ তো আছেই, আরিস্ততলের কাব্যতত্ত্বের কথাও আছে (১৮৫২)। আট বৎসর পর দীনবন্ধু মিত্র অ-নামে যে নীলদর্পন লিখলেন ১৮৬০ সনে—তার পূর্বে ভারতীয় নাট্যতালিকায় এর জুড়ি পাওয়া যায় না। বাংলা নাটক রচনায় শেক্সপীয়র ছিলেন আদর্শ। পঞ্চাঙ্ক নাটক লেখার ঢঙ পাশ্চাত্ত্য বলেই মনে হয়, যদিও সংস্কৃত

নাট্যশাস্ত্রের কোনো গ্রন্থে নাটক ও প্রকরণের অঙ্ক সংখ্যা পাঁচ থেকে দশ বলা হয়েছে। বাংলা অধিকাংশ নাটকই পঞ্চাঙ্ক। রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী' 'বিসর্জন' এই ধারা আশ্রয়ী। অবশ্য তিনিই এ ঠাট ভেঙে দেন ; তবে সেটা নিজের প্রতিভার সৃষ্টি, না সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের আদর্শে গড়া তা গবেষণা-সাপেক্ষ। নাটকের মধ্যে শারাদ (Charade) তো পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্য ঢঙের ছোট নাটক—ড্রয়িংরুমের চিত্তবিনোদনের জন্য উদ্ভাবিত। আমরা হাস্যকৌতুক পড়ে এত যে খুশী হই, অথবা ব্যঙ্গকৌতুকের একোক্তি বা মনোলোগ তাও পশ্চিম থেকেই অনুকৃত। তেমনি লিরিক্যাল-ড্রামার উৎপত্তি ঐ প্রতীচ্য দেশেই। আবার রবীন্দ্রনাথের Symbolic drama প্রভৃতির উৎস সন্ধান যদি করি—তবে হয়ত পৌঁছাব গিয়ে মেটারলিঙ্ক বা ইবসেনের ঘরে। তবে রবীন্দ্রনাথের মনস্বিতার স্পর্শে এই সব নাটক নূতন প্রাণ পেয়েছে।

মধুসূদনের নাটক রচনার কথা সুপরিচিত। বাংলার নাট্যশালা তো পুরোপুরি ইংরেজের থিএটরের কপি (copy), এমন কি আধুনিক যাত্রার প্রেরণাও এলো এই নাগরিক নাট্যশালা থেকে—রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপটের অভাব তার কথার বুনটে ভরে দিল। যদি যাত্রা নাটক সাহিত্য ও অভিনয়-শৈলী কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতিরই অভিব্যক্তি হয়—তবে সে অভিব্যক্তি কলকাতার ইংরেজ-বনিয়াদের নাট্যশালা স্থাপনের পূর্বে হয় নি কেন? আখ্‌ড়াই গান ছিল—হাফ আখ্‌ড়াই শব্দের প্রথম আধখানা কোন্ ভাষা?

যেমন নাটক, তেমনি কাব্য—পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ও অনুকরণ দিয়েই তার সূত্রপাত। একটা উন্নত সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে সজাগ হয়ে উঠলে অনুবাদ করে অনুকরণ করে আপন সাহিত্যকে সমৃদ্ধ সব জাতিই করে এসেছে এবং এখনো করছে। অনুবাদের সাথে সাথেই আরম্ভ হয় অনুকরণ-সাহিত্য। 'মেঘনাদবধ কাব্য' পাশ্চাত্ত্য এপিক-এর অনুকরণ। মিল্টন ও তার গুরু দান্তের অনুকরণে মাইকেল Epic লিখলেন ; কিন্তু তা বাংলায় অচল হয়েই থাকলো। বাংলা ভাষায় ঐ প্রথম ও শেষ এপিক—যা এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক রূপে পড়তে হয়। গল্পউপন্যাস চালু হওয়াতে ছন্দোবদ্ধ মিলেই হউক, আর অমিত্রাক্ষরী ছন্দেই হউক—কাহিনী বলা কমে আসে। এমন কি বাংলাসাহিত্যে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য অচল হয়ে গিয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার ছাত্ররা ছাড়া সে সাহিত্য এখন কেউ স্পর্শ করে না। এমন কি, যে লোক-সমাজে মঙ্গল সাহিত্যের উদ্ভব সেখানেও তারা স্থান ও মান দুই হারিয়েছে।

সাহিত্যে রুচির পরিবর্তন এসেছে। বাঙালীর মৌলিক প্রতিভা রূপ পেয়েছিল গানে—যার আদি মধ্য অন্তরূপ পদাবলী। কালবদলের হাওয়া সেখানেও লেগেছে। পদাবলী নূতন রূপে এসেছে বাংলায়—লিরিক ও সনেট নামে। লিরিক ও সনেট কথা

ছুটোই পেয়েছি ইংরেজী সাহিত্য থেকে। পদাবলী গান গেয়ে শোনান হত—লিরিকও সুর করে পড়া বা গাওয়া হতো। ভগবৎগীতা ও গীতগোবিন্দ যে গীত হতো তা তো নামেই প্রকাশিত। রবীন্দ্রনাথের লিরিক কবিতা গানে রূপ পেয়েছে আবার যেগুলি গানরূপে লেখা, সেগুলিও বিশুদ্ধ লিরিক কবিতা রূপে পড়া যেতে পারে। গীতবিতানের কবিকৃত সম্পাদিত সংস্করণের বিজ্ঞাপন কবি লিখেছিলেন—"সুরের সহযোগিতা না পেলেও পাঠকরা গীতিকাব্যরূপে এই গানগুলির অনুসরণ করতে পারবেন।" সুর ও রূপের অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা পড়েছে বাংলার গান—তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের রচনায় পাই। বাংলা আধুনিক কবিতার জন্ম হয়েছিল এই পাশ্চাত্ত্য ধরণের লিরিক ও সনেট দিয়ে। মধুসূদন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃসাহসিক পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের লেখনী সেই পাশ্চাত্ত্য-স্রোত-ধারাবাহী হলেও বাংলা ভাষা ও ভাবকে নব নব তীর্থে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক বহু তরুণ কবি য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রেরণায় সমকালীন কবিদের অনুকরণ করে কবিতা লিখেছিলেন; কিন্তু তারা অনুকরণের স্তর থেকে উঠে এসে পাশ্চাত্ত্য কাব্যকে আত্মীকরণ করে নূতন রূপ সৃষ্টি করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে 'মানসী' পর্ব থেকেই যথার্থ-ভাবে আপনাকে আবিষ্কার করেছিলেন।

ইংরেজদের আসবার বহু পরে বাংলা গদ্য হলো সচল। পঙ্গু বাংলা হাঁটতে শিখলো উনবিংশ শতকের গোড়ায়। তার পূর্বে বহু শতাব্দী জুড়ে ইংরেজের গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস। ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিচয় হলো পাশ্চাত্ত্য নভেলিস্ট ও স্টোরিরাইটারদের সঙ্গে। বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র আনলেন যুগান্তকারী বিপ্লব। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম, তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি; কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলেবকাওলি, সেই সব বালক ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা—এত সংগীত, এত বৈচিত্র্য।" (আধুনিক সাহিত্য)

এখানে প্রশ্ন এটা নয়, বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ উপন্যাস পড়েছিলেন এবং কোনটা পড়েননি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট ইংরেজী ভাষাকেই মনে করেছিলেন তাঁর উপন্যাস-রচনার বাহন করবেন। কিন্তু Rajmohan's wife চল্‌লো না। ইংরেজী ভাষা ও ভাবে পাকা বুনিয়াদ ছিল বলেই বঙ্কিমের সৃষ্ট নায়করা পাশ্চাত্ত্য ভাবে প্রণোদিত দেখতে পাই। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার, ডারউইন প্রভৃতি ভাবুকদের ও কোঁৎ প্রভৃতি দার্শনিকদের প্রভাব বেশ স্পষ্টই পাওয়া যায় তাঁর নায়কদের কথায়

ও কাজে বা জীবন-দর্শনে।*

পাশ্চাত্ত্যসাহিত্যসমুদ্রমন্থনে বাংলাদেশে নূতন 'কথা' দেবী উত্থিত হন ; এখন আমাদের ঘরে ঘরে ও গ্রন্থাগারে তাঁর আসনটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় যে পরিমাণের ও যে কদরের কথাসাহিত্য প্রকাশিত হচ্ছে তা এই ক্ষুদ্র খণ্ডিত দেশের পক্ষে বিস্ময়কর। নূতন কথাসাহিত্য ঘটনার বিবৃতি মাত্র নয়—জীবনের সমকালীন সমস্যার কথা নিয়েই তার আবির্ভাব। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' ও রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' নিজ নিজ যুগের আদি-সমস্যামূলক উপন্যাস। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় বিধবা-বিবাহ আইন পাস হবার প্রতিক্রিয়ায় 'বিষবৃক্ষ' লেখা হয়। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে আদিব্রাহ্মসমাজীয়রক্ষণশীলতা ও আধুনিকতার টানাপোড়েনের বুনট দেখতে পাই। তাঁর 'ল্যাবরেটরী' গল্প থেকে অনেক দূরের কথা এসব।

বঙ্কিমচন্দ্র যে পথ কেটে দিলেন, সেই পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। বঙ্কিম যেমন বহুকাল বিদ্যাসাগরের প্রতি স্বচ্ছ মনোভাব পোষণ না করেও, তারই সংস্কৃতবহুল ভাষা মক্শ করেন, রবীন্দ্রনাথও তেমনি বঙ্কিমের সঙ্গে মসীযুদ্ধ করেও, তাঁরই মতো গদ্যপ্রবন্ধ, তাঁরই মতো গদ্যউপন্যাস লিখেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের মানদণ্ড পেয়েই—সাহিত্য বিষয়ক গদ্য সমালোচনায় সাহিত্যের মান সৃষ্টি করেন বঙ্কিম। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানবিশী পর্বে তাঁর লেখা প্রবন্ধরাজি ও তাঁর প্রথম দুটি উপন্যাস—'বৌঠাকুরানীর হাট' ও 'রাজর্ষি' বঙ্কিমচন্দ্রেরই পদাঙ্কানুসরণ। সে যুগের উপন্যাস স্কটের আদর্শে অতীত কাহিনী অবলম্বনেই রচিত হতো।

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ভারতীয়রা যেমন পেলো পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বাদ, তেমনি পেলো ভারতের ইতিহাস ও ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞান। ভারত-ভূগোল-জ্ঞান সীমিত ছিল মুষ্টিমেয় তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ; ভারত-ইতিহাস ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা শিলালিপি পড়ে অশোকের কীর্তিকলাপ উদ্ধার করলেন—বেদবেদান্ত মুদ্রণ, অনুবাদ, আলোচনা, গবেষণা করে অতীত ভারতের গৌরবোজ্জ্বল দিনের কথা

* ব্রজেন্দ্র নাথ শীল তাঁর New Essays in Criticism গ্রন্থে লিখেছেন :

"Evidently the view on man and the universe held by thinkers like Mill spencer & Darwin have vitally affacted Bankim chandra's interpretation of Hndu religion ane Philosophy, but the profoundest influence of all has been tuat of August comte, whose positive polity and rellgion, unconsciously appear in almost everything that onr author has to say on domestic and polltical ideals and institutions and the creation and conservation of national life specially in the novels Debi Choudhurani and Anandamath" (Brajendra nath seal—New Essays in Criticism. 1903).

লিখলেন। ভারতীয়রা অতীত ভারতকে নূতন করে পেলো। বাংলার মাধ্যমে যেদিন বাঙালী রামমোহন রায় কৃত বেদান্তসূত্রের বঙ্গানুবাদ পেলো; উপনিষদ বাংলা অক্ষরে ও বাংলা অনুবাদে পড়লো সেদিনই তার নবজন্ম। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদের অনুবাদ ধারাবাহিক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বের করলেন ১৭ বৎসর। বাঙালী অতীতের ধনভাণ্ডার দেখে বিস্মিত—অজ্ঞাত য়ুরোপীয় জ্ঞানভাণ্ডার পেয়ে সে পুলকিত।

১৮৬১ সনের রবীন্দ্রনাথের জন্মকালে বাঙালী একশো বৎসর ইংরেজ বানিয়া, স্কুল মাষ্টার ও খৃষ্টান পাদরীদের ছোঁয়াচ পাওয়া নতুন মানুষ।

কলকাতার ঠাকুর পরিবারে তিনেরই স্পর্শ লেগেছিল। এঁদের আভিজাত্যের উদ্ভব হয় ইংরেজ বানিয়াদের সঙ্গে ব্যবসায় করে, মনের বিকাশ হয় ইংরেজ শিক্ষকদের কাছে পাঠ নিয়ে। খৃষ্টান পাদ্রীরা জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে প্রবেশ পায়নি—কিন্তু পাথুরিয়াঘাটার পরিবারে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন; এমন কি তাঁর বালিকা স্ত্রী বালাসুন্দরীও স্বেচ্ছায় খৃষ্টকে ইষ্টদেবতা রূপে বরণ করে নেন। জোড়াসাঁকোর পরিবারে রামমোহনের প্রভাব পড়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন অনুকূল পরিবেশের মধ্যে। তাঁর জন্মের ১৮ বৎসর পূর্বে (১৮৪৩) দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর ৭০ বৎসর বয়সের জয়ন্তী উপলক্ষে ছাত্র ছাত্রীদের অভিনন্দনের প্রতিভাষণে (১৩৩৮ সাল ১৫ই পৌষ) বলেছিলেন—"আমাদের পরিবার আমার জন্মের পূর্বেই সমাজের নোঙর তুলে দূরে বাঁধা ঘাটের বাইরে এসে ভিড়েছিল। আচার, অনুশাসন, ক্রিয়া-কর্ম সেখানে সমস্তই বিরল। আমাদের ছিল মস্ত একটা সাবেককালের বাড়ী······পূর্ব যুগের নানা পালপার্বনের পর্যায় নানা কলরবে সাজে সজ্জায় তার মধ্য দিয়ে একদিন চলাচল করেছিল, আমি তার স্মৃতিরও বাইরে পড়ে গেছি।"

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ইংরেজীর চর্চা ভালভাবেই হতো। আমরা পূর্বেই বলেছি—দেবেন্দ্রনাথ পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান, ইতিহাস দর্শনের বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন; জিওলজি বা ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ পাঠ ছিল তার মনের বিলাস ও আনন্দ। সন্তানদেরও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। কলকাতায় যে সব বিদ্যালয়ে দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-পৌত্রেরা পড়তেন সেগুলি বাংলার পাঠশালা বা সংস্কৃত টোল নয়। বেঙ্গল একাডেমি, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, সেণ্ট জেভিয়ার্স নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে—এগুলি হিন্দু সংস্কৃতি ও সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র নয়।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে যেসব পাঠ্যবই বাংলায় পড়েন, তার অধিকাংশই তো ইংরেজী বই থেকে তর্জমা অথবা তার ভাবানুবাদ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেসব পাঠ্যপুস্তক

লেখেন—তাদের অধিকাংশের মৌলিক উপাদান ইংরেজী। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে যে শিক্ষক যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিজ্ঞান পড়াতেন ও মেডিক্যাল কলেজের যে ছাত্র অস্থিকঙ্কাল এনে জীব-বিজ্ঞানের বুনিয়াদ পত্তন করেন, তাঁদের অর্জিত বিদ্যার পটভূমি তো সবই পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান। রবীন্দ্রনাথ বিলাত যাবার আগে আমেদাবাদ ও বোম্বাই-এ থাকেন ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করবার জন্য। বোম্বাইয়ে পাণ্ডুরঙ্গ পরিবারে যে মাস-দুই থাকতে হয়, সেটা ইংরেজীয়ানা রপ্ত করার জন্য। তাঁর শিক্ষিকা হলেন তরুণী আন্না তরখড়—বিলাত থেকে ঝক্‌ঝকে কালচার নিয়ে ফিরেছেন তিনি।

বিলাত যাবার আগে ইংরেজী সাহিত্য, কাব্য ও সমালোচনার আদর্শ সম্বন্ধে বহু তথ্য ও তত্ত্ব জানতে পারেন রবীন্দ্রনাথ—অক্ষয় চৌধুরীর কাছ থেকে। অক্ষয় চৌধুরী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সতীর্থ ও বন্ধু; ইংরেজীতে এম-এ, সাহিত্যরসিক, কবি ও লেখক।

'উদাসিনী' নামে তাঁর কাব্য এককালে খুব সমাদর লাভ করেছিল, কিন্তু কাব্যটি আসলে "দি হারমিট" নামে এক কাব্যের ভাবানুবাদ। অক্ষয় চৌধুরীকে রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য ও গাথা-কবিতার অন্যতম প্রবর্তক বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'বনফুল' ও 'কবিকাহিনী' এই রোমান্টিক কাব্যানুভূতি। এ সবই শেলী, কীট্‌স্‌, বাইরনের অনুরণন।

বালক রবীন্দ্রনাথের এই রোমান্টিক ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে 'কবিকাহিনী'তে বিশ্ববেদনারূপে। একটি উদ্ধৃতি থেকে জানা যাবে, কী রোমান্টিক চেতনা বাংলা কবি সাহিত্যিকদের মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল :—

"দাসত্বের পদধূলি অহঙ্কার কোরে
মাথায় বহন করে পর-প্রত্যাশীরা।
যে পদ মাথায় করে ঘৃণার আঘাত
সেই পদ ভক্তিভরে করে গো চুম্বন।
যে হস্ত ভ্রাতারে তার পরায় শৃঙ্খল,
সেই হস্ত পরশিলে স্বর্গ পায় করে।
স্বাধীন সে অধীনেরে দলিবার তরে,
অধীন, সে স্বাধীনেরে পূজিবারে শুধু।
সবল সে দুর্বলেরে পীড়িতে কেবল;
দুর্বল, বলের পদে আত্মবিসর্জিতে।"

তারপর কবির প্রার্থনা—

"এ অশান্তি কবে দেব, হবে দূরীভূত।
কবে দেব, এ রজনী হবে অবসান?
নাহিক দরিদ্র ধনী, অধিপতি, প্রজা
কেহ কারো প্রভু নয়, নহে কারো দাস!"

বলা বাহুল্য, এই ধরনের উক্তি বাংলা কাব্যে নূতন। ইংরেজ শাসনের ফলে, ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতীয়রা 'ন্যাশনালিজম্' নামে একটা নূতন কথা শিখেছে। প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে ভারত-ভাবনা ছিল অস্পষ্ট—কারণ সমগ্র ভারতকে আমরা জানতাম না। 'অতীত গৌরবকাহিনী মম বাণী' ইত্যাদি গান রচনা তখনই সম্ভব হয়েছিল, যখন ইংরেজের লেখা ইতিহাস জানতে পারলাম। 'অশোক যাহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি শেষ' এ পংক্তি ১৮৩৫ সনে জেমস্ প্রিন্সেপ কর্তৃক শিলালিপি থেকে অশোকের কীর্তিকলাপ উদ্ধার করার পূর্বে লেখা সম্ভব হতো না। ন্যাশনাল কনফারেন্স, ন্যাশন্যাল কংগ্রেস, ন্যাশনাল ফাণ্ড, ন্যাশনাল থিয়েটার আরও পরে ন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটি ইত্যাদি। ঠাকুর পরিবারে এই ন্যাশনালিজিমের তপ্ত হাওয়া বয়েছিল। ঠনঠনিয়ার পোড়ো বাড়ীতে যে গুপ্ত সভা স্থাপিত হয় সেটা যে ইতালীয় 'কার্বোনারি' নামে সিকরেট সোসাইটির অনুকরণে করা তা আমরা জানি। ম্যাৎসিনী, গ্যারিবল্ডির জীবনী বাংলায় লেখা হচ্ছে ইংরেজী বই পড়ে, আর আমরা তারই স্বপ্ন দেখছি।

রবীন্দ্রনাথের বিলাত যাবার পূর্বে লেখা দুটো সমালোচনাপ্রবন্ধের কথা ধরা যাক। 'জ্ঞানাঙ্কুর প্রতিবিম্বে' লেখেন 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা' প্রভৃতি তিনটি কাব্যের সমালোচনা, আর ষোল যৎসর বৎসর বয়সে 'ভারতী'তে লেখেন—মেঘনাদবধ কাব্যের দীর্ঘ সমালোচনা। ঐ দুটি সমালোচনা প্রবন্ধের মান যে সম্পূর্ণ বিদেশী তা প্রবন্ধগুলি পড়লেই বুঝা যায়। তেরো বৎসরের ছেলের হাতে এপিক ও লিরিক সম্বন্ধে যা মন্তব্য বের হয়েছিল তার সবটাই বালকোচিত উদ্ধত্য বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বহু বিলাতী কাব্যের উল্লেখ পাই এতে। মনে হয় এসব রচনায় অক্ষয় চৌধুরী অন্তরাল থেকে রসদ জুগিয়েছিলেন; অনেকগুলি কথা পাকা জহুরীর মতামত এবং সে মতামত প্রধানত পাশ্চাত্ত্য উপকরণ থেকেই সংগৃহীত এবং বিচার প্রণালী বিজ্ঞানসম্মত। এই সময়কার ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবন-স্মৃতিতে বহু বিস্তারে আলোচনা করে বলেছেন, "আমরা যে পরিমাণ মাদক পাইয়াছি, সে পরিমাণে খাদ্য পাই নাই।" তাঁর পঞ্চাশ বৎসরের এই লেখার মধ্যে বিশ বৎসর বয়সের মনের কথা অনেকটা সংস্কৃত হয়েই ব্যক্ত হয়েছে। কবি লিখছেন,—"তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্যদেবতা ছিলেন শেক্সপীয়র, মিলটন ও বায়রন। ইঁহাদের লেখার

ভিতরকার যে জিনিষটি আমাদিগকে খুব করিয়া নাড়া দিয়াছে, সেটা হৃদয়াবেগের প্রবলতা।...হৃদয়াবেগকে একান্ত আতিশয্যে লইয়া গিয়া তাহাকে একটা বিষম অগ্নিকাণ্ডে শেষ করা এই সাহিত্যের একটা বিশেষ স্বভাব। অন্তত এই দুর্দাম উদ্দীপনাকেই আমরা ইংরেজী সাহিত্যের সার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমাদের বাল্যবয়সে সাহিত্য-শিক্ষাদাতা অক্ষয় চৌধুরী মহাশয় যখন বিভোর হইয়া ইংরেজী কাব্য আওড়াইতেন, তখন সেই আবৃত্তির মধ্যে একটা তীব্র নেশার ভাব ছিল। রোমিও জুলিয়টের প্রেমোন্মাদ, লিয়রের অক্ষম পরিতাপের বিক্ষোভ, ওথেলোর ঈর্ষানলের প্রলয় দাবদাহ, এই সমস্তেরই মধ্যে যে একটা প্রবল অতিশয়তা আছে, তাহাই আমাদের মধ্যে উত্তেজনার সঞ্চার করিত।"

বলা বাহুল্য এই উত্তেজনার আক্ষেপ তরুণ কবির শৈশব-সঙ্গীত; সন্ধ্যা-সঙ্গীত, প্রভাত-সঙ্গীতের মধ্যে শোনা গিয়েছিল। 'বনফুল' 'কবিকাহিনী' 'ভগ্নহৃদয়ে'র আকুলিত উচ্ছ্বাসও রূপ পায় এই উত্তেজনারই অভিঘাতে।

রবীন্দ্রনাথের আঠারো উনিশ বৎসরের বেশীর ভাগ কাটে আমেদাবাদ-বোম্বাই ও বিলাতে। এই সময়টায় প্রচুর পড়েছিলেন—বেশীর ভাগ ইংরেজী। ভারতীর প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে তাঁর গদ্য রচনাগুলির উৎস সন্ধান করে যদি কখনো দেখা যায়—তবে দেখবো সে সব ইংরেজী বই থেকে সংগ্রহ।

জীবনস্মৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে ফরাসী ঐতিহাসিক Taine-এর সদ্য অনূদিত ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস বালক রবীন্দ্রনাথ আমেদাবাদে পড়েছিলেন এবং আরো অনেক বই। অসাধারণ অধ্যবসায়বলে তিনি ইংরেজী ভাষাকে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন বিলাত যাবার আগেই। ১৮৭৮-৭৯ সনে ভারতীতে তাঁর যে কয়টা গদ্যরচনা প্রকাশিত হয় তার তালিকা দেখলে বুঝা যাবে—সেগুলির মূল ইংরেজী বই:—

(১) ইংরাজদিগের আদব-কায়দা (২) স্যাক্সন জাতি ও অ্যাংলো স্যাক্সন সাহিত্য (৩) বিয়াত্রিচে, দান্তে ও তাঁহার কাব্য (৪) পেত্রার্কা ও লরা (৫) গ্যেটে ও তাঁহার প্রণয়িনী-গণ (৬) নর্মান জাতি ও অ্যাংলো নর্মান সাহিত্য (৭) চ্যাটারটন বালক-কবি। ইতিপূর্বে এই সময়ে রচিত রোমান্টিক আধ্যাত্মিকাপূর্ণ কবিতাগুলি ইংরেজী হিরোইক ভার্স ও ব্যালাডকে স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত বলি, পরযুগে ব্রাউনিঙএর কাব্যের আদর্শে রবীন্দ্রনাথ লেখেন নাট্যকাব্য বা কাহিনী।

বিলাতে যে দেড় বৎসর ছিলেন, তার মধ্যে কবি মাত্র চার মাস লণ্ডন য়ুনিভার্সিটিতে পড়েছিলেন, ব্রিটিশ ম্যুজিয়ম লাইব্রেরীতে গিয়েও পড়াশুনা করতেন। মোট কথা, বিস্তর পড়েছিলেন—উপন্যাস ও কাব্য নিশ্চয়ই প্রধান ছিল; কিন্তু Data of

Ethicএর মতো বইও পড়তে দেখি। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ইংলণ্ডে মনস্বিতার জন্য খ্যাতি ছিল হার্বার্ট স্পেন্সর, ডারুইন ও হাক্সলির (আলডুস হাক্সলির পিতামহ)। হার্বার্ট স্পেন্সরের আরো বই কবি পড়েছিলেন। 'সঙ্গীত ও ভাব' (ভারতী ১২৮৮ সাল) প্রভৃতি প্রবন্ধে তার নিদর্শন রয়ে গেছে।

বিলাত বাসকালে পড়াশুনা ছাড়াও সামাজিক পার্টিতে গিয়ে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত ও নৃত্য কিছুটা আয়ত্ত করেছিলেন। দ্বিতীয়বার যখন এক মাসের জন্য লণ্ডনে যান, তখন অনেকগুলি থিয়েটর দেখেছিলেন। পরবর্তী যুগে য়ুরোপে যতবার গেছেন, ভালো বাজনা ও নামকরা থিয়েটর দেখবার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। কলকাতায় রেমিনি নামে এক বিখ্যাত বেহালাবাদক আসলে অনেকে মিলে তা শুনতে যান। তাঁর গানের উপর নাট্যের উপর এই প্রতীচ্য সঙ্গীতাদি স্পর্শ রেখে গেছে—বাল্মীকি-প্রতিভা, কাল-মৃগয়া তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

প্রথম বার বিলাত থেকে আসার পর রবীন্দ্রনাথের বন্ধুচক্রে যাঁরা প্রবেশ করলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন প্রিয়নাথ সেন, আশুতোষ চৌধুরী, মোহিনী চাটুজ্যে, লোকেন পালিত। এঁরা সবাই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজভুক্ত। বুনিয়াদী ধনী অভিজাতদের এঁরা কেউ নন এবং এখন থেকে রবীন্দ্রনাথকে মিশতে দেখি এই তরুণ মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। এঁরা তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডারে খোরাক জুগিয়ে দিয়েছেন বরাবর।

প্রেমের কবিতা কত পুরাতন তা কেউ বলতে পারে না। অধ্যাপক অবন্তী সান্যাল তো দু হাজার বছরের প্রেমের সঙ্গীত সম্পাদন করেছেন তর্জমায়। দেখা ও না-দেখা, পাওয়া ও না-পাওয়া, জানা ও না-জানা মানস-প্রতিমার উদ্দেশ্যে মানুষের ক্রন্দন নূতন নয়। বাংলা দেশের বৈষ্ণব পদাবলী বিরহের কবিতায় পূর্ণ। অবশ্য সেটা দেবতার নামে উৎসর্গ বলে তাকে মানুষীর বেলায় ব্যবহার করতে সঙ্কোচ হয়। তবে যার নাম ভালোবাসা, তার নাম পূজা বলে প্রেমের কবিতা ধর্মসঙ্গীতে ব্যবহৃত হ'তে বাধা থাকে না এবং তার বিপরীতটাও ঘটে থাকে।

যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা জ্ঞানাঙ্কুর প্রতিবিম্বে 'প্রলাপ' নামে যখন বের হয়েছিল তখন তাঁর বয়স তেরো-চোদ্দ বৎসরের বেশী হবে না। শৈশব সঙ্গীত, ভানু সিংহের পদাবলী, সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান পর্যন্ত রচিত কাব্যগুলি কবির আলো-আঁধারি ভাষায় লেখা। 'কড়ি ও কোমল' থেকে তাঁর জীবনের যাত্রা ক্রমশই 'ভাণ্ডার পথ বাহিয়া লোকালয়ের ভিতর দিয়া' চলিতে শুরু করে।

'কড়ি ও কোমল' রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ যৌবনের রচনা; এটি একটি সম্পূর্ণ কাব্য—

অর্থাৎ "মানব জীবনের বিচিত্র রসলীলা কবির মনকে একান্ত করিয়া টানিতেছে, এই কথাটাই 'কড়ি ও কোমলের কবিতার' ভিতর দিয়া নানা প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। এই জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিবার ও তাহাকে সকল দিক দিয়া গ্রহণ করিবার জন্য একটি অপরিতৃপ্ত আকাঙ্খা, এই কবিতাগুলির মূল কথা।"

এই মূল কথার উৎস ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে যাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। আশুতোষ চৌধুরী 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতাগুলি যথোচিত পর্যায়ে সাজিয়ে সম্পাদন করে দেন। আশুতোষের মন ফরাসী কাব্য-সাহিত্যের রসে পূর্ণ ছিল। তিনি এই কবিতাগুলি পড়ে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন যে ফরাসী কোনো কোনো কবির ভাবের মিল তিনি দেখতে পান।

আমরা আশুতোষের এই বিশ্লেষণ পড়ে আশ্চর্য হই না। আমাদের মনে হয় Toru Dutt অনূদিত "A sheaf gleaned in French fields" (1878) বইখানি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লাইব্রেরী থেকে তিনি পেয়েছিলেন। এই বইখানিতে বহু সনেটের অনুবাদ আছে। ফরাসী সাহিত্যের সহিত কবির পরিচয় ঘটে 'পৌল ও বর্জিনী'র বাংলা অনুবাদ মাধ্যমে। ইংরেজী সাহিত্যের যে ইতিহাস পড়েন, তা ফরাসী সাহিত্যিক টেইনএর লেখা। কড়ি ও কোমলের কতকগুলি কবিতার মধ্যে ফরাসী প্রভাব আছে কিনা এবং আমরা যে কারণ অনুমান করছি—তা কতদূর প্রামাণ্য তা আমরা বলতে পারিনে। মোট কথা এর সুরের সঙ্গে পুরাতন বাংলা কবিতার যোগ সূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ।

কড়ি ও কোমলের উপর ফরাসী প্রভাব সম্বন্ধে আরেকটা সন্দেহ আছে। রবীন্দ্রনাথকে এক সময় পেয়ে বসেছিল নূতন সাহিত্যিকদের নয়াধ্বনি আর্টের খাতিরে আর্ট (art for art's sake)। এই বাক্যের স্রষ্টা Theophile Gautier। রবীন্দ্রনাথ তার সাহিত্যের সঙ্গী প্রিয়নাথ সেনের কাছ থেকে গোতিয়ের উপন্যাস মাদামোজেল দা মোঁপা এনে যে পড়েছিলেন, তা জানতে পারি তাঁর এক পত্র থেকে। বইখানা তিনি পড়েন ও মেজোদাদা সত্যেন্দ্রনাথকে পড়তে দেন—তাঁর ভালই লেগেছিল। সত্যেন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কড়ি ও কোমল উৎসর্গ করেন। ১৮৮৩ জানু-মার্চ মাসে যখন সত্যেন্দ্রনাথ ছুটি নিয়ে কলকাতায় ছিলেন, তখনই বোধ হয়—গোতিয়ের উপন্যাসখানি পড়েছিলেন। মোট কথা গোতিয়ে সম্বন্ধে যে বিহ্বলতা তখন ছিল, সেটা ১৮৯২ এ কিছুটা শমিত হয়ে আসে। বন্ধু লোকেন পালিতকে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কবি লিখেছেন—

"গ্রন্থটির রচনা যেমনই হোক, তার মূল তত্ত্বটি জগতের যে অংশকে সীমাবদ্ধ করেছে, সেটুকুর মধ্যে আমরা বাঁচতে পারিনে। গ্রন্থের মূল ভাব হচ্ছে একজন যুবক হৃদয়কে দূরে রেখে কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেশ-দেশান্তরের সৌন্দর্যের সন্ধান করে ফিরছে।

…সৌন্দর্য যেন মণিমুক্তার মতো কেবল অন্ধকার খনিগহ্বরে ও অগাধ সমুদ্রতলে প্রচ্ছন্ন, …এইজন্য এই গ্রন্থের মধ্যে হৃদয় অধিকক্ষণ বাস করতে পারে না। রুদ্ধশ্বাস হয়ে তাড়াতাড়ি উপরে বেরিয়ে এসে যখন…প্রতিদিনের হাসিমুখগুলি দেখতে পাই, তখনই বুঝতে পারি সৌন্দর্য এই তো আমার চারিদিকে, সৌন্দর্য তো আমাদের প্রতিদিনের ভালবাসার মধ্যে।" (সাধনা—১২৯৯ সাল। সাহিত্য—পৃ ২০২-০৩)।

'মায়ার খেলা'র প্রমদা ও অমর—এই অবচ্ছিন্ন সৌন্দর্যপিপাসু। য়ুরোপীয় কাব্যের স্পর্শে আমাদের প্রেমের কবিতা secularised হয়েছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনে কবিদের আত্মপ্রকাশ হতো। গ্রাম্য কবিতায় ও বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের লৌকিক সুরে গীত প্রেমের গান জনতার মধ্যে চালু ছিল, শিক্ষিত সমাজের কাছে তখনও তারা সমাদর লাভ করে নি। বাংলার প্রেমের কবিতা ত্রিধারাযোগে উৎসারিত হয়েছে—এক হচ্ছে বুনিয়াদী লোকসঙ্গীতধারা, দুই বৈষ্ণবীয় রাধা কৃষ্ণের প্রেমের মাধ্যমে পদাবলীর জন্ম, আর তিন আধুনিক য়ুরোপীয় কবিদের কবিতাধারা পুষ্ট 'নতুন' কবিতা।

বাংলাদেশের লৌকিক কবিতা-গীতের একটা ধারা পার্থিব প্রেম নিয়ে থাকলো—আরেকটা ধারা ঈশ্বর প্রেমের বন্যায় বিগলিত হলো। এই আউল বাউল সাঁই দরবেশী প্রেম ও দেহতত্ত্ব এবং বৈষ্ণবীয় বিরহ মিলনের গানের প্রভাবের সঙ্গে দেখা দিল পাশ্চাত্ত্য কসমিক বোধ ও বিশ্বমানবতা বোধ এবং তারাই রূপ নিল রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি পর্বের গানে ও কবিতায়। এই কাব্যত্রয়কে প্রাচীন কোনো কাব্য ধারার সঙ্গে মেলানো যাবে না—এরা 'নতুন' কবিতা। 'নতুন' কবিতা বলেই য়ুরোপে তা সমাদৃত হয়েছিল। এরা বৈষ্ণব, বাউল, উপনিষদের ধারাবিগলিত হলেও তাদের বাইরে গিয়ে পড়েছে এদের আবেদন।

রবীন্দ্রনাথ য়ুরোপীয় জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ পড়ে দুটো জিনিষ পেয়েছিলেন—একটা হচ্ছে বিষয়কে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে দেখা ও শোনা, অপরটি বিজ্ঞানীর বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে চেনা ও জানা। যৌবনে অধীত স্পেন্সার হাক্সলী, ও অভিব্যক্তিবাদীদের মতামত কবির গদ্যে ও পদ্যে নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে। 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতার বিশ্বাত্মবোধ সম্পূর্ণভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বনির্ভরী। গদ্যে মধ্যবয়সে দেখি গিজো ও রেনার মত নিয়ে আলোচনা করতে।

রবীন্দ্রনাথ ভারত সমাজকে বিশ্লেষণ করেছেন গিজোর 'সভ্যতার ইতিহাস' গ্রন্থের তত্ত্বকথা নিয়ে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা (১৯০১) নামে প্রবন্ধের আরম্ভ করেছেন এই বলে—"ফরাসী মনীষী গিজো য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের আলোচনার যোগ্য।" প্রায় তিন পৃষ্ঠা গিজোর মত উদ্ধৃত করে কবি

সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। (দ্রঃ স্বদেশ)

বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেন। গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কাছে ম্যাকবেথ পড়ে তার অনুবাদ করেন, তার মধ্যে কেবল ডাইনীর কথাগুলি রয়ে গেছে ভারতীর পাতায়। ভারতীর সম্পাদীয় বৈঠক অংশে বহু কবির খণ্ডকাব্য বা লিরিক অনূদিত পাই। এ ছাড়া ভারতীতে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সম্বন্ধে যে প্রবন্ধগুলির উল্লেখ আগে করেছি—তাতেও বহু কবিতার অনুবাদ পাই। দান্তে, পেত্রার্কা, গ্যেটে—সবই তর্জমা পড়া—তাও খুব গভীরভাবে নয়। গ্যেটের জীবনী জর্জ লিউস-এর লেখা কবি পড়েন ও ইন্দিরা দেবীকে পড়বার জন্য উপদেশ দিয়ে লিখেছিলেন। 'বালক' পত্রিকায় (১২৯২ সাল-চৈত্র) 'সত্য' নামে প্রবন্ধে গ্যেটের মত বলে খানিকটা আলোচনা দেখতে পাই। গ্যেটে পড়বার তিনি চেষ্টা করেন—প্রমথ চৌধুরীকে একদিন লিখছেনও সে কথা। "পড়ার মাঝে মাঝে মৌলবীর বক্তৃতা নায়েবের কৈফিয়ৎ, প্রজাদের দরখাস্ত এসে পড়লে জার্মান ভাষা বুঝে ওঠা কি রকম ব্যাপার হয় তা তুমি সহজেই অনুমান করতে পারবে।" (১৮৯০)

জার্মান ভাষা কিছুটা আয়ত্ত করে হাইনের কবিতা পড়েন ; কিন্তু গ্যেটের 'ফাউস্ট' আয়ত্ত করতে গিয়ে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসেন। 'ফাউস্টে'র কাহিনীর ক্ষীণ প্রতিধ্বনি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটিকার মধ্যে কি পাওয়া যায়? জানি না তবে ভাববার বিষয়।

রবীন্দ্রনাথের সতেরো বৎসর বয়সে অনূদিত কবিতারাজী 'ভারতী'র প্রথম বর্ষ থেকে পঞ্চমবর্ষে (১৮৭৭-৮২) প্রকাশিত হতে দেখি। মুর, বার্ণস, বাইরন, সেক্সপীয়র, মিসেস ওপী'র খণ্ডকবিতা সংগ্রহ করেন কোনো অ্যানথলজি থেকে মনে হয়। কোনো কোনো ইংরেজী কবিতা-সংগ্রহ পুস্তকে কবি-হস্তের বিস্তর চিহ্ন রয়ে গেছে। কড়ি ও কোমলের মধ্যে বিদেশী ফুলের গুচ্ছ বা অনুবাদের স্পষ্ট উল্লেখ আছে অ্যানথলজি গ্রন্থের মাঝে মাঝে ও মলাটের ভিতরের পাতায়। সেলীর 'স্কাইলার্ক' কবিতার অনুবাদ বইএর মধ্যে করেছেন—রয়ে গেছে সেখানেই।

আমেদাবাদ বাসকালে ইংরেজী বই পড়ে যে সব সংকলন প্রবন্ধের কথা আমরা পূর্বে বলেছি তার মধ্যে য়ুরোপীয় কবিদের কবিতা উদ্ধৃত আছে—অনুবাদে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুল ইংরেজীও আছে। সেসব অনুবাদের মুল্যায়ন আমরা করছি নে—আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে য়ুরোপীয় সাহিত্য পড়েছেন এবং বাংলা ভাষায় এনে দিচ্ছেন। বাইশ বৎসর বয়সে একটি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছিলেন, তা নিজেই করছেন—"ইংরেজীতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা বাংলায় প্রকাশ কর; বাংলা সাহিত্য উন্নতি লাভ করুক ও

অবশেষে বাংলা বিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ুক।"

রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্রাবলী'—আমি তো বলেছি ও তাঁর ডায়ারি। ডায়ারি লেখায় মধ্যে কর্তব্যবোধ ছাড়া রস খুঁজে পাওয়া যায় না; কিন্তু একটা রক্তমাংসের মানুষকে মনের কাঠগড়ায় খাড়া করে তাকে যা খুশি বলা যায়। এনড্রুজকে লেখা একগোছা চিঠি বিদেশ থেকে এসে ছিল তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

'ছিন্নপত্রাবলী' লেখা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে। ইন্দিরা দেবীর (জন্ম ১৮৭৩) বয়স তখন ১৪।১৫, তখন থেকে তাঁকে পত্র লিখতে শুরু করেন (১৮৮৭ সনে) ধারাবাহিক পত্র চলে ১৮৯৫ এর শেষ পর্যন্ত; অর্থাৎ ইন্দিরা দেবীর ২২ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত।

এই পত্রধারায় মানুষ রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যায়; এমন কি কখন কি পড়ছেন, তারও খবর মেলে।

কবির জীবনে ৬০।৬৫ বৎসর কত ইংরেজী বই ও পত্রিকা পড়েছিলেন, তার কোনোদিন হিসাব পাওয়া যাবে না; তবে আধুনিক অর্থাৎ তৎসমকালীন সাহিত্যের সঙ্গে যোগ যে রক্ষা হতো তার বহু নিদর্শন মেলে।

'প্রবাসী' পত্রিকায় সংকলন বিভাগের জন্য কবি ইংরেজী পত্রিকা থেকে অংশ বিশেষ বেছে দিতেন—শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা সেগুলি বাংলা করতেন। বিলাত থেকে মণ্টেসরী শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে একখানি পুস্তিকা একবার তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে সে সম্বন্ধে লিখতে বলেন, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় সেটি প্রকাশিত হয়।

পুস্তক, পুস্তিকা ও পত্রিকা ছাড়া পাশ্চাত্ত্য জগতের বিচিত্র ভাবপ্রবাহের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটতো বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে। বাল্যকালে অক্ষয় চৌধুরী তাঁর মনের চোখে রোমান্টিক পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সাহিত্য তুলে ধরেন; তারপর প্রিয়নাথ সেন, আশুতোষ চৌধুরী, লোকেন পালিত, মোহিনী চট্টোপাধ্যায় এসেছিলেন—পশ্চিমের বিচিত্র বার্তা নিয়ে।

এরপর এলেন প্রমথ চৌধুরী, অজিত চক্রবর্তী, মোহিত সেন, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। বৃদ্ধ বয়সে এসেছেন অমিয় চক্রবর্তী—বৃহৎ জগতকে তাঁর মন-গবাক্ষের কাছে নিপুণ-ভাবে ধরতেন।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জীবন ও অধ্যাত্ম-জীবন গড়ে তোলবার জন্য কত বিদেশী এসেছিল, সকলেই তাদের স্পর্শ রেখে গেছে। "আমার ভারতবর্ষীয় শান্ত প্রকৃতিকে য়ুরোপের চাঞ্চল্য সর্বদা আঘাত করছে—সেইজন্যে একদিকে বেদনা আর একদিকে

বৈরাগ্য। একদিকে কবিতা আর একদিকে ফিলজফি। একদিকে দেশের প্রতি ভালবাসা আর একদিকে দেশহিতৈষিতার প্রতি উপহাস। একদিকে কর্মের প্রতি আসক্তি, আর একদিকে চিন্তার প্রতি আকর্ষণ।"

রবীন্দ্রনাথের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যতই পড়ুক, অন্তরের অন্তরে তিনি ছিলেন ভারতীয়। তাঁর বুনিয়াদ ছিল ভারতীয় ব্রহ্মবাদের উপর। মহীরুহ তার শিকড় নামিয়েছে কঠিন মাটির তলে, ঝুরি ঝুলিয়েছে চারিদিকে—স্পর্শ করেছে মৃত্তিকা। অসংখ্য পত্রপল্লব, কোমল কিশলয় আকাশে দুলছে। রবীন্দ্রনাথের জীবন এই মহীরুহেরই মত কঠিন ব্রহ্মবাদের ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত এসেছে এর উপর। অন্তরের সুখদুঃখ মথিত আনন্দ-বেদনা—সমস্তই মনস্বিতার জারক-রসে রূপান্তরিত হয়ে নূতন নূতন সৃষ্টি করছে। সেই সৃষ্টির অন্তরে আছে প্রাচ্য—বাহিরে আছে পাশ্চাত্ত্য—উভয়ের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্য। পশ্চিম যদি দ্বার ভেঙে না আসতো, তবে কী হতো তা বলতে পারি নে। বাঙালীকে বিদেশীর অভিঘাত প্রথম সহ্য করতে হয়েছে। তারপর একদিন তাকে প্রত্যাখ্যান করবার জন্য দেশ জাগ্রত হয়ে ওঠে।

এই ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ সেতু নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন। সেই তপস্যার বেদনায় বিশ্বভারতীর জন্ম যা বিশ্বকে এনে দিল ভারতের কাছে ও ভারত-ভারতীকে পৌঁছে দেবার আয়োজন করলো বিশ্বের দরবারে।